বশ্য-বাণী-কবি-চক্রবর্ত্তী
শ্রীবাণভট্টের
হর্ষচরিতম্

হর্ষচরিত

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৯

মূল্য দশ টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড (বেলগাছিয়া)
কলিকাতা হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভূমিকা

'বশ্য-বাণী-কবি চক্রবর্ত্তী'—শ্রীবাণভট্টের সম্রাটদত্ত উপাধি।

সেই স্থলে শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের উপাধি ছিল "পরম মাহেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী"। এই দুইটি উপাধি থেকেই বুঝতে পারা যায়, তদানীন্তন সমাজের স্থিতিশীলতা এবং সুস্থির স্বাস্থ্য। শ্রীহর্ষবর্দ্ধন ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সম্রাট। তাঁর ইতোবৃত্ত লিখতে শ্রীবাণভট্ট রাজনৈতিক কূট আলাপে অবতরণ করেন নি।

প্রথমেই আমি নিবেদন করছি একটি নবীন ধারণা। গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষের চিত্ত আজ উদ্বুদ্ধ। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে বহু গণতন্ত্র সৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তার পরে দেখা যায় গণতা এবং জনতাই রাজ্যসৃষ্টির পথ দেখিয়েছেন এবং পথিক হয়েছেন। সামান্য একটি স্থাধীশ্বর নব রাজতন্ত্র সৃষ্টি করে তরবারির প্রকোপে। সেই থেকেই এই পুষ্পভূতি-হর্ষবংশের আবির্ভাব। বৈদেশিক শক এবং হূণদের অভিযানের সময় ভারতবর্ষ যখন বিপদের মুখে পড়ে তখন গণতন্ত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে নি; এবং সেই সময়েই জাগরূক হয় এই রাজবংশ। বৈদেশিক অত্যাচারকে ভারত-সীমান্ত থেকে বিদূরিত ক'রে দেবার পরে বৃদ্ধি পায় এই রাজবংশের প্রতাপ। তার পর স্থিতি-স্থাপকতার মধ্যে, প্রাদেশিক কলহের বিষম সূত্রপাত থেকে—শেষে আসে এই বংশের পূর্ণ লোপ। গুর্জ্জর প্রতিহারেরা প্রতাপী হয়ে ওঠে।

যিনি এই আখ্যায়িকার গ্রন্থকর্ত্তা, তিনি উদগ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্রাটকেও কটু উক্তিতে সুভাষিত-সম্বর্দ্ধনা জানাতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি ব্রহ্মবীজকে ভুলতেন না, এবং নিজেকে রাখতেন রাজনীতির বহু দূরে। এই হেন জনৈক সাহিত্যিক যখন বিনা বৃত্তিতে এক সম্রাটের "চরিত" লিখতে আরম্ভ করেন, তখন মানতেই হবে সম্রাটটিও ।ছলেন একটি অদ্ভুত পদার্থ—"মহাদান ছিল তাঁর আশ্রম।"

এই ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার অরণ্যে আমি ত্রস্তপদে অগ্রসর হয়েছি। সেখানে দেখতে পাই বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মপদ্ধতির একত্র-মিলন; যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-গোদাবরী-নর্ম্মদা-সিন্ধু এবং কাবেরীর সামুদ্রিক শতধারায় মিলনাত্মক অভিনয়। তৈমুরলঙ্গ, বাবর, জাহাঙ্গীর, আলমগীর এবং আধুনিক অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজকীর্ত্তির ইতিহাস আশা করি সকলেই পাঠ করেছেন। যখন তাঁরা তাঁদের লেখনীতে ঝরিয়েছেন ধ্বংস এবং বিপ্রলয়ের ইতিবৃত্ত, লক্ষ লক্ষ মস্তকের বিলোপ, তখন আশা করি আপনারা এই চরিতে দেখতে পাবেন শ্রীহর্ষ, মৈত্রী ও ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধছেন রাজ্য এবং সমাজকে। অবতারবাদের সুখী প্রচারের জন্যে পূর্ব্ব সম্রাটেরা কত যে অর্থ ব্যয় করেছেন, কত যে মস্তিষ্ক নিশ্চিহ্ন করেছেন, কত যে সমাজ শাতন করেছেন—সেটি গবেষণীয়। কিন্তু এইটি দেখতে পাওয়া যায় না ভারতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে।

শ্রীবাণভট্টের রচনাশৈলীর নিরবদ্য মাধুর্য্য বা তাঁর লিখিত 'চরিত'সম্বন্ধে বা তার সততা-সম্বন্ধে আমার বাচালতা শোভা পায় না।

ভারতবর্ষের সাহিত্যে দুখানি প্রসিদ্ধ 'চরিত' বিদ্যমান ;—

একখানি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ; ভারতে এবং বহির্জগতে সেটি বৌদ্ধিক বেদ। তার প্রামাণ্য অস্বীকার করার অর্থ বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ।

দ্বিতীয়টি শ্রীবাণভট্টের হর্ষচরিত। তার প্রামাণ্য-প্রবন্ধ ঐতিহাসিকদের অনুমান-বিষয়ক হয়ে রয়েছে। এটি ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাহীন। অনেকে বলেন পুষ্পভূতি-বংশ শৈব, এবং হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধমত-প্রণয়ী। সুতরাং এই চরিতটি একটি romantic literature, কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে কথা, আখ্যায়িকা, চরিত, ইতিহাস, এবং মহাকাব্যের মধ্যে, রীতি নীতি ও রচনাশৈলীর পৃথক্‌তা রয়েছে।

কিন্তু দেখতে পাই, বৈদেশিক সাম্রাজ্যীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের অন্ন-অধীনতায় এবং মুখামৃতে স্নাত ও আদিষ্ট হয়ে, এবং বহু বৈদেশিক অভিযানের ফলে দণ্ড-শাস্তি লাভ ক'রে আমাদের দেশীয় অর্থাৎ ভারতের বহু ইতিহাস-গবেষক বিদেশীয় ইতিহাসকে প্রামাণ্য বিবেচনা ক'রে, আমাদের দেশীয় বিরচনগুলিকে, এমন কি মধুরতম সাহিত্যকেও, নিতান্ত হীনপদে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

যবন ঐতিহাসিকেরা সামান্য ভারতীয় সূপকারেরও মুখে-শোনা ইতিহাস লিখে ভারত-সংস্কৃতির বিলোপ এবং নিজেদের উপক্রুতি-মহিমার প্রচণ্ড প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। (Cambridge *History of India*, vol. I, ch, xvi, Rapson)

অতি বিরল তাম্রশাসন এবং আরও বিরল রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার অতীত কথা বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের গবেষকেরা ভারতের বহু উপদ্রব এবং প্রলয়ের ভাব সংগ্রহ করেছেন এবং পাঠদ্দশায় আমাদের শিরোঘূর্ণনের অবধি হয় নি। আশা করি, নব্য ভারতবর্ষ স্বদেশিনী কঙ্কণমালিনী ভারতমাতাকে এখন দেখতে শিখবে মূল গ্রন্থের মাধুর্য্যের এবং ঋদ্ধির মধ্য দিয়ে, এবং সচেতন বুদ্ধিতে নিজেদের ভ্রম সংশোধন করতে সাহসী হবে।

তথাপি অতি চেষ্টা সত্ত্বেও, আজও কালিদাসকে, অশোককে, বাণভট্টকে ভিন্নদেশী পণ্ডিতেরা মারতে পারেন নি—এইটুকু আমাদের বিস্মরণীয় নয়।

ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে গ্রীক, চীন, পার্থিয়ান ও অন্যান্য যাবনিক প্রভাব ও তারই ব্যাখ্যান-বিশিষ্টতা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে অধিকার ক'রেই বিস্তৃত এবং লিখিত। আসল ভারতবর্ষ ৩৮টি অভিযানের ফলে উপদ্রুত হয়ে তার সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছে,—এই শুভসংবাদটিও বৈদেশিক গবেষকদের তরবারি হেলনে আমরা পাই। এ বিষয়ে Hillebrandt, Roth, Zimmer, Ludwig, Geldner, এমন কি Hill মহোদয়কেও মনে হয় সিকন্দরের পারিপার্শ্বিক সহচর।

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কথনীয়।

ঋদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য না থাকলে লুণ্ঠনকারীরা আসে না ; নবতন মহিমা ঢেকে দিতে চায় পুরাতন মহিমাকে ; জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৈলীর বিলোপ-সাধন এবং তার অব্যবহিত পরে নিজেদের প্রাধান্য-বিস্তার—অভিযানের রীতি।

ভারতবর্ষ কত সহস্র বৎসর ঐ অভিযানগুলির রাজ-যক্ষ্মা রোগে ভুগেছে তা বলা যায় যায় না।

তাই বলতে পারি,

যার থাকে সেই ভোগে।

মাহাত্ম্যবৈশিষ্ট্যে, পরিচর্য্যায়, ধর্ম্মে, ধৃতিতে, সংস্কৃতিতে এবং বিশ্বমানবকে কোল-দেবার ইতোবৃত্তে ভারতবর্ষ যে যুগসহস্রাধিক বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে, সে বিষয়ে দুঃখের বিষয় বৈদেশিকেরা নিস্তব্ধ। দেখতে পাই, ঔপনিবেশকের মহিমা-মাত্র তাঁরা অর্জ্জন করেছেন।

আমি আনন্দিত হয়েছি বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ বাণভট্টকে প্রকাশ করে। অনেকে শ্লেষে বলেন, সম্রাটের প্রসন্ন প্রসাদে বাণভট্ট সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সম্রাটকে জানিয়েছেন প্রশস্তি। গ্রন্থ পাঠমাত্রেই, আশা করি, তাঁদের এই মুখরতা মূক হবে। চৈনিক হিউয়েন চুয়াঙ্ যখন সেই সম্রাটের আতিথ্যে, সেই হেন যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের হীন প্রভা তাঁর কাব্যহীন ভাষায় রচনা করেছিলেন, সেটিকে স্বীকার ক'রে নিতে, কারও তো কুণ্ঠা দৃষ্ট হয় না। এটিও একটি অতিপ্রমাণ রচনা।

গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে বহুল গবেষণা হয়েছে। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রমাপ্রসাদ চন্দ এবং ৺নলিনী ভট্টশালী প্রমুখ মহোদয়গণ শশাঙ্ক-বিষয়ে যে আনুমানিক তথ্য আহরণ করেছেন, সেটি সকলেরই সুবিদিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হর্ষচরিতে বীর-ও-ভয়ানক রসের বিকাশ-কাহিনী লিখিতে গিয়ে শ্রীবাণভট্ট তাঁর নামোচ্চারণ করেন নি।

কয়েকটি পদাবলী লিপিবদ্ধ করলুম—

'প্রকটকলঙ্কমুদয়মানবিষঙ্কটবিষাণোৎকীর্ণপঙ্কসংকর-
শঙ্করশকুরশক্করককুদকুটসঙ্কাশমকাশতাকাশে
শশাঙ্ক-মণ্ডলম্। (হর্ষচরিত ৬.)

কিন্তু ঐ ষষ্ঠ সর্গেই শ্রীহর্ষের মুখ থেকে গৌড়াধম শব্দটি বাহির হয়েছিল। শশাঙ্ক এবং শশী শব্দ একার্থী। যদি শশাঙ্কই গৌড়াপসদের নাম হ'ত, তা হ'লে একই ভাবণে 'শশী' শব্দ তাঁর মুখ থেকে বাহির হ'ত না। উদ্ধৃত ক'রে দিলুম :—

১। "নামাপি গৃহ্ণতোঽস্য পাপকারিণঃ পাপমলেন লিপ্যত ইব মে জিহ্বা।"

২। "সবিতারি বেধসাদিষ্টঃ সৎপথশক্রোরন্ধকারস্য নিগ্রহায় গ্রহ-মণ্ডবিহারৈক-হরিণাধিপঃ শশী।"

এর পর আপনাদের বিচার্য্য।

'শশাঙ্কে'র মতই আর একটি নাম "কুলপুত্র গুপ্ত" ঐতিহাসিকদের বিচলিত করেছে। সংশয়চ্ছেদের জন্য এই গ্রন্থের ২৭০ ও ৩০১ পৃষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ষষ্ঠ শতাব্দীর এই হর্ষচরিতে ভঙ্গুর ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন সামাজিক শ্রী, প্রাদেশিক আচার, বন-গ্রামিক কৌলিন্য, জনতার দেশাত্মবোধ ও নির্ভীকতা, রাষ্ট্রীয় প্রীতি, এমন কি সামরিক দণ্ডযাত্রার নক্সা, সতীদাহ এবং সাধারণ জীবন-যাত্রার একটি সম্পূর্ণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টম উচ্ছ্বাসে গ্রন্থের অবসান ঘটেছে; কিন্তু ভাষাবিন্যাস ও ঘটনা-শোভার সজ্জিত নিবেদন দেখে মনে হয়, গদ্যকবি বাণভট্ট ৪৮ উচ্ছ্বাসে হয়তো থামতেন। দুঃখ হয় যখন সে ভারতবর্ষকে পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই না।

অত মহান্ সাহিত্যিক সম্বন্ধে আমার গবেষণা-ইঙ্গিত, আশা করি স্ত্রী-কটাক্ষের মত মধুর-বিভাষিণী হয়ে দেখাবে। অতএব বিরতি এবং নমস্কৃতি।

"অধিকন্তু," "অবচূরিকা" ও "শুদ্ধিপত্র" দিতে বাধ্য হলুম।

পি. ভি. কাণে মহোদয় 'হর্ষচরিত' সম্বন্ধে যে তথ্য আহরণ ক'রে তাঁর গ্রন্থে বৃহৎ ভূমিকা রচনা করেছেন, তার পূর্ণতা এবং সারল্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পিতামহ ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খুল্লতাত গুরুদেব ৺অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুহৃদ্বর শ্রীঅটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এই রচনায় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন; তাঁরা আমার প্রণম্য।

আমার সহকারী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তিনি আমার স্নেহে ও শ্রদ্ধায় বন্দনীয়। ইতি—

১১।৩।৫২ দোল পূর্ণিমা ১৩৫৮
৩৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

গুরুদেব

৺অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শ্রীপাদপদ্মে

স্বহস্তো মম মহারাজাধিরাজশ্রীহর্ষস্য

[বাঁস্‌খেরা শাসন হইতে শ্রীহর্ষের হস্তাক্ষর]

বাণভট্টকৃত ভূমিকা

দেবাদিদেব শম্ভুকে আমি নমস্কার করি ;—
তাঁর তুঙ্গশিখরকে সুন্দর করেছে
চন্দ্র-চামরের চুম্বন,—
ত্রৈলোক্য-নগরের তিনি মূলস্তম্ভ—
—প্রারম্ভের ॥ ১

মহাদেবী উমাকে আমি নমস্কার করি ;—
শিবকণ্ঠির আলিঙ্গনে আনন্দমুকুলিতা তাঁর আঁখি ;
কালকূট-বিষের স্পর্শজন্মা যেন এক মূর্চ্ছিতা মূর্চ্ছনা ॥ ২

প্রসিদ্ধ ব্যাসদেবকে আমি নমস্কার করি ;—
তিনি সর্ব্ববিদ, তিনি কবিবেধস্,
তিনি সরস্বতীর দক্ষিণতায় সৃজন করেছেন
(ভারত)বর্ষের মত পুণ্য (মহা)ভারত ॥ ৩

নমস্কার। ইতি ॥

এই লোকে প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়—
কু-কবিদের।
তাদের তুলনা দেওয়া চলে কোকিলদের সঙ্গে ;—
তাদের দৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত আছে রঞ্জনীরাগ,
তারা বাচাল, তারা কামকারী ॥ ৪

গৃহে গৃহে দেখতে পাওয়া যায় সারমেয়ের অসংখ্যতা

কিন্তু সমজাতি হ'লেও দুষ্প্রাপ্য থেকে যায়—

উৎপাদক শরভ।

সেই শরভদের মতন হচ্ছেন কবিরা ॥ ৫

এমন অনেকে রয়েছেন—যাঁরা—

অন্যের লেখা এবং বর্ণ-বন্ধের পরিবর্ত্তন ক'রে

বা চিহ্ন গোপন ক'রে,

কবি-প্রশংসা পেতে চান।

কিন্তু তাঁরা চিরকালই থেকে যান—অনাখ্যাত।

সুকবিদের মধ্যে তাঁরা গণ্য হন চোর ব'লে ॥ ৬

কাব্যক্রিয়া-ব্যাপারে

উত্তর-দেশীয়েরা শ্লেষপ্রায়,

পশ্চিমীরা অর্থমাত্রক,

দক্ষিণীরা উৎপ্রেক্ষাবহুল,

এবং গৌড়ীয়েরা অক্ষর-ডম্বর ॥ ৭

কাব্যে থাকবে—

নূতন নূতন অর্থ,

অগ্রাম্যতা, স্বভাবোক্তি,

সুস্পষ্ট বাণীবিন্যাস।

শ্লেষের প্রয়োগ এমন হওয়া প্রয়োজন,—

যাতে শ্লেষটিকে বোঝা যায় অক্লেশে,

এবং রস হয় স্ফুট এবং ব্যক্ত।

কিন্তু এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ—দুষ্কর ॥ ৮

কী হবে সেই কবি নিয়ে, কী হবে তাঁর কাব্যে,

যাঁর কবিত্ব বা কাব্য—

সর্ব্ববৃত্তান্তগামিনী ভারতী-কথার মত,

না ছেয়ে ফেলেছে ত্রিভুবন ?

যাঁদের বক্তে, উচ্ছ্বাস সমাপ্ত হ'লেও

অক্ষীণা বিরাজ করেন সরস্বতী।

সেই সব আখ্যায়িকার কবীশ্বরেরাই শাশ্বত-বন্দনীয় ॥ ৯।১০

"বাসবদত্তা" প্রকাশের কথা কর্ণগোচর হতেই, সত্যই একদিন
গ'লে গিয়েছিল কবিদের দর্প ;
যেমন পাণ্ডুপুত্রদের অবস্থা হয়েছিল কর্ণদেবের শক্তি-শেলের প্রাপণে ॥ ১১
"ভট্টার হরিচন্দ্রে"র গদ্যবন্ধ, কাব্যসিংহাসনে আসীন রয়েছে—
রাজার মত ;
তার পদবন্ধ উজ্জ্বল,
সে হরণ করে হৃদয়,
তার মধ্যে রয়েছে বর্ণক্রমের স্থিতি ॥ ১২
"সাতবাহন" রচনা ক'রে গেছেন অগ্রাম্য একখানি কোশ ;
সেটি রত্নাগার,
তার মধ্যে রয়েছে বিশুদ্ধ জাতি এবং সুভাষিত রত্নের সঞ্চয় ॥ ১৩
"প্রবরসেনে"র কুমুদোজ্জ্বলা কীর্ত্তি সেতুবন্ধাখ্য প্রাকৃত কাব্যের ভিতর দিয়ে লঙ্কাজয়ী বানরী সেনাকে একদিন সাগরের পরপারে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল ॥ ১৪
"ভাস" যশঃ লাভ করেছেন—
পূজার মন্দিরের মত, নাটক লিখে ;
তার মধ্যে রয়েছে সূত্রধারকৃত আরম্ভ,
রয়েছে ভূমিকার বাহুল্য,
রয়েছে পতাকার তরঙ্গ ॥ ১৫
কে এমন রয়েছে—যার চিত্ত প্রীত হয়ে ওঠে না—
"কালিদাসে"র বাণীর মোহনতায় ?
আহা, সেগুলি যেন ফোটাফুলের মঞ্জরী, মধু-রসেতে আর্দ্র ॥ ১৬
এখনও সকলকে বিস্মিত ক'রে দেয় "বৃহৎকথা"—
ধূর্জ্জটির যেন গৌরীপ্রসাধনী লীলা ॥ ১৭
আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে "আঢ্যরাজে"র উচ্ছ্বাস। স্মৃতিপটে উদিত হ'লেই সমস্ত কবিত্বের স্ফূর্ত্তি নিয়ে জিহ্বা প্রবেশ করে অভ্যন্তরে ॥ ১৮
তথাপি :—
নৃপতির প্রতি আমার উচ্ছলিত ভক্তি, আমাকে বরাভয় দিয়ে, আমাকে নিয়ে যাবে এই আখ্যায়িকা-সমুদ্রের পরপ্রান্তে ;
অতএব, আমার এই জিহ্বার সন্তরণ-চাপল্য ॥ ১৯

স্বর্ণচরণ শয্যার মত চমৎকাতে থাকে আখ্যায়িকা,—
যদি, তার মধ্যে থাকে সোনার-বরণ শব্দ ;
বড় সুখের হয়—হঠাৎ তাতে জেগে ওঠা ॥ ২০
জয় হোক—মহারাজ হর্ষের,
যিনি তাঁর জ্বলৎপ্রতাপের প্রাকার দিয়ে
রক্ষা করছেন জগৎ,
যিনি কল্যাণের পর্ব্বত,
যিনি বিশ্বপ্রণয়ীর মনস্কাম এবং সিদ্ধি ॥ ২১
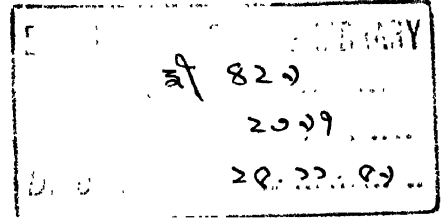
প্রথম উচ্ছ্বাস

এবমনুশ্রুয়তে-

পুরাকালের কোনো একটি দিনের সৌবিভাগে, প্রস্ফুটিত পদ্মের একটি সিংহাসনে, ব্রহ্মলোকে সভার আহ্বান ক'রে উপাসীন ছিলেন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা। তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন সুনাসীর-প্রমুখ দিব্যলোকের অধিবাসীরা। শুনছিলেন ব্রহ্মোদ্য কথা, শুনছিলেন দর্শনশাস্ত্রের নিরবদ্য বিচার। তথাসীন ব্রহ্মাকে সেবা করছিলেন সপ্তর্ষিপ্রমাণ মহর্ষিরা—মনু-দক্ষ-চাক্ষুষ-প্রমুখ প্রজাপতির সঙ্ঘ।

তাঁদের মধ্যে স্তুতিচতুর কোনো ঋষি উচ্চারণ করছিলেন ঋক্,
কেউ পাঠ করছিলেন অপচিতি-গর্ভ যজুর্ব্বেদ,
কেউ গান করছিলেন প্রশংসাসাম সামবেদ,
তন্ত্র এবং মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যায় মগ্ন ছিলেন ঋষিদের দল;
চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল
বিদ্যা-বিসম্বাদজনিত নানান জটিল তর্ক এবং বিবিধ বিবাদ।

সেই সভায় সে দিন উপস্থিত ছিলেন—
রোষণপ্রকৃতি মুনি দুর্বাসা।
অত্রির তিনি পুত্র, তারাপতির তিনি ভ্রাতা।
ঋষি মন্দপালের সঙ্গে কলহ করতে করতে সহসা ক্রোধে অন্ধ হয়ে উঠলেন।
গান ক'রে শোনাতে লাগলেন সামবেদের যথার্থ গীতরূপ।
দুর্বাসার কণ্ঠে হঠাৎ ঘ'টে গেল স্বরত্রুটি,
চমকে উঠলেন সকলে।

তখন আলাপলীলায় মত্ত ছিলেন ব্রহ্মা। তিনি ধ'রেও ধরলেন না স্বরত্রুটি, অবজ্ঞা ক'রে গেলেন। অভিশাপের আশঙ্কায় মৌন হয়ে রইল মুনিদের সঙ্ঘ।
সভায় উপস্থিত ছিলেন দেবী সরস্বতী। সবে মুক্তি পাচ্ছে বাল্যভাব, এই রকম এক নবযৌবন বয়স। পিতামহ ব্রহ্মাকে বীজন করছিলেন চামরগ্রাহী বল্লরীবাহুর হিল্লোলে।

হঠাৎ সরস্বতীর চরণে বাচাল হয়ে উঠল নূপুর।
স্বরত্রুটিতে বিরক্ত হয়ে পদপল্লব আঘাত করল ভূমিতল।
দুটি নূপুর চীৎকার ক'রে উঠল চরণে, যেন দুটি শিষ্য।
দাঁড়িয়ে উঠলেন দেবী সরস্বতী।
শ্রীঅঙ্গে কেঁপে উঠল ব্রহ্মসূত্র;
গ্রীবায় দুলে উঠল মধ্যনায়ক মুক্তার হার,—
যেন অপবর্গের মার্গ;
স্ফুরিত হয়ে উঠল অধরতট,—
বিদ্যার যাবক-রসে পাটল।
ব্রহ্মার দিকে ফিরে চাইলেন সরস্বতী।
সিন্ধুবার-মঞ্জরীর ভ্রান্তি জাগিয়ে অধরে ফুটে উঠল অপূর্ব্ব একটি হাস্য।
কর্ণকুসুমে ঝঙ্কার তুলে প্রণব গান করতে লাগল শ্রুতিপ্রণয়ী ভ্রমরের দল।
হেসে উঠলেন দেবী সরস্বতী।

হাস্য শুনে ফিরে দাঁড়ালেন—দুর্বাসা।

কেঁপে উঠল শির, শিথিল হ'ল বন্ধ ;
পিঙ্গল জটার অগ্নিবর্ণে রোষদিগ্ধ হ'ল দিক ;
অষ্টাপদের মত ললাটপট্টে যমের সান্নিধ্যজাত
ভ্রূকুটির এক কৃষ্ণ তমিস্রা ;
অতিলোহিত অক্ষিতে অমর্ষদেবতার উপহার ;
অধরোষ্ঠের অভ্যন্তরে রুদ্ধ হ'ল বাণী।

রোষণ-মূর্তি দুর্বাসার স্কন্ধ থেকে খ'সে পড়তে লাগল কৃষ্ণাজিন,—যেন অভিশাপের শাসনপট্ট।

কম্পিত-অঙ্গুলে কৃষ্ণাজিনে ভুল গ্রন্থি বেঁধে তিনি গ্রহণ করলেন বারি। আচমন করলেন, শেষে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, প্রসাদভিক্ষু অক্ষরমালার মত জপের অক্ষমাল্য। তারপরে গ্রহণ করলেন শাপ-জল।

ব্রহ্মার পার্শ্বদেশে সমাসীন ছিলেন মূর্তিমতী দেবী সাবিত্রী ;—

অমৃতফেনপাণ্ডুর কল্পদ্রুমের দুকূলবল্কল তাঁর অঙ্গে,
মৃণালাংশুকের অবগুণ্ঠন,
স্তনোন্নতির মধ্যদেশে গাত্রিকাগ্রন্থি,
তপস্যার জয়পতাকার মত ললাটে ভস্মপুণ্ড্রকের শোভা,
স্কন্ধে কুণ্ডলীকৃত যোগপট্ট বৈকক্ষকহার—
যেন গঙ্গাস্রোত তপস্যার।

ব্রহ্মোৎপত্তি পুণ্ডরীকের অম্লান মুকুলের মত স্ফটিক কমণ্ডলুটিকে বামকরে ধারণ ক'রে, দক্ষিণ মণিবন্ধে অক্ষমাল্যটিকে জড়িয়ে নিয়ে,
কম্বুর অঙ্গুরী-পরা তর্জ্জনতরঙ্গিত তর্জ্জনীটিকে উৎক্ষেপ ক'রে ব'লে উঠলেন সাবিত্রী,—

"আঃ পাপ অনাত্মজ্ঞ মুনিখেট, দূর হও।
আত্মস্খলনে লজ্জিত হওয়া তোমার উচিত ছিল।
কোন্ সাহসে তুমি অভিশাপ দিতে চলেছ ভগবতী সরস্বতীকে—
যাঁকে বন্দনা ক'রে ধন্য হয়ে যায় সুরাসুর-
মুনিমনুজের দল ?"

তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বৃষী আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন সাবিত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বেত্রাসন ত্যাগ ক'রে রোষভরে উঠে দাঁড়াল ওঙ্কার-মুখরিত-মুখ চতুর্ব্বেদ।

জটার জটিলভারে ভারাক্রান্ত হ'ল দিক্
কৃষ্ণাজিনের ছায়ায় শ্যামায়মান হ'ল দিবস,
অমর্ষনিঃশ্বাসের দোলায় প্রেঙ্খোলিত হ'ল ব্রহ্মলোক।

হস্তে পলাশের দণ্ড,
পৃষ্ঠে কুশতন্তু চামর চীর এবং চীবর,
ললাটপট্টে অগ্নিহোত্রের পবিত্র ভস্ম,
সোমরসের মত স্বেদস্রাবী,—
দৃপ্ত-তেজে দাঁড়িয়ে উঠল চতুর্ব্বেদ।

"ভগবান, শান্ত হোন—অভিশাপের এ স্থান নয়"—
অনুনয় ক'রে উঠলেন দেবতারা।
অঞ্জলির প্রসাদ রচনা ক'রে ব'লে উঠলেন দুর্বাসার শিষ্যমণ্ডলী—
"উপাধ্যায়, ক্ষমা করুন—একটিমাত্র স্খলন।"
অত্রি চীৎকার ক'রে উঠলেন—
"পুত্র, তপস্যার প্রত্যূহ ক'রো না।"
কিন্তু রোষাবেশে বিবশ হয়ে গিয়েছিলেন দুর্বাসা।
শাপজলের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল অভিশাপ—
"দুর্বিনীতে, এত উন্নতি হয়েছে তোর? বিদ্যার গরব আমি ভাঙ্‌ব।
নীচে যা, মর্ত্ত্যলোকে।"
প্রতিশাপ দিতে দাঁড়িয়ে উঠলেন সাবিত্রী।
কিন্তু তাঁর সুন্দর হাতখানিকে চেপে ধরলেন সরস্বতী। বিরত ক'রে বললেন—
"সখি, সংহার কর ক্রোধ।
অসংস্কৃতবুদ্ধি হ'লেও যাঁরা দ্বিজন্মা, তাঁরা জাতি-হিসাবে পূজ্য।"

সরস্বতীকে তথাশপ্তা দেখে পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা উঠে বসলেন কমলাসনে।

দুলে উঠল শুভ্র যজ্ঞোপবীত,—যেন মৃণালের সূত্র।

অভিশাপের হুঙ্কৃতিকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে তিনি উত্তোলন করলেন দক্ষিণ কর; অঙ্গুলি থেকে ছিটকে পড়ল মরকত অঙ্গুরীয়ের দ্যুতি। সে কি অপূর্ব্ব দ্যুতি! দেখে মনে হ'ল, ত্রিভুবনের প্রলয়শান্তির উদ্দেশ্যে যেন ব্রহ্মা ধ'রে রয়েছেন কুশগুচ্ছ।

দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ব্রহ্মার হাস্যজ্যোতি; অতি বিমল, অতি দীর্ঘ—যেন অনাগত সত্যযুগের সূত্রপাতের রেখা।

সুধীরে ধ্বনিত হ'ল ব্রহ্মার কণ্ঠ।

দশ দিক্ পরিপূর্ণ ক'রে সেই কণ্ঠে যেন বেজে উঠল সরস্বতীর প্রস্থান-মঙ্গল-পটহ।

"ব্রহ্মন্, যে পথে তুমি চলেছ, সে পথ সাধুদের চলার পথ নয়। এর ফল সর্ব্বশেষ নিধন। উদ্দামগতি ইন্দ্রিয়াশ্ব যে ধূলি উড়িয়ে চলে, সেই ধূলিতেই কলুষিত হয় সারথির দৃষ্টি। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সীমা আছে। যাঁরা কৃতিবুদ্ধি, তাঁরাই দেখতে পান—সমস্ত অর্থ, সৎ বা অসৎ—, ধীশক্তির প্রভাবে। ধর্ম্ম এবং ক্রোধের একত্র-বাস নিসর্গবিরোধী, পয়ঃপাবকের মত। আলোকের মাঙ্গল্যকে দূরে ফেলে দিয়ে কেন তুমি অবগাহন করতে চলেছ অন্ধ তামসিকতায়? কেন তুমি ভুলে যাও—সমস্ত তপস্যার মূল হচ্ছে ক্ষমা?

পরের দোষ দেখায় দক্ষ যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টির মতই আত্মরাগ-দোষকে দেখতে পায় না কোপকুটিল-বুদ্ধি। মহাতপস্যার গুরুভার গৌরব যে লোক নিজের স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে, তার শোভা পায় না পুরোভাগিত্ব। চণ্ডরোষ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকেও অন্ধ ক'রে রাখে, ধ্বংস ক'রে দিয়ে যায় কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-বোধের সীমানা।

যে লোক ক্রুদ্ধ, তার প্রথমে অন্ধকার হয়ে যায় বিদ্যা, তারপর ভ্রূকুটি;
ইন্দ্রিয়গ্রাম আরক্ত হয়ে ওঠে প্রথমে, শেষে চক্ষু;
প্রারম্ভেই ঝ'রে যায় তপস্যার ঐশ্বর্য্য, পশ্চাতে স্বেদ;
সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত হয়ে ওঠে অযশ, সর্ব্বশেষে অধর।

ব্রহ্মন্, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—তুমি যেন একটি গরলের পাদপ। ঐ যে তোমার জটা, ঐ যে তোমার বল্কল, ওর উদ্দেশ্য কি লোকক্ষয়?

সামান্য একজন নটের মতন তুমি তোমার অশান্ত চিত্তের উপর জড়িয়ে রেখেছ তপস্যার ছদ্মবেশ। আমি তো কিছুই ভাল বুঝছি না। জ্ঞান-সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় ভেসে চলেছে তোমার অতি-লঘুত্বের ফেনা।

এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন যে সব ঋষি-মহর্ষিদের দল, আশা করি, তুমি তাঁদের জড়, মূক বা বধির ব'লে বিবেচনা কর না। ক্রোধের বিপণি ক'রে রেখেছ তোমার চিত্তটিকে। নিজেকে শাস্তি না দিয়ে নিরপরাধা সরস্বতীকে নিগৃহীতা ক'রে তুমি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ। তোমার এই পাণ্ডিত্য-হীনতা নিন্দনীয়।"

তারপরে সরস্বতীর মুখের উপর দৃষ্টি নিয়োগ ক'রে ব'লে উঠলেন ভগবান্ ব্রহ্মা—

"সরস্বতি, বিষণ্ণ হ'য়ো না। তোমার পার্শ্বচরী হয়ে থাকবে সাবিত্রী। সুদূর প্রবাসে বিরহদুঃখকে সে বিনোদিত ক'রে রাখবে। মর্ত্ত্যলোকে তোমার আত্মজের মুখকমল দেখলেই তুমি মুক্তি পাবে অভিশাপের দাহ থেকে।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে সম্ভ্রমোপগত নারদের স্কন্ধদেশে হস্তন্যাস ক'রে গাত্রোত্থান করলেন ব্রহ্মা। বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন সুরাসুর-মুনিমনুজের মণ্ডল। আর অভিশপ্তা সরস্বতী সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে গেলেন নিজের মন্দিরে।

ভোলা যায় না সেই চ'লে যাবার ছবিটি।—

নুয়ে পড়েছে মুখখানি, বুকের উপর প'ড়ে রয়েছে কৃষ্ণাজিনলেখার মত দৃষ্টি, পড়ছে দীর্ঘনিঃশ্বাস—

> পরিমলমুগ্ধ ভ্রমরের দল লগ্ন হয়ে রয়েছে সেই নিঃশ্বাসে;
> যেন তারা মূর্ত্তিধরা নীলবরণ শাপাক্ষর,
> যেন তারা টেনে নিয়ে চলেছে সরস্বতীকে।

হাত দুখানি শোকে শিথিল :—

নখরের অধোমুখী দীপ্তি উপদেশ দিচ্ছে মর্ত্ত্যগমনের পথ; আর নূপুর-ধ্বনির আমন্ত্রণ পেয়ে পায়ে পায়ে ছুটে আসছে ভবনকলহংস;—আহা, তারা যেন ব্রহ্মলোকবাসীদের শুভ্রশুদ্ধ হৃদয়।

ইত্যবসরে—

'সরস্বতী নামছেন'—এই সংবাদটিকে যেন বিঘোষিত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই মধ্যমলোকে অবতরণ করলেন সূর্য্যদেব।

মন্দায়মান হ'ল বাসর;

মুদিত পদ্মের দুর্দ্দৈবে বিষণ্ণ হ'ল সরোবর।

মধুমাতাল কামিনীদের কোপকুটিল কটাক্ষের তাড়না পেয়ে ত্বরিতপদে নেমে এলেন, লোকৈকচক্ষু সূর্য্যদেব অস্তগিরির শিখরে।

শুভ্র হয়ে উঠল দিব্যাশ্রমগুলির উপকণ্ঠ;—

—প্রস্নুতমুখ মাহেয়ী গাভীদের ক্ষীরধারার ক্ষরণে;—আসন্ন চন্দ্রোদয়ে যেমন উদ্বেল হয়ে ওঠে ক্ষীরোদ সাগরের শুভ্র তরঙ্গ।

ঐরাবতকে দেখা গেল। ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন অপরাহ্ণে;

মন্দাকিনীর স্বর্ণতটে দন্ত ঘর্ষণ ক'রে কি যেন লিখছে।

দেখা মিলল অভিসারিণী বিদ্যাধরীদের। তাদের সহস্র সহস্র চরণের যাবকরসে অনুলিপ্ত হয়েই যেন তারায় তারায় ফুটে উঠছে পারুল ফুল।

নক্ষত্রপথ ধ'রে অস্তসূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়ে বিদায় নিলেন সিদ্ধদের দল; কুসুম্ভফুলের মত রাঙা হয়ে উঠল দশ দিক্ অর্ঘ্যচন্দনের রক্তপঙ্কে। ছবিখানি দেখে মনে হ'ল, পিনাকিপ্রণতিমুদিতা সন্ধ্যার অঙ্গ থেকে যেন স্বেদবিন্দু ঝরছে।

যুক্তকরে সন্ধ্যাবন্দনা করতে লাগলেন বন্দারু মুনিবৃন্দারকের বৃন্দ।

ব্রহ্মলোকে যেন হঠাৎ সৃষ্টি হয়ে গেল সন্ধ্যাঞ্জলির অরণ্য,

ব্রহ্মোৎপত্তিকমলকে যেন সেবা করতে চ'লে এল তিন জগতের পুণ্যপদ্মের পুঞ্জ।

ব্রহ্মা সমুচ্চারণ করলেন—সায়ংস্নান তৃতীয় সবনের মন্ত্র।

ধর্ম্মসাধনশিবিরে নীরাজনবিধির মত, সপ্তর্ষিদের মন্দিরে মন্দিরে জ্ব'লে উঠল জ্বলদ্জ্বালা বৈতানবহ্নির জটাল স্ফূর্ত্তি।

ক্রমে অস্ত গেল সূর্য্য।

ধীরে ধীরে ফুটে উঠল কুমুদফুলের অরণ্য। কুমুদফুলের রৌদ্রত্রাণের নীচে লীলাভরে খেলতে লাগল জলদেবীরা। আহা, সেই কুমুদ ফুল।—

তারা যেন চক্রবাক্‌বধূদের অন্তঃপুর-সৌধ, মধুসৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে ভুলিয়ে আনছে ভ্রমরদের।

পদ্ম-সরোবরে ডানা মেলে কোমল মৃণালের উপর গ্রীবাগুলিকে কুণ্ডলিত ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল মধুপানবিবশ রাজহংসের বলয়।

বইতে লাগল নিশার নিঃশ্বাসের মত সন্ধ্যার কিশোর বাতাস,—

সিদ্ধপুরন্ধ্রীদের ধম্মিল্ল-মল্লিকা থেকে গ্রহণ হ'ল গন্ধ,

পুষ্পের রেণুতে রেণুতে ধূসর হয়ে গেল মন্দাকিনীর নীর।

পদ্মিনীদের কুটিরে আবদ্ধ হয়ে রইল লোভী ভ্রমরের সঙ্ঘ।

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল নবীনবয়স অন্ধকার।

কৃষ্ণগগনে ফুটে উঠল গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্র—

নৃত্যোদ্ধৃত ধূর্জ্জটির জটারণ্যে এ কোন্ গিরিমল্লিকার স্তবক !

যামিনী-কামিনীর কর্ণপূরে এ কোন্ চম্পক-কলিকার প্রদীপ !

ক্রমে সঙ্কীর্ণা হয়ে এল তিমিরের মুখশ্রী,—জ্যোৎস্নার উদারতায়।

মিলিয়ে আসতে লাগল চাষপাখীর পাখার মত তিমিরের রঙ—যেমন ক'রে মিলিয়ে যায় মানিনীদের মান চন্দ্রকরের আঘাতে।

দেখা দিলেন শ্বেতভানু চন্দ্রদেব;—বিভাবরীবধূর উদয়রাগ-লোহিত অধরের মত রাঙা।

ধৌত হ'ল তিমির চন্দ্রকান্তমণির জলধারায়।

হাতীর দাঁতের মকরমুখ মহাপ্রণাল দিয়ে যেন আলোকধেনুর লোক থেকে প্রবাহিত হ'ল, সমুদ্রকে পূর্ণ ক'রে দিতে অমৃতের দুগ্ধ।

যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রদোষ, ধ্যানমুখী শূন্যহৃদয়া সরস্বতীকে সম্বোধন ক'রে সাবিত্রী বললেন,—

"সখি, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালকে উপদেশ দেওয়া তোমারই কাজ। তাই তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ফুটে কথা বলতে আমার জিহ্বায় আসছে জড়তা। তোমার অজানা নয় দৈবের বামাগতি। তার মর্য্যাদা-বোধ নেই, ভাল মানুষের

উপরেও দুষ্টের মত তার ব্যবহার। মুহূর্ত্তের দেরি সয় না তার। সব ভেঙে দিয়ে যায়। এ তো তুমি জানো। দুর্জ্জনের মুখ-থেকে-বেরিয়ে-আসা অকারণ অপমানের ছোট্ট কণা আশাতীত আঘাত দেয় মনস্বীদের মনে। তাই বলছি, কি হবে নয়নজলের নিত্য অভিষেকে? লক্ষ অঙ্কুরে সমৃদ্ধ ক'রে বিপদের বীজটিকে? সখি, একটুখানি তাপেই মালতী ফুল ম্লান হয়। অঙ্কুশে ঐরাবতও টলে।

মানি, দুঃখ হয় যখন ছেড়ে যেতে হয় জন্মভূমিকে, ছিন্ন ক'রে দিয়ে বন্ধুবান্ধবের সহজ স্নেহমমতার দৃঢ় গ্রন্থি। যাদের ভালবাসি তাদের অসঙ্গ, তাদের বিরহ, হৃদয়টাকে নিদারুণ আঘাত করে। মনে হয়, হৃদয়টাকে ধ'রে কে যেন করাত দিয়ে চিরছে। কিন্তু সখি, তোমার তো তা হওয়া উচিত নয়। তোমার মধ্যে ধরতে পারে না, ফলতে পারে না বেদনার অঙ্কুর কিংবা ফল। শুভই হোক্, অশুভই হোক্, যেখানে রাজার মতন বিরাজ করছেন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম, সেখানে যারা বিদ্বান্, তাদের শোক পাওয়া উচিত নয়।

দিয়ো না,—মঙ্গলপদ্মের মত তোমার ঐ মুখটিকে—অপবিত্র হ'তে দিয়ো না,—বিষাদের বিন্দুতে।

যাই হোক্, এখন আমাকে বলো, পৃথিবীর কোন্ ভাগ তুমি অলঙ্কৃত করতে চাও? কোন্ পুণ্যতীর্থে তুমি নামবে? কোন্ তপোবনে? কোন্ আশ্রমে? তোমার সঙ্গে আমি ধূলাখেলা করেছি। সেবাবিষয়ে আমার নৈপুণ্য প্রসিদ্ধ। তাই তোমাকে বলি, আজ থেকে তোমার মন বাক্য এবং ক্রিয়া—সমস্ত সমর্পণ ক'রে দাও সর্ব্ববিদ্যাবিধাতা ত্র্যম্বকের চরণে। দেবই হোন্, বা অদেবই হোন্, সকলকেই নির্বিচারে তিনি পদধূলি দিয়ে পবিত্র করেন ; আবার রসিকের মত— শিরঃচন্দ্রকে নামিয়ে নিয়ে অবতংস ক'রে দুলিয়ে দেন কর্ণে। অল্পকালের মধ্যেই তিনি তোমাকে দেবেন অভিশাপদুঃখের বিশ্রাম।"

দেবী সরস্বতীর পদ্মের মত দুটি চোখে ফুটে উঠল মুক্তার মত দুটি বিন্দু। তিনি বললেন—

"প্রিয়সখি, তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি জানি, আমাকে পেতে হবে না ব্রহ্মলোকের বিরহ এবং অভিশাপের বেদনা। কিন্তু কি করব বল? কেবল মনে প'ড়ে যাচ্ছে—কমলাসনের সেবাসুখ, আর আর্দ্র হচ্ছে হৃদয়। ও কথা

আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো না। ঐ পৃথিবীতে সমাধি-সাধন কোন ধর্ম্মধামে আমাদের স্থান হবে। সে বিষয়ে সখি, তুমিই বিশেষজ্ঞা।”

নির্ব্বাণী হলেন বাণী।

রাত্রি গভীর হ'ল। রণৎকারিণী চিন্তা লুপ্ত ক'রে দিল নয়নের সুপ্তিকে।

রাত্রির রূপায়ন হ'ল প্রভাতে।

খন্‌খন্‌ ক'রে বেজে উঠল সূর্য্যাশ্বের দাহানা।

দেখা দিলেন অরুণপুরোহিত ভুবনশেখর ভগবান্‌ বিরোচন।

উদয়গিরির মুকুটে হঠাৎ যেন জ্ব'লে উঠল পদ্মরাগের খনি।

পদ্মদীঘির তীরে অপরবক্ত্রছন্দে গান গাইতে লাগলেন ব্রহ্মার বিমান-হংস-পালক—

“কলহংসি, মানসসরোবরের অকলঙ্ক জলে তুমি বাস করেছ চিরকাল। আজ কোন্‌ দ্বিধায়, কোন্‌ উৎকণ্ঠায় কাঁপছে তোমার দৃষ্টি? সরোবর ছেড়ে তোমায় নামতে হবে দীর্ঘিকায়। ভয় নেই। সেদিন আসবে, যেদিন তুমি আবার ফিরে আসবে মানসসরোবরের পদ্মবনে।”

সঙ্গীত শ্রবণ ক'রে সরস্বতী ভাবলেন—

“ঐ গান, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার কর্ত্তব্য। তবে তাই হোক্‌। আমাকে মান্য ক'রে চলতেই হবে মুনি দুর্বাসার বাক্য।”

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে গাত্রোত্থান করলেন সরস্বতী।

বিদায় দিলেন বিয়োগ-বিধুর পরিজনদের।

বারত্রয় প্রদক্ষিণ করলেন চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে।

তারপরে অনুনয়ের আরতি দিয়ে অনুযাত্রিকদের কোনক্রমে বিরত ক'রে সাবিত্রী-হৃদয়া বাহির হয়ে গেলেন ব্রহ্মলোক থেকে।

সপ্তসাগরের রাজমহিষী মন্দাকিনীর তীরপথ ধ'রে ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগলেন সরস্বতী—মর্ত্ত্যলোকে।

মন্দাকিনীর তীর ধ'রে নেমে আসা কি এতই সহজ! কত স্মৃতি, কত আকাঙ্ক্ষায় বিজড়িত সেই পথ!

আকাশ-পথ দিয়ে নেমে চলেছেন মন্দাকিনী, গায়ে লেগে রয়েছে শুভ্রমেঘের পুঞ্জ; শশাঙ্কমৌলির মাথায় যেন জড়ানো রয়েছে একগাছি মালতীফুলের মালা।

তটপ্রান্তে শয়ান ছিলেন অন্তরঙ্গ বালখিল্যের দল।

নীরপ্রান্তে কুশশয্যায় নিদ্রিত ছিলেন সূর্য্যগ্রাহী সপ্তর্ষি।

তাপস-বিতীর্ণ তরল তিলোদকে পুলকিত ছিল তীর ও নীর।

দেবী সরস্বতী নেমে আসতে লাগলেন।—

কোথাও দেখতে পেলেন—

স্বর্ণগঙ্গার ঢেউয়ের মাথায় নক্ষত্রদল ভাসছে,

তটপ্রান্তে প'ড়ে রয়েছে শিবপুরী থেকে খ'সে-পড়া জীর্ণমন্দারের মালা,

সুষুম্না-রশ্মিতে ফুটে উঠেছে অমৃত-তারার স্তবক।

কোথাও দেখতে পেলেন—

মন্দাকিনীর সলিলে স্নানে নেমেছে অমর-কামিনীদের সৌন্দর্য্য,

সিদ্ধ-বিরচিত শিবলিঙ্গগুলিকে উল্লম্ফন ক'রে পলায়ন করছে ভীত বিদ্যাধর। মন্দাকিনীকে কখনও মনে হ'ল—

তিনি যেন গগন-সর্পের নির্ম্মোকমুক্তি,

স্বর্গের চন্দনললাটিকা,

পুণ্যপণ্যের বিক্রয়-বীথি,

আবার কখনও মনে হ'ল—

সুমেরুর সম্রাট-শিরে উষ্ণীষের যেন শুভ্রপট্টিকা,

কৈলাস-কুঞ্জরের দুকূল পতাকা,

অপবর্গের মার্গ,

সত্যযুগের চক্রনেমি।

দূর আকাশ-পথ থেকে ক্রমে সরস্বতীর চোখে পড়ল মর্ত্ত্যের একটি মহানদ। লাবণ্যরসময় নদ। যেন বরুণদেবের কণ্ঠহার, চন্দ্রলোকের অমৃতনির্ঝর। হিরণ্যবাহ ছিল তার নাম। মর্ত্ত্যলোকে এরই নাম "শোণ"। মহানদের কান্তি দেখে প্রসন্ন হলেন সরস্বতী।

কি স্বচ্ছ এর জলতল! যেন গগন-লক্ষ্মীর স্ফটিকশয়ন।

কি শীতল তার দণ্ডকবনের কর্পূর-ধোয়া সলিল! তারই তীরে রচনা করলেন বাস এবং বাসনা।

সাবিত্রীকে বললেন—

"সখি, দেখেছ, মহানদের উপকণ্ঠ! ময়ুরের কেকা, কুসুমের পরাগ, ভ্রমরের বীণা,—ভুলিয়ে দিতে চায় মন্দাকিনীর চমক। পক্ষপাততুষ্ট হচ্ছে হৃদয়।"

হিরণ্যবাহের পশ্চিমতীরে শিলা-সনাথ একটি লতা-মণ্ডপে উটজ কল্পনা ক'রে ক্ষণকাল বিশ্রাম করলেন সরস্বতী। তারপর সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, স্নান ও পুষ্পচয়ন সমাপন ক'রে, তটপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠাপিত করলেন বালুময় এক শিবলিঙ্গ। জপ করলেন, পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র। যথাযথভাবে মুদ্রাবন্ধ-উপচার পালন ক'রে ধ্রুবাগীতির আলাপনের সাহিত্যে অবনী-পবন-বন-গগন-দহন-তুহিন-কিরণ ও যজমানাত্মিকা অষ্টমূর্ত্তিকে ধ্যান করতে করতে দান করলেন অষ্টপুষ্পিকা। পূজা শেষ হ'ল। অমৃতের চেয়েও শীতল ও স্বাদু শোণনদের জলে এবং অযত্নাহৃত ফলমূলে সাঙ্গ করলেন শরীরস্থিতি।

সূর্য্য অস্ত গেল। লতামণ্ডপের শিলাতলে পল্লবশয়ন বিরচন ক'রে শ্রান্ত অঙ্গটিকে তুলে দিলেন নিদ্রার ক্রোড়ে।

এইরূপে তাঁদের কেটে গেল পরের দিন ও পরের রাত্রি।

কিছু দিন গত হয়েছে।

সেদিন সূর্য্য উঠেছেন উত্তর কোণে। অতীত হয়ে গেছে এক প্রহর বেলা। এমন সময়

সরস্বতী ও সাবিত্রী দুজনেই শুনতে পেলেন—অরণ্যগহ্বর প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ ক'রে এক তুরঙ্গম-হ্রেষার মত অদ্ভুত শব্দ।

কৌতুকভরে লতামণ্ডপ থেকে বাহির হয়ে এলেন।

দেখতে পেলেন—

উড়ে উড়ে আসছে একটি ধূলির সাম্রাজ্য;—ফুটন্ত কেয়াফুলের গর্ভপাতার মত পাণ্ডুর তার রঙ।

ক্রমে সামীপ্য ঘটিয়ে দিল পরিচয়।

শফরোদরের মত ধূসরম্লান সেই বিরাট ধূলি-সমুদ্রের মধ্যে মকরচক্রের মত ভাসছিল একদল অশ্বসৈন্য। অশ্বসৈন্যের পুরোভাগে এক সহস্র তরুণ পদাতিক। তারা চীৎকার ক'রে বলছিল "পথ ছাড়, স'রে যাও, চল চল"— ইত্যাদি সাবধান-বাণী।

তরুণ পদাতিকদের শোভা :—

ললাটে—দীর্ঘকুটিল কেশরাশির গ্রন্থির বন্ধন,
কঞ্চুকে—কৃষ্ণাগুরুর পঙ্ককঙ্কের বিচ্ছুরণ,
শিরে—উত্তরীয়,
বামপ্রকোষ্ঠে—স্বর্ণবলয়, এবং
কটিবন্ধের দ্বিগুণপট্টিকায়—অসিধেনু।

বাতাস ঠেলে হরিণেরা যেমন ক'রে ছুটে আসে—তেমনি ক'রে দ্রুত এগিয়ে আসছিল কিশোর সৈন্যের দল। অনবরত-ব্যায়ামে কৃশ ও কর্কশ তাদের শরীর।

কারো স্কন্ধে ভীমাকৃতি লগুড়,
কারোর পাণিতে কৃপাণ।
কিন্তু একটি জিনিষ সকলের হাতেই ছিল ;—
সেবাগৃহীত কিছু বন্যকুসুম, ফল, মূল ও পর্ণ।

সম-বিষম আটব-বিটপাকীর্ণ অরণ্যপথ উল্লঙ্ঘন ক'রে এগিয়ে আসছিল সহস্র সৈন্যের দল

তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল—

নীলসিন্ধুবার রঙের একটি বৃহৎ অশ্বে অষ্টাদশবর্ষীয় একটি তরুণ অশ্বারোহী।

তার মাথার উপরে ছায়া মেলেছিল শাখের বরণ আধোচাঁদ-গড়ন একটি ছত্র। সেটিকে দেখে মনে হ'ল, শঙ্খ-ক্ষীর-ফেন-পাণ্ডুর ক্ষীরোদসাগর স্বয়ং যেন দান করতে এসেছেন লক্ষ্মী। আভরণের অম্লান প্রভা অশ্বারোহীর চতুর্দ্দিকে রচনা করেছিল একখানি জ্যোতির পরিধি। তার কোমর ছাড়িয়ে দুলছিল

মালতীর শেখরমাল্য। তিন ভুবনকে জয় ক'রে কে যেন উড়িয়ে দিয়ে গেছে রূপের পতাকা!

তার ধূলিধূসর দেহটিকে যেন শুচি ক'রে দিচ্ছিল চূড়াভরণের পদ্মরাগমণির অরুণবরণ-কিরণ-স্রোত।

নীলসিন্ধুবার রঙের বৃহৎ অশ্বে এগিয়ে আসতে লাগল কিশোর। আর তার মাথার উপর নেচে নেচে উঠতে লাগল বকুল-মাল্য-মনোহর কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশের স্তবকিত সম্ভার।

কিশোরের কী সৌন্দর্য্য ?

সরস্বতীর দৃষ্টি তিল তিল ক'রে উপভোগ করতে লাগল রূপের রমণীয়তা। কিশোরের প্রত্যেকটি অঙ্গ দ্রষ্টব্য। স্মরণের স্বর্ণশাসনে এঁকে দিতে চায় গাঢ় রেখা।

ললাটখানিকে দেখে মনে হ'ল, কে যেন পশুপতির জটামুকুট থেকে দ্বিতীয়ার চাঁদখানিকে খুলে এনে সেখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে। মনঃশিলার পঙ্কপঙ্কিল সেই ললাট যেন লাবণ্য দিয়ে লেপন ক'রে দিচ্ছে সমস্ত আকাশ।

কী বিশাল তার নয়ন দুটি :—

> নবযৌবনের গরব যেন নয়নের ইসারা দিয়েই জয় ক'রে নিয়েছে ত্রিভুবন। শরৎদিনের দশটি দিক্,—যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল ফুটন্ত কুমুদ-কুবলয় আর কমলের সহস্র সহস্র সরোবরে।

দীর্ঘনাসা :—

> আহা, এ কোন্ কান্তি-সলিলের স্রোত,
> নয়ন-নদীর সীমান্তে এ কোন্ সেতুবন্ধের কল্পনা!

আর তার মুখখানি :—

> ইন্দ্রের নন্দনবনে যেন বসন্তের উল্লাস।

সেই মুখখানি কথা ক'য়ে চলেছিল, আসন্ন সুহৃদদের সঙ্গে—পরিহাস-বিজল্পিত। আর তার মুগ্ধ হাসির দশনজ্যোৎস্না দিনের আলোতে সৃষ্টি ক'রে চলেছিল চন্দ্রলোকের রহস্য।

কানে দুলছিল ত্রিকণ্টক কর্ণাভরণ :—

> কদম্বমুকুলের মত স্থূল দুটি মুক্তার মধ্যে মরকতের গাঁথনি ;—সকুসুম কুন্দপল্লবের যেন একটি শ্যামল স্নিগ্ধতা।

ভুজযুগ ঃ—

মকরকেতুর যেন কেতুদণ্ড; সুস্নিগ্ধ মৃগমদের পঙ্কে লেখা পত্রলতায় ভাস্বর।

দেহখানি ঃ—

সীমন্তিত ব্রহ্মসূত্রে; সমুদ্রমন্থনের সময় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে মন্দর-পাহাড়কে যেন জড়িয়ে ধরেছে গঙ্গার একটি স্রোত।

যতই সন্নিকট হতে লাগল অশ্বারোহীর চিত্র, ততই সরস্বতীর মুগ্ধ চোখে ধরা পড়তে লাগল সেই কিশোরের রূপ-স্বাস্থ্য।

শক্তি-স্থূল ভুজের আবেষ্টনীর মধ্যে বক্ষস্থলের কী কর্পূর-রেণু-পাংশুল প্রসারতা! ঐ বক্ষের মত বিপুল পুলিনেই যুগলে যুগলে ক্রীড়া করে প্রেয়সীদের উচ্চকুচ-চক্রবাক। জানুশিখরের ব্যায়ামপুষ্ট মাংসকঠিন পেশীতে মকরমুখের এক সতেজ শোভা। চন্দনের স্থাসক-আঁকা ঐরাবতশুণ্ডের মত উরু দুটিকে দেখে মনে হ'ল—সে দুটি যেন বক্ষবেদিকার উত্তম্ভন-শিলাস্তম্ভ।

জঙ্ঘাকাণ্ড ঈষৎ-তনু।

সুন্দর না ব'লে থাকা যায় না সেই কিশোর অশ্বারোহীটিকে।

নীলসিন্ধুবার রঙের অশ্বটিও সুন্দর।

খুরের আঘাতে খনন করছিল পৃথিবী;

প্রতিক্ষণ খন্‌খন্‌ ক'রে উঠছিল দাহানা,—দশনের গ্রহণ ও মুক্তিতে। কপালে কাঁপছিল চামীকরের চক্রক। ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে উঠছিল সোনার জয়িন।

মনোরথগতি অশ্বের দুটি পার্শ্বে দুটি পা দুলিয়ে দিয়ে,

নখরের জ্যোতিতে, অশ্বমণ্ডন চামরজালিকার অহঙ্কারটিকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে,

পরিধানে—হরিদ্রাভ নিবিড়নিপীড়ন

অধোনাভি অধরবাস,

পর্য্যাণপট্টে হাতখানি রাখা;—

এগিয়ে আসতে লাগল সেই কিশোর অশ্বারোহী। পুরশ্চর চারণের গাথাগীত শুনতে শুনতে, ভাবে কণ্টকিত হয়ে উঠছিল তার সুন্দর কপোলমূল।

সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি রয়েছে জানি না; কিন্তু দর্শন জন্মিয়ে দিয়ে গেল সরস্বতীর হৃদয়ে অনুরাগ; অনুরাগ প্রয়াণ করিয়ে দিল হৃদয়টিকে রূপকের অপরূপ লোকে; ভাবসাম্রাজ্যকে মন্দ্রিত করল রূপকের রহস্যময় ঝঙ্কার।

সরস্বতীর মনে হ'ল—

তাঁর সামনে নেমে এল যেন অনাগত এক অনঙ্গের যুগ, আবির্ভূত হ'ল এক চান্দ্রমসী সৃষ্টি, মূর্ত্তি গ্রহণ করেছে মনুষ্য-লোকের আনন্দ। এ যেন—জীবননাটিকার প্রেমময় একটি অঙ্ক, এ যেন—সমস্ত দিবসটিকে রসিয়ে দিচ্ছে শৃঙ্গারের রসে;

এ যেন আসছে,

প্রবর্ত্তন ক'রে দিয়ে অনুরাগের রাজত্ব,
বিশ্বহৃদয়কে পূর্ণ ক'রে দিয়ে বশীকরণের মন্ত্রে।

দেখতে দেখতে সেই কিশোর অধিকার ক'রে বসল সরস্বতীর হৃদয়। আকর্ষণ-অঞ্জনের মত লেগে রইল নয়নের সীমানায়। ইন্দ্রিয় যেন ইন্দ্রিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগল এক আবেশের চূর্ণ।

এ কী কিশোরের সুন্দরতা?

এ সৌন্দর্য্য—

কৌতুককে পূর্ণ করে না, নিত্য জাগিয়ে রাখে অতৃপ্তি;
সৌভাগ্যের যেন সিদ্ধযোগ,
যৌবনের যেন রসায়ন,
কীর্ত্তিস্তম্ভ—রূপের,
মূলকোষ—লাবণ্যের।

সরস্বতীর দৃষ্টিপথে এই কিশোর ফুটে উঠল—বিভ্রমের যেন নবাঙ্কুর।

তারি পার্শ্বে সরস্বতী দেখতে পেলেন—অন্য একটি অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে আসছে,—শুভ্র উষ্ণীষ এবং কবচধারী একটি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ।

পরিণত বয়স হ'লেও ব্যায়ামকঠিন তার শরীর,
তপ্ত স্বর্ণের মত তার দেহের উজ্জ্বলতা।

শুক্তির মত মস্তকে ইন্দ্রলুপ্তের চিকণতা,
দেহের মধ্যদেশ ঈষৎ তুণ্ডিল,
চিবুকে শ্মশ্রুর স্বল্পতা,
বক্ষে রোমের বাহুল্য।

তার পরিধানে ছিল অনুদ্ধত বেশ। সেই বেশটি যেন বার্দ্ধক্যকে শিক্ষা দিচ্ছিল বিনয়।

পুরুষটির মূর্ত্তি যেন এক সুন্দর গাম্ভীর্য্য। শিষ্যের মত আচরণ করছিল মহানুভবতা। যেন একটি বিজ্ঞ আচার্য্যকে লাভ ক'রে ধন্য হয়ে গিয়েছিল শিষ্টাচার।

মার্গ-সংস্কার ক'রে আগে আগে চলেছিল যে সব পদাতিক সৈন্য, তারা সরস্বতীর এবং সাবিত্রীর দিব্যরূপ দেখে বিস্ময়াবিভূত হয়ে ছুটে এল সেই কিশোর অশ্বারোহীর নিকটে। নিবেদন করল ঠিক যেমনটি তারা দেখেছে।

কুতূহলী হয়ে যুবক এবং বৃদ্ধ দিব্যরূপ দেখবার অভিপ্রায়ে লতামণ্ডপের সন্নিকটে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন।

তারপর পরিজনদের উৎসারিত ক'রে পদব্রজে সম্ভ্রমভরে উপনীত হলেন সরস্বতী এবং সাবিত্রীর উটজদ্বারে। তাঁদের অভিনন্দন হ'ল পর্ণাসনদানে ও ফুলফলের অর্ঘ্যরচনায়। বনবাসোচিত অতিথি-সৎকার ক'রে সরস্বতী ও সাবিত্রী গ্রহণ করলেন আসন।

সাবিত্রী কথা কইলেন পরিণত পুরুষটিকে লক্ষ্য ক'রে—

"আর্য্য, মেয়েদের ঐশ্বর্য্য হচ্ছে লজ্জা। প্রথমেই মুখ ফুটে কথা বলা মেয়েদের শোভা পায় না; বিশেষ যারা বনমৃগীর মত মুগ্ধা এবং কুলকুমারী। আপনাদের দর্শনে কৃতার্থ হয়েছে আমাদের নয়ন। সেই নয়নের পরামর্শেই কুতূহলী হয়ে উঠেছে শ্রবণ। আশা করি, নিজেদের পরিচয় দিয়ে লঘু ক'রে দেবেন কুতূহল।

সংসারে যাঁরা সহৃদয়, তাঁরা প্রথমদর্শনেই মুগ্ধ হয়ে, উপহারের মত সম্মুখে ধ'রে দেন অন্তরের প্রীতিকে। যে বাচাল নয়, তাকেও যেমন মধুরস বাচাল

ক'রে তোলে, তেমনি সামান্য একটুখানি প্রশ্রয় মুখর ক'রে দেয় হৃদয়ের অমুখর মুখটিকে। আপনা হতেই জন্ম হয় বিশ্বাসের। সেই মুখরতাকেই আশ্রয় ক'রে আমি বলতে সাহসী হচ্ছি;—আমাদের বিস্মিত করেছে ঐ কিশোর মহানুভবটির রূপ। আমাদের কেন? তাঁদেরও বিস্মিত করবে,—যাঁরা অতি ধীর, যাঁরা অতি বুদ্ধিমান। অদৃষ্টপূর্ব্ব! এ যেন দৃশ্যমান জগতে সৃষ্টির আতিশয্য। আমাদের ভুল বুঝবেন না। সৌজন্য-পরতন্ত্র অতি-ভদ্রতা এই দেবতার-প্রিয় রূপের কথা আমাদের মুখ থেকে বলিয়েছে; তরুণী-সুলভ তরলতা নয়।

আমাদের বলুন, কোন্ দেশকে আপনারা শূন্য ক'রে এসেছেন? কোন্ পুণ্যস্থানেই বা আপনাদের যাত্রা? ধূর্জ্জটির রুদ্র হুঙ্কারের অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দেয় যে যুবা, সে কার আত্মজ? এঁর পিতার নামই বা কি? সূর্য্যের জননী প্রভাত-সন্ধ্যার মত এঁর জননীই বা কিনি? এঁর নামই বা কি?"

সাবিত্রীর কথায় মুগ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন সেই পুরুষ—

"আয়ুষ্মতি, প্রিয়ভাষিতা আপনাদের কুলবিদ্যা। কেবল যে আপনার চাঁদের মত সুন্দর মুখ, সুন্দর হৃদয়, আমাদের আনন্দ দিচ্ছে, তা নয়; জ্যোৎস্না ঝরাচ্ছে আপনার সুন্দরী বাণী।

পৃথিবীর সৌভাগ্য যে, আপনার মত একজন মহীয়সী রমণী—যিনি সৌভাগ্যের জন্মভূমি, যিনি সজ্জন-নির্ম্মাণের শিল্পকলা, জন্ম নিয়েছেন পৃথিবীতে। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-বিনিময় দূরে থাক্, আপনাদের মত অভিজাত-বংশীয়দের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় অনেক উচ্চে এবং অনেক ঊর্দ্ধে তুলে দেয়,—আমাদের মত দীনকে।

আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, ভৃগুর পুত্র চ্যবনমুনির নাম। এই চ্যবনমুনি ভূর্লোক ভুবর্লোক এবং স্বর্লোকের ললাটতিলক। ইনিই একদা নিজের অদভ্র-প্রভাবের মাহাত্ম্যে পক্ষাঘাত এনেছিলেন পৃথিবীতে। জম্ভারির (ইন্দ্র) ভুজস্তম্ভকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিলেন। অঙ্গের অগ্নিজ্যোতিতে একদিন ভস্মশেষ হয়ে গিয়েছিলেন দানব পুলোমা। এই যে তরুণ কুমারটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন—এঁর নাম 'দধিচ'। চ্যবনমুনির ইনি তনয়,—তাঁর বহির্ব্বৃত্তি, তাঁর জীবন।

রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীশর্য্যাতের কন্যা সুকন্যাদেবী এঁর জননী। রাজনন্দিনী অন্তর্বত্নী—এই সংবাদ পেয়ে বৈজনন মাসে মহারাজ শর্য্যাত তাঁকে পিত্রালয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন। সেইখানে দধিচের জন্ম হয়। রাজগৃহে বৃদ্ধি পেতে থাকে দধিচ,—যেন শিশু নক্ষত্র।

স্বামীগৃহে চ'লে এলেন সুকন্যা। কিন্তু মাতামহ এক মুহূর্ত্তও চোখের আড়ালে রাখতেন না নাতিটিকে। কলাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে দেহে সমারম্ভ হ'ল যৌবনের। তরুণ তপনের মত সৌন্দর্য্য। পুলকিত হলেন মাতামহ। এতদিনে তাঁর মনে পড়ল 'এই আনন্দ-সুন্দরকে পাঠাতে হবে পিতৃদেবের ভবনে।'

আমি মহারাজ শর্য্যাতের ভৃত্য-পরমাণু। 'বিকুক্ষি' আমার নাম। বংশ-ক্রমে এই রাজকুলের আশ্রয়ে আমরা লালিত হয়ে আসছি। ধন্য হয়ে গেলুম, যখন আদেশ এল—'দধিচকে রেখে এস পিতার নিকটে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রভু—তাঁদের দেখবেন পুরাতন ভৃত্যদের উপর একটু সলজ্জ স্নেহ প'ড়ে থাকে। যাঁরা মহৎ, তাঁদের দাক্ষিণ্যের ভাণ্ডার চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকে।

এখান থেকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে শোণনদের পরপারে চ্যবনমুনির অরণ্যাশ্রম। সেটি যেন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কানন। সেই পর্য্যন্তই আমাদের যাত্রা।

যদি প্রসন্নতার অর্জ্জন পাই,

হৃদয়ের না হয় অবহেলা,

যদি শ্রবণার্হা হয়,

তা হ'লে আশা করি, আমাদের কুতূহলের এই প্রথম প্রণয় বিমাননীয় বা উপেক্ষিত হবে না। আমরাও আয়ুষ্মতীর বৃত্তান্ত শোনবার কৌতূহল রাখি।

আমাদের ধারণা, দিব্যলোকের অধিবাসী ব্যতীত আর কারও মধ্যে থাকতে পারে না এমন দৈহিক সৌন্দর্য্য। এ হেন ক্ষেত্রে,—নাম এবং গোত্র জানবার প্রবণতা স্বাভাবিক। আপনার পার্শ্বে যিনি প্রভাময়ী হয়ে ব'সে রয়েছেন—বিরুদ্ধ পদার্থের যেন সমবায়-ঐশ্বর্য্য—তিনি কে?

উন্মুক্ত কেশের রজনীতে ফুটে উঠেছে সৌন্দর্য্যের সূর্য্য!

শিশুরবির মত অধর, অথচ হাসিতে ঝরছে কুমুদ!

হৃদয়াকাশে পয়োধরের উন্নতি, অথচ কণ্ঠে শুনছি কলহংসের আলাপ?"

সাবিত্রী তখন বললেন ;—

"আর্য্য, সময়ে শুনতে পাবেন। কিছুকাল আমাদের এখানে বাস করবার বাসনা রয়েছে। আপনাদের আশ্রম অল্পদূরেই। সমস্তই প্রকাশ ক'রে দেবে ঘনিষ্ঠতা। হঠাৎ আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেখা—। আশা করি, আমাদের ভুলে যাবেন না।"

এই ব'লে মৌন হলেন সাবিত্রী।

দধিচের কণ্ঠে বেজে উঠল, বর্ষার পূর্ণমেঘের মত স্নিগ্ধ-মন্থর ধ্বনি। অরণ্যের লতাগৃহে যেন নেচে উঠল ময়ূর। তিনি বললেন—

"আর্য্য, আরাধনা পেলে হয়তো আর্য্যা আমাদের দান করবেন প্রসন্নতার প্রসাদ। এখন চলুন, উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন পিতৃদেব।"

নমস্কার ক'রে বিদায় নিলেন উভয়ে। তুরঙ্গমে আরোহণ ক'রে চ'লে গেলেন শোণনদের পরপারে চ্যবনমুনির আশ্রমে।

কিন্তু সরস্বতী!

নির্নিমেষ নয়নে তিনি দেখতে লাগলেন তরুণ অশ্বারোহীর অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তি।

নয়নে স্তম্ভিত হ'ল পক্ষ্ম,
নিশ্চল হ'ল তারা।

কে যেন হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিয়েছে নয়নের চঞ্চল বিলাস। দূর বনান্তরে মিলিয়ে গেল মূর্ত্তি—কিন্তু দিক্‌ভ্রান্ত হ'ল না নয়ন।

মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারলেন না তরুণ অশ্বারোহীর রূপ। স্মৃতিকে আলোড়িত ক'রে জাগতে লাগল সেই রূপ। এ তো রূপ নয়, এ যেন বৈভব; বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় হৃদয়।

বারম্বার সেই রূপ দেখবার বাসনায় মিটতে চায় না চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা। হৃদয়কে অবশ ক'রে দিয়ে সেই দিকেই ফিরে যেতে চায় দৃষ্টি।

না পাঠালেও মন চলে তার সঙ্গে।

বনলতার বুকে যেমন কাউকে না জানিয়ে জেগে ওঠে নবীন পল্লব, তেম্নি জেগে উঠল—

সরস্বতীর হৃদয়ে এক অনুরাগ।

সারাটি দিন সরস্বতীর কেটে গেল—
আলস্যের মধ্য দিয়ে,
শূন্যতার মধ্য দিয়ে,
যেন নিদ্রার মধ্য দিয়ে।

তারপরে সূর্য্য নামলেন অস্তাচলের শিখরে।
আহা, সে সূর্য্যের কী অপূর্ব্ব রঙ!
যেন গুঞ্জা-রক্তিকার তোড়া।
যেন সারসের ঝোঁটন থেকে চুরি হয়ে গেছে কঠোর রক্তিমা
সূর্য্যকে এ রকম দেখলে ঈর্ষ্যা হয়!—
ছিঃ, কমলিনী-কামুক।

দেখতে দেখতে আকাশ মলিন হয়ে গেল;—প্রৌঢ় তমালের মত তিমিরসঞ্চয়ের শ্যামলিমায়। চাঁদ উঠল আকাশে;—
সিদ্ধ-সুন্দরীদের নূপুরধ্বনির অনুসরণ ক'রে, মন্থরগতিতে—
যেন মন্দাকিনীর নীল জলে ভেসে এল শুভ্র একটি হংস—
শুভ্র-ভানু হংস।
সন্ধ্যাপ্রণাম সাঙ্গ ক'রে নিশামুখে কিসলয়-শয়নে শয়ন করলেন সরস্বতী ও সাবিত্রী। ঘুমিয়ে পড়লেন সাবিত্রী, কিন্তু ঘুম এল না সরস্বতীর নয়নে।

অঙ্গের বলনে মুহুর্মুহু বিলুলিত হতে লাগল পল্লবের শয্যা। নিমীলিত-নয়নে নিদ্রা নেই, অধিষ্ঠিতা আছেন চিন্তা।

"নিশ্চয়ই মর্ত্ত্যলোক ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুর্লভ রূপের, এমন গুণের, এমন রত্নের—প্রকাশ হয় যে লোকে, সে লোকের স্থান সকলের উপরে না হয়েই যায় না।
সে তো মুখ নয়,—সে তো লাবণ্যের প্রবাহ!
তার তুলনায় চাঁদ,—এক বিন্দু জল!

সে তো চক্ষের একটি কটাক্ষ নয়,—
ফুটন্ত কুমুদকুবলয়ের একটি খনি !
অধরমণির ছটায়—
সে রাঙিয়ে দিয়ে যায় ফোটা বাঁধুলির বন !
অনঙ্গের রূপ,—এ রূপের কাছে প্রসাধন !

সেই মেয়েরাই ধন্য, যে মেয়েদের চোখ, চিত্ত আর যৌবন ঐ মানুষটিকে রেখেছে দর্শনের বাইরে। আমি তাকে এক মুহূর্ত্ত দেখেছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ফল ফলাতে আরম্ভ করেছে গত জন্মের অধর্ম্ম। এখন উপায় কি করি !"

এই রকম চিন্তার মধ্য দিয়ে নিদ্রায় মুদ্রিত হয়ে গেল সরস্বতীর নয়ন।

নিদ্রার মধ্যেও সেই তরুণ জেগে উঠতে লাগল,—স্বপ্নের মত। আহা, কী তার বড় বড় চোখ !

স্বপ্নের মধ্যে দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখতে পেলেন সরস্বতী।

কিন্তু মকরকেতুর একটি মহাদোষ রয়েছে। তাঁর কালজ্ঞান নেই ;—তাঁর কীর্ত্তির নিকটে বিভেদ থাকে না, জাগরণ নিদ্রা কিংবা স্বপ্নের। সরস্বতীর হৃদয়কে লক্ষ্য ক'রে তিনি পুষ্পের বাণ হানলেন। নির্দ্দয়ভাবে কর্ণকে স্পর্শ ক'রে গেল তাঁর কার্ম্মুকের গুণ।

মদনশরের আঘাতে যখন ঘুম ভাঙল সরস্বতীর, তখন তাঁর কাছে ছুটে এলেন, অরতি—দুঃখাসিকা ;—একটা অনবস্থা বেদনা। সেই থেকে কী যেন হয়ে গেল সরস্বতীর।

অরণ্যের লতারা !—যারা ফুলের রেণু মেখে শুভ্র হয়, যারা ব্যথা দেয় না,—তাদের স্পর্শও বেদনা দিতে লাগল সরস্বতীকে।

বাতাস !—যার অভ্যাস হচ্ছে পুষ্পের রেণু উড়িয়ে নয়নকে দূষিত ক'রে বওয়া—সেই বাতাস বইতে লাগল ধীরে, অতি ধীরে। বাতাসে উড়ে এসে চোখে যে কুসুমের ধূলি লাগবে তার উপায় নেই, তবু অশ্রুতে টলটল হয়ে উঠল সরস্বতীর চোখ।

সিক্ত হবার কোনও কারণ ছিল না,—বিন্দুর মঞ্জরী সৃষ্টি করছিল দূর রাজহংসের পক্ষ-বীজন ; তবু আর্দ্র হ'ল সরস্বতীর অঙ্গ।

অরণ্যকমলিনীর কল্লোল-দোলায় কাদম্বমিথুনেরা যে তাকে দুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল তা নয়;—তবু সরস্বতীর মনে হতে লাগল, কে যেন তাঁকে দোলাচ্ছে!

মুখে এসে লাগছে না চক্রবাক আর চক্রবাকীর বিরহ-নিঃশ্বাসের ধোঁয়া;—তবু কেন নীল হয়ে যায় আনন?

কই! তাঁকে তো এসে দংশন করছে না মধুকরের দল!—পুষ্প-ধূলি-পাংশু দস্যু! তবে কেন এই লুটিয়ে-পড়া ধরণীতে?

অরতির মধ্য দিয়ে কেটে গেল কয়েকটি রাত্রি। তারপর—একদিন একটি মাত্র ছত্রধর সঙ্গে নিয়ে বিকুক্ষি এসে উপস্থিত হ'ল। রাজপুরীতে ফেরার পথে এই পথ দিয়েই তাকে যেতে হয়।

তাকে আসতে দেখে সরস্বতীর আনন্দ আর ধরে না।

প্রীতিভরে সম্ভ্রমভরে উঠে দাঁড়ালেন। বনমৃগীর মত উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন সরস্বতী। চোখের আনন্দ-জ্যোতিতে স্নান করিয়ে দিলেন পথশ্রান্ত পথিককে।

বিকুক্ষির আসনগ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করলেন সাবিত্রী—

"আর্য্য, কুমারের কুশল তো?"

বিকুক্ষি বললেন—

"আয়ুষ্মতি, কুশলে আছেন। আপনাদের কথা প্রায়ই তাঁর মনে পড়ে। তবে এই কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি, কেমন যেন দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর। কোন কারণ নেই, কারণও জানা যায় না। একটা শূন্য-শূন্য ভাব তাঁকে আক্রমণ করেছে। যাই হোক, এখনি আপনাদের সংবাদ নেবার জন্য বাণিনী আসছে; 'মালতী' তার নাম। কুমার তাকে স্নেহ করেন। সে কুমারের নিঃশ্বাস।"

সাবিত্রী পুনর্ব্বার বললেন—

"স্বীকার করতেই হবে, আপনাদের কুমারের হৃদয় আছে। দুদিনের দেখা নয়, তবু আমাদের স্মরণে রেখেছেন। মহানুভবতা তাঁরই সাজে, যাঁর রয়েছে মহাপ্রাণ। চলতে চলতে পথের ধারের লতায় যেমন বসনখানি আটকে যায়, আমাদের প্রতি তোমার কুমারের মনের অবস্থা হয়েছে তাই।

অতি-সামান্য মূল্যেই কিনে নেওয়া যায়, সজ্জনদের অমূল্য মৈত্রী-প্রবণ-হৃদয়। দুঃখের বিষয় এই খবরটিই রাখেন না অলস পৃথিবীর লোক। উদারতাই অপকারভরা পৃথিবীর উপকরণ।"
অবান্তর আলাপে, কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে বিদায় নিল বিকুক্ষি। প্রস্থান করল রাজধানীর অভিমুখে।

পরের দিন। রাত্রির নক্ষত্রগুলিকে আক্রমণ ক'রে শ্রীসহস্ররশ্মি যখন উদ্দামদ্যুতি আকাশমণির মত দেখা দিলেন ব্রহ্মাণ্ডে, তখন দেখা গেল বাণিনী মালতী শোণনদ উত্তীর্ণ হয়ে চ'লে আসছে।

মালতী আসছিল প্রকাণ্ড একটি তুরঙ্গমের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে। তুরঙ্গমটির কি বিভা! যেন ধীরে ধীরে চ'লে আসছিল অতিমুক্তক কুসুমের একটি স্তবক। গৌরবর্ণা মালতীকে দেখে মনে প'ড়ে যায় সিংহবাহিনী গৌরীর কথা।
একটি তরল-তন্বী প্রভা জড়িয়ে ছিল মালতীর দেহটিকে; সেই প্রভায় ভুলিয়ে মালতী যেন বহন ক'রে আনছিল অতিস্বচ্ছ শোণনদের জলধারা। তুরঙ্গমের পর্য্যাণবন্ধে লীলাভরে দুলছিল আলতা-রঙিন নূপুর-পরা দুখানি চরণ। উৎকর্ণ তুরঙ্গম শুনছিল সেই নূপুরের রণন।

দুল্‌কি চালে চ'লে আসছে তুরঙ্গম, আর মালতীর জঘনস্থলে বেজে বেজে উঠছে সোনার রশনা,—যেন জীবলোকের হৃদয়হরণের ঘোষণা।
মালতীর বেশ-বিন্যাস ভারি সুন্দর।

তনুলতাটিকে তিরোহিত ক'রে দিয়ে পা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল নির্ম্মোক-লঘু একখানি কঞ্চুক, ধৌত শুভ্র নেত্রবস্ত্রে তৈরি; সেই সূক্ষ্ম কঞ্চুকের অন্তরালে মালতীর চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গটিকে দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্ট-মোহন।—

দেখেছ কি, স্বচ্ছ সলিলের অবগুণ্ঠনে মৃণালিকার একগাছি দণ্ড?

রত্নরচা স্ফটিকের মত তার অন্তর্বাসে আস্তৃত ছিল কুসুম্ভবর্ণের পুলকের চূর্ণ। শুভ্র কঞ্চুকের উপর আমলকী ফলের মত স্থূল মুক্তা-সংগ্রহের হার; গ্রহ-উপগ্রহ-আঁকা শরৎকালের আকাশে জলহীন শুভ্রমেঘসঞ্চয়ের যেন ভ্রান্তি।

তার পূর্ণস্তনের শিখরে ছিল রত্নের একখানি প্রালম্বমাল্য; সৌভাগ্যবান অতিথিকে স্বাগত নিবেদন ক'রে হৃদয়দ্বারে দুলছে যেন বন্দনার মালিকা।

হাতে ছিল পান্নার মকরবসানো সোনার একখানি কঙ্কণ; দিগ্‌দিগন্ত শ্যামল ক'রে দিয়ে ছিটকিয়ে পড়ছিল তাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিরণজাল; মালতীকে লক্ষ্মী ভেবে তাঁর পিছনে পিছনে চ'লে আসছিল যেন—স্থলকমলিনীর সংহতি।
মালতীর অধরপুটটি অন্ধকার,—চর্ব্বিত তাম্বূলের কৃষ্ণিকায়; যেন চাঁদের গায়ে লেগেছে সন্ধ্যার রাগরক্ত তিমির।
আধখানি মুখের উপর নেমে এসেছিল নীল রঙের জালিকা। কানবালার ঝুরি নেমেছিল—নীলীগাছের নীল রঙ দিয়ে তৈরি, ময়ূরের কণ্ঠের মত নীলিম। নীল মেঘের পাতার মধ্যে একি বিদ্যুতের চমক?
তার কান থেকে আরও দুলছিল বকুলফলের মত বড় বড় তিনটি মুক্তার দানা; ললাটের মাঝখানে তমাল-শ্যামল তিলকবিন্দুর কস্তুরীবাসিত কল্পনা; কে যেন শীলমোহর পরিয়ে দিয়ে গেছে মালতীর মনোভব-সর্ব্বস্ব মুখে।
সিঁথির সীমন্তটিকে চুম্বন ক'রে দুলছিল অরুণবরণ পদ্মরাগমণির ধুক্‌ধুকি। পিঠের উপর নেচে নেচে উঠছিল নীল-চামরের মত কেশের সংযমন-শিথিল অনাদৃত রচনা;—যেন উড়ছে চূড়ামণির মকরিকাসনাথা মকরকেতুর পতাকা।

সাবিত্রী এবং সরস্বতী মালতীকে দেখতে লাগলেন। দেখার যেন বিরাম নেই। খণ্ড খণ্ড রূপদর্শন ক্রমে অখণ্ড হয়ে উঠল। রূপ দেখার মধ্যে ব্যষ্টিভাব বিনষ্ট হয়ে গেল। হ'ল সমষ্টিগত রূপদর্শনের সৃষ্টি। একই রয়েছে মূর্ত্তি, অথচ নানা হয়ে ছুটে আসে কল্পনার ইন্দ্রজাল।

মালতী আসছে—কিন্তু মনে হচ্ছে সে যেন চন্দ্রমার কুলদেবতা, পুষ্পধনুর সঞ্জীবনমন্ত্র, রূপসাগরের বেলাভূমি, যৌবনের জ্যোৎস্না।

যেন রূপ ধ'রে চ'লে আসছে ভালবাসার অমৃতময়ী মহানদী,
যেন ফুল ধরেছে নন্দনের পারিজাত,
যেন দল মেলেছে সৌন্দর্য্যের পদ্ম।
এ কি কান্তির কৌমুদী?
এ কি তারুণ্যের তৃপ্তি?

ক্রমে সাবিত্রী ও সরস্বতীর দৃষ্টিপথে পড়ল মালতীর পারিপার্শ্বিক। দেখতে পেলেন মালতীর পিছনে পিছনে আসছে মহাপ্রমাণ একটি অশ্বতরের পৃষ্ঠে সমাসীনা হয়ে, তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী। দেহ তো দেহ নয়, যেন এক পুষ্পময়ী

পুরী। অধরে রূপ ধরেছে পাটলফুল। বাহুলতায় ঠাঁই নিয়েছে শিরীষফুলের গোড়ে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বকুলফুলের সৌরভ। দেখা গেল, তাদের সঙ্গে কতকগুলি পরিচারকও আসছে।

দধিচের প্রেমে বিহ্বলা হয়েছিলেন সরস্বতী। তাই দূর থেকেই যেন সরস্বতীর মনোরথ লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে গেল মালতীকে। তাঁর মনে হ'ল, মালতীর দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে—নিজের হৃদয়, আনন্দিত অশ্রু ও উৎকণ্ঠা। নিজের কাছে মালতীকে যেন টেনে আনতে লাগলেন সরস্বতী,—

নিঃশ্বাস দিয়ে বাতাস করতে করতে,
চক্ষু দিয়ে আচ্ছন্ন ক'রে,
আশাকে তাঁর সখী ক'রে।

অশ্ব থেকে অবতরণ ক'রে নতশিরে তাঁদের প্রণাম জানাল মালতী। নিবেদন করল দধিচের প্রেরিত বদ্ধাঞ্জলি-নমস্কার। এবং তার পরে আকারে ও প্রকারে, অতি সুকুমার অগ্রাম্য আলাপের মনোহারিতায় জয় ক'রে নিল সাবিত্রী ও সরস্বতীর দুখানি মন।

ক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে গেল মধ্যদিন।
শোণনদে স্নানে গেলেন সাবিত্রী।
অবসর পেয়ে সরস্বতীর নিকটে উপস্থিত হ'ল সন্ধানী মালতী। পুষ্পাস্তীর্ণ শিলাবেদিকায় শয়ন করেছিলেন সরস্বতী। মালতী তাঁকে বললে—

"দেবি, নিভৃতে কিছু বলবার রয়েছে। এক মুহূর্ত্ত অবধানদানের প্রসাদ পেলে ধন্য হব।"

"নিশ্চয়ই দধিচের কথা কিছু বলবে"—এই আশঙ্কা ক'রে উঠে বসলেন সরস্বতী। হৃদয় সমাচ্ছন্ন ক'রে স্তনশিখরে সংলগ্ন হয়ে রইল বাম করতল। নয়নের কিরণে জেগে উঠল কুতূহলের অঙ্কুর। শ্রোত্র-শিখর থেকে খ'সে প'ড়ে গেল অবতংসপল্লব;—মনে হ'ল, মালতীর কথা শোনবার আগ্রহে ছুটে বুঝি বেরিয়ে যেতে চায় হৃদয়।
উঠে দাঁড়ালেন সরস্বতী।

প্লাবিত হ'ল জীবলোক,—শৃঙ্গার-প্রফুল্ল মুখের লাবণ্যপ্রবাহে।

মদনের আগুনে পোড়া শ্যামলবরণ কামনাগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে লাগল—আহা, তারা যেন শয্যা-কুসুমলগ্ন ভ্রমরের সংহতি।

সরস্বতী ধীরে ধীরে কুসুমের শয়নীয় থেকে উঠে দাঁড়ালেন। অতি মধুর নম্র স্বরে বললেন,—

"সখি মালতি, তুমি আমাকে অমন ক'রে বলছ কেন? অবধান দেবার আমি কে! আমার শরীরের বা আমার প্রাণের উপর বিধির কৃপায় আজ আমার হাত নেই। যারা নয়ন ভুলিয়ে দেয় তারা কিছু চায় না, জোর ক'রে জয় ক'রে নেয়। তোমাকে আমার বলবার লজ্জার বাধা কিছুই নেই। একাধারে তুমি আমার ভগ্নী, সখী, প্রণয়িনী। তুচ্ছই হোক্, বৃহৎই হোক্, যে কোন কাজে তোমার প্রয়োজনমত আমার শরীরকে সঞ্চালিত করতে পার। তোমার কাছে কিছু গোপনীয় নেই। বরবর্ণিনি, যা বলতে চাও বর্ণনা ক'রে বল।"

মালতী বললে,—

"দেবি আপনার অবিদিত নেই, ভোগৈশ্বর্য্যের মাধুর্য্য, ইন্দ্রিয়-সঞ্চয়ের লোলুপতা, নবযৌবনের উন্মাদ বিহ্বলতা, এবং চিত্তের চাঞ্চল্য। শ্রীমান্ মন্মথের দুর্নিবার অত্যাচার—সেও জগদ্বিখ্যাত। সুতরাং আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা, আমাকে যেন আপনি ভুল না বোঝেন। অসাধারণ প্রভুভক্তি কিইবা না না-করিয়ে নেয়! দেবি, যেদিন থেকে আমাদের কুমার আপনাকে প্রথম দেখেছেন, সেই দিন থেকে কাম তাঁর গুরু, চাঁদ তাঁর কাছে যম, দক্ষিণ বাতাসে বাড়ছে দীর্ঘশ্বাস। অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে মনোব্যাধি, সন্তাপ হয়েছে শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্, জাগরণ যেন গুরুজনের আজ্ঞা। মৃত্যু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পথ দেখিয়ে চলে দীর্ঘনিঃশ্বাস, হাত ধ'রে নিয়ে বেড়ায় এক রকমের হৃদয়শোষী রণরণক, বুদ্ধিকে উপদেশ দিতে দিতে বৃদ্ধ হয়ে গেল লক্ষ রকমের বিপরীত কল্পনা।

কি আর বলব আপনাকে?

যদি বলি—কুমার আপনার যোগ্য, তাতে প্রকাশ পাবে আত্মশ্লাঘা;

কুমারের শীলতার বা গুণপনার যদি ব্যাখ্যা করতে যাই—তা হ'লে নিজেই ধরা প'ড়ে যাব, কারণ মিল নেই তাঁর কাজে আর কথায়;

তাঁর ধৈর্য্যের কথা তো উল্লেখ করাই যায় না ;—তাঁর সবই দাঁড়িয়েছে বিপরীত ;

তাঁকে ভাগ্যবানও বলা যায় না ;—যখন আপনার মুঠোর মধ্যে তাঁর ভাগ্য কাঁপছে ;

অচল তাঁর ভালবাসা—এ কথা সাহস ক'রে বলতে পারি না—কারণ এই তাঁর প্রথম আঘাত পাওয়া—তাঁর প্রথম প্রেমে পড়া ;

যদি বলি সেবায় তিনি অদ্বিতীয়, তা হ'লে ক্ষুণ্ণ করা হয় প্রভুধর্ম্ম ;

আবার যদি কথার চাতুর্য্য ফলিয়ে বলি—'তিনি আমরণ আপনার দাস হয়ে থাকতে চান,' আপনি হেসে উঠবেন, বলবেন—'মালতী, তুই বড় ধূর্ত্ত, আমি ওসব বুঝি ;'

যদি গম্ভীর হয়ে বলি—'আপনিই হবেন তাঁর একমাত্র গৃহলক্ষ্মী ;' তখন আপনিই হয়তো ব'লে বসবেন—'অত সহজ প্রলোভনের উৎকোচে আমি টলি না ;'

'স্বপ্নে তাঁকে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এখন জাগরণীতে কেন সৃষ্টি করছেন বাধা ?' এ কথার উত্তর আপনার জিহ্বাগ্রে রয়েছে ;—'মালতি, তার সাক্ষ্য কই ?'

আমার প্রভুর পক্ষ থেকে কাতরতা প্রকাশ ক'রে প্রাণভিক্ষা চাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব ;—

তেমনি অসম্ভব জোর ক'রে, আদেশ দিয়ে তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাওয়া।

আপনি হয়তো এর পরে বলবেন—'তোমার কুমারকে বারণ ক'রে দিয়ো' ;—দেবি, বারণ সত্ত্বেও যদি তিনি আসেন—সে মর্য্যাদাহানি আমার সইবে না, আমি স্বীকার করব না সেই পরাজয়।

বাণীর অগোচরে আপনি রয়েছেন দাঁড়িয়ে, এখন যা ভাল বিবেচনা করেন তাই করুন।"

এই ব'লে স্তব্ধ হ'ল মালতী।

সরস্বতীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল প্রীতিতে। বললেন—

"তোমার কথার উত্তর দেওয়া অনেক বচন-সাপেক্ষ। আমি তা পারব না তার চেয়ে তোমার প্রসন্ন বাণীর ছায়ায় আমাকে আশ্রয় নিতে দাও।

সঙ্গে নিয়ে যাও, আমার মন, আমার প্রাণ।”

সংক্ষিপ্ত হ’ল মালতীর প্রত্যুত্তর—

“আপনার যা অভিরুচি। আমার কাছে এটি অতিপ্রসাদ।”

প্রত্যুত্তরের মতই সংক্ষিপ্ত হ’ল মালতীর বিদায়।

আনন্দের আতিশয্যে যেন নিজের অস্তিত্ব হারাল মালতী। প্রণাম করল। তারপরে মুহূর্তেক বিলম্ব না ক’রে বেগবান তুরঙ্গমে আরোহণ ক’রে পার হয়ে গেল শোণনদ। মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম-পদে পৌঁছে দধিচের চরণপ্রান্তে বৃত্তান্ত নিবেদন করতে দেরি হ’ল না তার। যত্ন চলতে লাগল দধিচকে নিয়ে আসার।

এদিকে সরস্বতী ব্যাপারটি না ব’লে থাকতে পারলেন না সাবিত্রীকে। যিনি দুঃখের সখী, সুখের সখী, তাঁর কাছে গোপন রাখা যায় না কিছুই। অসহ্য হয়ে উঠল সরস্বতীর উৎকণ্ঠার গুরুভার।

তপ্তহৃদয়ের বাতায়নের সম্মুখ-পথ ধ’রে কল্পকালের বিস্বাদ জাগিয়ে শেষ হয়ে এল দিন।

অস্তমিত হ’ল সূর্য্যের অনুরাগ। স্তিমিততর হ’ল সন্ধ্যার অন্ধকার। আকাশে চাঁদ উঠলেন ধীরে ধীরে—জ্যোৎস্নায় হাসিয়ে দিয়ে ঐন্দ্রীদিক্। চীনাংশুক-সুকুমার শুভ্রশয়নের মত তরঙ্গিত শোণনদের সৈকতে এসে বসলেন সরস্বতী।

ব’সে রইলেন প্রতীক্ষায়। আর তাঁকে নিয়ে খেলা করতে লাগল অসম্ভব যত কল্পনা, কল্পনার যত চপল মাধুর্য্য, মাধুর্য্যের যত ললিত বিলাস।

নিজের ললাটের ললাটিকার দিকে দৃষ্টি পড়ল সরস্বতীর; দেখলেন, সেটি দুলছে—যেন এক কণা চন্দ্রিকা; হঠাৎ লজ্জিত হ’ল তাঁর মন; স্বপ্নে যাঁর পায়ে প’ড়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম—এ তাঁরই নখের চন্দ্রিকা নয় তো?

সরস্বতীর কর্ণাভরণের পার্শ্বে কপোলমুকুরে পড়েছিল চাঁদের প্রতিমা। হঠাৎ সরস্বতীকে চমকে দিয়ে সেই চাঁদ যেন ভালবাসার কথা ব’লে উঠল; বললে, “ওগো সুন্দরি, তোমার সুন্দর ঠোঁটের হাসি কি আমায় চিনতে পেরেছে? আমি এসেছি।” সিন্ধুবারমঞ্জরীর মত স্নিগ্ধ হয়ে উঠল সরস্বতীর কপোল।

তাঁর বুকের উপরে তির্য্যক্‌ভাবে এতক্ষণ পড়েছিল তরুণ মৃণালিকার একটি দণ্ড। হঠাৎ সরস্বতীর মনে হ'ল, এ মৃণাল যেন মৃণাল নয়—এ যেন মনোভবের বিলাস-বেত্রলতা; পুরুষজাতিকে শাসন ক'রে যেন বলছে "এখানে অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ।"

প্রতীক্ষায় ব'সে রইলেন সরস্বতী। কিন্তু তবু—

এই কথাটি বার বার মনে হতে লাগল, "আমি হেন সরস্বতীকে একেবারে সাধারণ মেয়ের মত পরবশ ক'রে ফেলেছে মনোভব। যারা বয়স্কা, যারা চপলা, যারা তরুণী, তাদের না জানি তবে কি দশা ক'রে ছাড়ে!"

দধিচ এলেন।

তাঁর সুগন্ধি অঙ্গযষ্টিকে ঘিরে সে কি নীল মধুকরের উল্লাস! যেন তারা দধিচের অঙ্গে পরিয়ে দিতে চায় নীলবাস।

মালতী-দ্বিতীয়া দধিচ এলেন।

তাঁর কপোলোদরে প্রথম সমাগমের সে কী সলজ্জ হাসির শুভ্রতা; যেন অন্তর থেকে স্ফুরিত হয়ে উঠেছে মত্ত-মদন-করীর কর্ণশঙ্খায়মান সপ্রতিম চাঁদ!

দধিচ এলেন :—

এল যেন সুরভিগন্ধবহ মূর্ত্তিমন্ত মধুমাস,
ঘন-প্রীতিতে উন্মুখ এক কলাপী,
তনুলতায় শুভ্রচন্দনের রোমাঞ্চ-আঁকা যেন মলয় পাহাড়ের হাওয়া।

দধিচকে কারা যেন টেনে নিয়ে এল—করে ধ'রে সে কি আকাশের চাঁদ?
কারা যেন ঠেলে নিয়ে এল—উদ্দীপনদক্ষ সে কি দক্ষিণ সমীর?
কারা যেন ব'য়ে নিয়ে এল—স্মৃতিচপল সে কি ভালবাসার ঢেউ?

এ মিলনের মাধুর্য্য, অভিরামত্ব, বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই পর্য্যন্ত বলতে পারি—

ভাষণে জাগল মরালের গদ্‌গদ কলধ্বনি,
আর মিলন হ'ল
সেই ধরণের যেমন,—

পাঠ দিয়েছিল অনুরাগ
অধ্যাপনা করেছিল বিদগ্ধতা
উপদেশ দিয়েছিল যৌবন
এবং অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন শ্রীমন্মথ।

তারপরে যখন প্রহিত হ'ল লজ্জা, প্রশান্ত হ'ল মিলনের উদ্দামতা, তখন দধিচের কাছে নিজের অকুণ্ঠিত পরিচয় দিতে দ্বিধা করলেন না সরস্বতী। মিলনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল পরিপূর্ণ একটি বৎসর—একটি দিনের মত।

দৈবযোগে গর্ভমন্থরা হলেন সরস্বতী।

যথাসময়ে পূর্ণগর্ভার হ'ল পুত্র; সর্ব্বসুলক্ষণ।

জন্মমাত্রেই তাঁকে বর দিলেন সরস্বতী—

"আমার প্রসাদে তোমার নিকট আবির্ভূত হবে সরহস্য সর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বকলা।"

তারপরে সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পিতামহের আদেশ অমান্য করতে না পেরে, স্বামীগরব দেখাবার জন্যেই, যেন দধিচকে হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে নিয়ে আরোহণ করলেন ব্রহ্মলোকে।

বজ্রাঘাত হ'ল দধিচের অস্তিত্বে।

শেষে একদিন তিনি ভার্গব ব্রাহ্মণ ভ্রাতুর ভার্য্যা,—মুনিকন্যা অক্ষমালার হস্তে নিজ পুত্রের লালনপালনের ভার দিয়ে প্রস্থান করলেন অরণ্যে। তপস্যায় পেলেন বিরহ-ক্লেশের শান্তি।

সরস্বতীর সমকালে অক্ষমালাও প্রসব করেছিলেন একটি পুত্র। শিশুদ্বয় অক্ষমালার বক্ষক্ষীর পান ক'রে শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সারস্বত হ'ল একজনের নাম, আর একজনের—বৎস। সহোদর ভাইয়ের মত সারস্বত এবং বৎসের মধ্যে অঙ্কুরিত হ'ল স্পৃহণীয়া প্রীতি।

মাতৃদেবীর প্রসাদে যৌবনারম্ভেই সারস্বতের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন বিদ্যা। বাঙ্ময় এই সম্ভার, সারস্বত সঞ্চারিত ক'রে দিলেন প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা বৎসের মধ্যে।

তারপরে, বৎসের বিবাহ দিয়ে সেই প্রদেশেই নির্ম্মাণ করলেন পরমপ্রীতিভরে 'প্রীতিকূট' নামে একটি নিবাস। কিন্তু নিজে গ্রহণ করলেন আষাঢ়দণ্ড, পরিধান করলেন কৃষ্ণাজিন বল্কল। হাতে অক্ষবলয়, কটিতে তৃণসূত্র, মাথায় জটা, তপশ্চরণের উদ্দেশ্যে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন পিতৃদেবের অরণ্যাশ্রমে।

এই বৎস থেকেই প্রবর্ত্তিত হ'ল পবিত্র এক বিপুল বংশ। এই প্রবর্ত্তনার তুলনা দেওয়া যায় ভাগীরথী-প্রবাহের সঙ্গে ;—অস্খলিতপ্রবৃত্ত, মহামুনিমান্য, ক্ষিতিতলে লব্ধবিস্তার।

এঁদের অসামান্য ব্রহ্মজ্ঞানের গরিমায় কীর্ত্তিশুভ্র হয়েছিল দিগন্ত।

এই বংশে জন্ম নিয়েছিলেন বাৎসায়ন-পদবী প্রণবপ্রণয়ী গৃহীমুনিদের সংহতি। বলা কঠিন কি কি গুণ তাঁদের ছিল না।

তাঁরা থাকতেন জনতার বাইরে; পরিহার করেছিলেন শুকপাখীর মত নিরর্থক কপ্‌চানি; বর্জ্জন করেছিলেন শ্মশ্রু, শাঠ্য, কপটতা ও দন্তগহ্বরে বাস। পরনিন্দাবিমুখ ত্রিবর্ণ-দোষ-রহিত শুদ্ধান্নভোজী এই সব গৃহীমুনিদের প্রকৃতি ছিল প্রসন্ন। দক্ষিণার লোভে তাঁরা অধ্যেষণা করতেন না; তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আত্মতত্ত্ব ও মোক্ষ।

সমগ্র গ্রন্থের অর্থগ্রন্থি তাঁরা খুলে দিতে পারতেন। বেদের শাখান্তরে দৃষ্ট হ'ত যে বিরোধ, নিমেষে তাঁরা করতে পারতেন সেই সংশীতিচ্ছেদ। তাঁদের মধ্যে অভাব ছিল না কবির এবং বাগ্মীর। তাঁরা আমোদ পেতেন রসাল কথার ব্যবহারে। দ্বিধা করতেন না নিপুণ পরিহাসের মাধুর্য্য স্বীকার ক'রে নিতে। মিথ্যা বলা হবে, যদি বলি তাঁরা ছিলেন নৃত্যগীতবাদিত্রের বাহিরে। পরিচয় ঘটিয়ে দিতে তাঁদের দক্ষতা ছিল অপূর্ব্ব। তাঁদের ঐতিহ্যে কখনও দেখা যায় নি বিতৃষ্ণা। দয়াধর্ম্মের কথা যদি বলতে হয়, তা হ'লে বোধ করি—এই বললেই যথেষ্ট হবে, তাঁরা ভালবাসতেন প্রাণীকে। তাঁদের উপর বর্ষিত হ'ত না রাজসেনার অত্যাচার।

তাঁরা—সেই ব্রাহ্মণেরা—

খড়্গাহীন যেন বিদ্যাধর,
স্তম্ভহীন যেন পুণ্যালয়।

বাৎসায়নদের প্রবৃদ্ধ হতে লাগল বংশ।

স'রে স'রে চ'লে যায় সংসার। মহাকালের পথে পথিকের মত চ'লে যায় যুগ।

অবতীর্ণ হ'ল কলিকাল।

অবশেষে এই বাৎসায়ন-কুলে জন্ম নিলেন "কুবের"-নামা এক ব্রাহ্মণ।

কুবেরের চারিটি পুত্র—

অচ্যুত, ঈশান, হর এবং পাশুপত।

এঁদের পাণ্ডিত্য এবং ব্রহ্মতেজে আনন্দিত হয়ে উঠত সজ্জন-গোষ্ঠী।

পাশুপতের ছিল একটিমাত্র পুত্র। তাঁর নাম "অর্থপতি"। তিনি মহাত্মা ছিলেন, ব্রাহ্মণচক্রের শিরোরত্ন।

অর্থপতির একাদশ পুত্র :—

ভৃগু, হংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধর্ম্মজাতবেদা, চিত্রভানু, ত্র্যক্ষ, অহিদত্ত এবং বিশ্বরূপ।

এঁরা যেন একাদশ রুদ্র। সোমামৃতরসের শীকরজালে সর্ব্বদা বিচ্ছুরিত থাকত এঁদের পবিত্র আনন।

চিত্রভানুর ঔরসে, রাজদেবীর গর্ভে বাণভট্টের জন্ম হয়। বাণ যখন শিশু, তখন বিধির বিধানে তাঁর জননী রাজদেবীর মৃত্যু ঘটে। পিতৃদেব মাতার মত স্নেহ দিয়ে বাণভট্টকে লালন করতে লাগলেন। পিতৃস্নেহে পুষ্ট হয়ে নিজগৃহে বাণের বাড়তে লাগল ধৃতিশক্তি।

বাণের তখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স। উপনয়নের পরে সম্পন্ন হয়ে গেছে সমাবর্ত্তন-সংস্কার। এমন সময় শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত পুণ্যকলাপ নিয়ে হঠাৎ অস্ত গেলেন পিতৃদেব।

পিতৃশোকে নিদারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন বাণ। দিবানিশি দগ্ধ হ'ত হৃদয়। নিজের বাড়ীতে মাত্র কয়েকটি দিন যাপন করতে পেরেছিলেন কোনও মতে। তারপরে ধীরে ধীরে যখন মন্দীভূত হ'ল শোকের আবেগ, তখন শৈশব-চাপল্যের

অল্পসময়েই গৃহত্যাগ ক'রে একদা প্রকাণ্ড পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়লেন বাণ,—যেন পৃথ্বী-ভ্রমী।

এর জন্য দায়ী—

অবিনয়ের খনি বন্ধনহীন স্বাধীনতা,
কিশোর বয়সের উদ্দাম কৌতূহল,
যৌবনারম্ভের অধৈর্য্য।

বাণের সাথী ছিল অনেক সমবয়স্ক সুহৃৎ এবং সহায়। নিম্নে লিখিত হচ্ছে তাদের নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়।—

দুই ভাই ছিলেন "চন্দ্রসেন" আর "মাতৃষেণ"; তাঁদের পিতা ব্রাহ্মণ মাতা শূদ্রাণী।

ভাষা-কবি "ঈশান" ছিল বাণের পরম মিত্র।

"রুদ্র" এবং "নারায়ণ" বড় ভালবাসত বাণকে।

"বারবাণ" আর "বাসবাণ"—দুজনেই বিদ্বান।

"বেণীভারত"—বর্ণকবি।

"বায়ুবিকার" ছিল কুলপুত্র—সম্ভ্রান্তগৃহে জন্ম—কিন্তু সে লিখত প্রাকৃতে।

চারণ-গান করত "অনঙ্গবাণ" আর "সূচিবাণ"

এই দলে ছিলেন "চক্রবাকিকা"—প্রৌঢ়া কাষায়ধারিণী বিধবা এবং বিষবৈদ্য "ময়ূরক"।

"চণ্ডক" নামে এক তাম্বূলদায়কের সঙ্গে বাণের ছিল পরমপ্রীতি

ভিষক্‌পুত্র "মন্দারক"
স্বর্ণকার "চামীরক"
হৈরিক "সিন্ধুষেণ"
লেখক "গোবিন্দক"
চিত্রকার "বীরবর্ম্মা"
লেপ্যকার "কুমারদত্ত"

—এঁরাও ছিলেন বাণের পরম সহায়।

নিম্নগ্রথিত বন্ধুদের দল বাণের সঙ্গীত-সাথী ছিল।

মার্দ্দঙ্গিক ছিল—"জীমূত"।

"সোমিল" ও "গ্রহাদিত্য" গাইত গান।

বাঁশী বাজাত "মধুকর" আর "পারাবত"।
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যার উপাধ্যায় ছিলেন "দর্দ্দুরক"।
নৃত্যযুবা—"তাণ্ডবিক"।
নাট্যযুবা—"শিখণ্ডক"।
নর্ত্তকী—"হরিণিকা"।

বাণের অসংখ্য বন্ধুদের মধ্যে আরও একটি দল ছিল। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন :—

প্রসাধিকা "কুরঙ্গিকা", সংবাহিকা "কেরলিকা", দ্যূতকার "আখণ্ডল", ধূর্ত্ত "ভীমক", ভিক্ষু "সুমতি", ক্ষপণক "বীরদেব", কথক "জয়সেন", শৈব "বক্রঘোণ", মন্ত্রসাধক "করাল", খনি-ব্যবসায়ী "লোহিতাক্ষ", ধাতুবেদবিৎ "বিহঙ্গম", কুম্ভকার "দামোদর", ঐন্দ্রজালিক "চকোরাক্ষ" এবং মস্করী "তাম্রচূড়"।

ব্রাহ্মণের সংসার চ'লে যায় এমন অর্থ পিতৃপিতামহের আশীর্ব্বাদে বাণভট্টের ছিল। বংশে ছিল বিদ্যার মর্য্যাদা এবং অবিচ্ছিন্ন বিদ্যাপ্রসঙ্গ। তবুও বাণ সম্বরণ করতে পারেন নি দেশদেশান্তর দেখবার অদম্য কৌতুক। স্বেচ্ছাচারী মন নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে নবযৌবনের ভূতে-পাওয়া বাণ যখন গৃহত্যাগ ক'রে বাহির হয়ে আসেন জগতে, তখন অনেক মহৎ ব্যক্তি হাস্য করেছিলেন।

বাণভট্ট ধীরে ধীরে সংস্রবে আসেন বহু রাজপরিবারের; তাঁদের উদার ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল বাণের মনকে।

বিদ্যালোকী অনেক গুরুকুলের সেবায় বিনোদিত হয়ে,
আলাপ-গম্ভীর পণ্ডিতসমাজের মৈত্রীসুখে পবিত্র হয়ে,
বাণ পূর্ণ করেছিলেন তাঁর গৃহত্যাগী অস্তিত্ব।

এই জগৎ-দর্শনের মধ্যে তিনি বারম্বার ভজনা করেছিলেন নিজের বংশোচিত পণ্ডিত-প্রকৃতিকেই।

এই রকমে অনেক দিন অতিবাহিত ক'রে বাণ শেষে ফিরে আসেন তাঁর জন্ম-ভূমিতে ;—বাৎসায়ন-বংশের আশ্রয়—"ব্রাহ্মণাধিবাসে"।
বহুদিন পরে দেখা,—তাই

নূতন ব'লে মনে হতে লাগল পুরাতন স্নেহ ও সম্ভাব ;

নূতন ব'লে মনে হতে লাগল আত্মীয়স্বজনদের সম্ভ্রমপ্রকাশ।

ছেলেবেলাকার বন্ধুদের আনন্দিত অভিনন্দনে ফুটে উঠেছিল উৎসবদিনের আহ্লাদ। তাই যেন বাল-মিত্রমণ্ডলের মধ্যগত হয়ে মোক্ষসুখ অনুভব করেছিলেন বাণ ॥

ইতি শ্রীবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে
বাৎসায়ন-বংশ-বর্ণনং নাম
প্রথম উচ্ছ্বাসঃ ॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

গম্ভীর একটি কূপ, নেই তার অবতরণিকা।

সেখানে রজ্জুবদ্ধ ঘট দিয়ে অভীষ্ট জল তুলতে হয়। ঐ কূপ-সমান গম্ভীর-প্রকৃতি রাজার সম্মুখে অবতীর্ণ না হ'লেও গুণবদ্ধ ঘটকেরাই বহন ক'রে নিয়ে আসে ইষ্টসিদ্ধির জল। ১

পদ্মফুল অনুরাগী হয়েছে দেখেই দিবসখানি তার উপর নিধান ক'রে দেয় সূর্য্যপ্রভবা শোভা। দোষগুণ বিচার না ক'রেই মানুষের উপর তেমনি ঝ'রে পড়ে সাধুদের পরোপকার-প্রবণ চিত্তের বৃত্তি। ২

বহু-দিন-পরে-দেখা বন্ধুদের আদর ও আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণাধিবাসে বাণের চলল সুখবাস।
আজ এর ভবনে, কাল ওর, এই রকম ক'রে কাটতে লাগল তাঁর দিন।

সেই সব ভবনগুলি অনবরত মুখরিত থাকত অধ্যয়নের ধ্বনিতে। ক্রতুলোভাগত কৃশাণুর মত বটুদের দল, ভবনগুলিতে বাস ক'রে মগ্ন থাকত শাস্ত্রাধ্যয়নে। তাদের ললাটে ভস্মপুণ্ড্রকের পাণ্ডুতা, মাথায় কপিশবর্ণ শিখাজালের জটা।

অঙ্গনগুলির মাঝে মাঝে, সবুজরঙে আঁকা ছবির মত, দেখা দিত সেক-সুকুমার সোমলতার ছোট্ট ছোট্ট ক্ষেত। পাখীরা এসে আহার করবে, তাই,— বালিকারা আনন্দে ছড়াতো নীবারের কণা। কৃষ্ণাজিনের উপর বিছানো থাকত শ্যামাকবীজের তণ্ডুল,—শুষ্ক হ'লে তৈরি হবে পুরোডাশ।

সেই ভবনগুলিতে কোথাও দেখা যেত শুচিস্নান সাঙ্গ ক'রে শিষ্যেরা অঙ্গনের প্রান্তে রেখে দিয়ে যাচ্ছে হরিৎবরণ কুশপুলী পলাশ আর সমিধ্; কোথাও দেখা যেত ঘুঁটের মুটোতে অঙ্গন-ক্রান্তি প্রায় বন্ধ; কোথাও দেখা যেত অগ্নিহোত্র-ধেনুরা খুর-বলয়ের চিহ্ন এঁকে ধ্বংস ক'রে গেছেন অঙ্গন-বেদিকা। বৈতানবেদীর সীমান্তে রাশি রাশি জড়ো করা রয়েছে শঙ্কু এবং যজ্ঞডুমুরের শাখা।

গাছের পাতা হবির্ধূমে ধূসর, ছোট্ট ছোট্ট বৎসীয় বাছুরগুলিকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট রাখাল ছেলে। কোথাও দেখি সাদা আর কালো রঙের ছাগলশিশু খেলছে,—তাদের দেখে মনে প'ড়ে যায় পশুবন্ধপ্রবন্ধ। আবার কোথাও দেখি, বটুকদের পাঠ দিচ্ছে শুক আর তার শারিকা। অবসরে বিশ্রাম নিচ্ছেন উপাধ্যায়। বন্ধুদের ভবনগুলি যেন বৈদিক তপোবন।

ব্রাহ্মণাধিবাসে বাণ যখন বাস করছিলেন, তখন একদা বসন্তকালের অন্তে উপস্থিত হলেন বৈশাখ। অট্টহাসের মত দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ফুল্ল-মল্লিকার শুভ্রতা। নবোদ্যানগুলির উপর অপত্য-স্নেহ দেখিয়ে অকঠোর হলেন বিজয়ী গ্রীষ্ম। এতদিন বসন্তের অধীনে পৃথিবীর পুষ্পরাজ্য ভোগ করেছিল বন্ধনদশা; এখন তাদের বন্ধ-মোক্ষদান করল গ্রীষ্মের নবীন প্রতাপ। 'তুষারে

পুড়িয়েছে আমার কমলিনীকে'—এই রাগে, যেন প্রতিহিংসার উদ্দেশ্য নিয়েই, হিমালয়ের অভিমুখে উত্তরায়ণ করলেন সূর্য্য।

তারপরে যতই প্রখর হয়ে উঠতে লাগল সূর্য্য, ললনাদের ললাটের ইন্দু-বিন্দুগুলি ততই গ্রহণ করতে লাগল সূর্য্য-উপাসনার ব্রত। চন্দনে লিখল ভাল-শ্রী-পুণ্ড্রক, অলকে আনল চীবরের ভ্রান্তি। কুমুদিনীদের মত অসূর্য্যম্পশ্যা হয়ে চন্দনের ধূলো মেখে নিদ্রার মধ্য দিয়ে, দিন কাটিয়ে দিতে লাগল সুন্দরীরা। আহা, যে সব নিদ্রালস আঁখি সইতে পারে না রত্নালোক, তারা কেমন ক'রে সহ্য করবে রৌদ্রের প্রখরতা?

ছোট্ট হয়ে আসতে লাগল নক্ষত্রবতী রাত্রি;—চক্রবাকমিথুনের প্রনন্দিতা জ্যৈষ্ঠের নদীর মত। রৌদ্রে অধীর হয়ে মানুষ কেবল পান করতে লাগল নতুন-ফোটা পারুলফুলের সুরভি-ঢালা বারি, পান করতে লাগল পবন।

ক্রমে সূর্য্যের প্রখর কিরণে খণ্ডিত হ'ল গ্রীষ্মের শৈশব। শুকিয়ে এল সরোবর, জল ক'মে এল নির্ঝরে।

লতার বীণায় বেজে উঠল ঝিল্লীর ঝঙ্কার; কাতর কপোতের বিশ্ববধির কূজন; দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল পাখী।

সিংহের বাচ্ছারা রক্ত ভেবে লেহন করতে লাগল ঘাতকী পুষ্পের স্তবক, আর্ত্ত হস্তিযূথের শুণ্ডজলে আর্দ্র হ'ল গিরিকটক।

ক্রমে গ্রীষ্মের প্রতাপে সিন্দূরিত হয়ে উঠল গ্রামের সীমান্তগুলি,—লোহিতায়মান মন্দারে। মহিষের বিষাণ-কোটির আঘাতে ফেটে যেতে লাগল স্ফটিক-পাষাণের স্বচ্ছ খণ্ড।

ঘর্ম্মমর্ম্মরিত গমূর্ত্তি! তপ্তধূলির তুষানল! গর্ত্ত থেকে বেরতে চায় না সজারুর দল!

তটের অর্জ্জুন গাছে, কুরর পাখীর সে কী কূটজ্বর চীৎকার! চীৎকারে জ্বর এসে গেল পুঁটি মাছদের! তারা পঙ্কশেষ পল্বলের জলে চিতিয়ে উঠতে লাগল।

এ তো গ্রীষ্মকাল নয়—এ যেন রজনীর রাজযক্ষ্মা,
এ যেন দাবানল-জ্বালা জগতের নীরাজন।

এই হেন কঠোর নিদাঘে উন্মাদ পুরুষের মত বইতে লাগল সপ্তবায়ুর দল। ক্ষার-ভূমির উপর দিয়ে আলুথালু তারা চলতে লাগল। লুণ্ঠন ক'রে নিল প্রপার জল, বাট ও কুটীরের শিখরগুলিকে। মুচকুন্দের নূতন কন্দলগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে দ'লে দিয়ে, ব'হে চ'লে গেল। ঝড়-খাওয়া পাখীর মুখর মুখের লালায়—সিক্ত তাদের অঙ্গ।

সেই উন্মাদ বাতাসগুলো যখন খররৌদ্রের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে, তখন তাদের দেখে মনে হ'ল,—কারা যেন মৃগতৃষ্ণিকার মিথ্যা-নদীতে সাঁতরাচ্ছে।

মারব-মার্গ লঙ্ঘনের গতি নিয়ে, শুষ্ক শমীগাছের মধ্য দিয়ে, মর্ম্মররবে ছুটে চলল বাতাস।

রৈণব আবর্ত্তগুলোকে ঘুরিয়ে নিয়ে নিয়ে যেন আরভটী নটেদের মত নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিল রাসের।

দগ্ধ বনস্থলীর অঙ্গার মেখে কালি হয়ে গেল তাদের উন্মাদ-শ্রী।

এই উন্মাদ বাতাসগুলোর ধারা দেখে হাসি পায়।

অরণ্য-ময়ূরদের পেখম থেকে পালক তুলে তুলে তারা চলতে লাগল,—যেন শিক্ষিত ক্ষপণকদের দল;

তাদের প্রত্যেকের গায়ে পাকা করম্‌চার জাল, চলতে ফিরতে বাদ্যি বাজছে শুষ্ক বীজের;

তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন উড়তে উড়তে ছুটেছে সার বেঁধে বায়ু-হরিণ—উন্মাদগুলোর উদ্দাম শিশু।

ধান-মাড়াইয়ের আস্থানে আগুন ধ'রে গিয়েছিল খড়ে,—সেই আগুনের বাঁকা ধোঁয়ার কোণগুলো নিয়ে এই উন্মাদগুলো আঁকল তাদের ভ্রূকুটি। তাদের অঙ্গে সাবীচি-নরকের ঢেউ।

তাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হতে লাগল তাদের আকৃতির।

শাল্মলীফুলের ফাটা তুলোর রোঁয়াতে তাদের দেখাতে লাগল লোমশ; শুকনো পাতার গাঁদি টেনে যখন চলল, তখন মনে হ'ল, তাদের গায়ে ফুটে উঠেছে দক্রু; তৃণবেণীগুলোকে যখন তারা চিরে চিরে ছুটল তখন মনে হ'ল, এই উন্মাদগুলোর অঙ্গে ফুটে উঠেছে

শিরা; শিউরে-দোলা নতুন যবের শীষগুলো যেন এই পাগলগুলোর দাড়ি।

এদের অন্ত ছিল না পাগলামির।

"ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রস নিঃশেষে পান ক'রে ফেলব"—এই খেয়াল মিটাবার লোভে তারা গরাসে গরাসে পান করতে আরম্ভ ক'রে দিল উষ্ণ কমলের মধু;

ত্রিভুবনকে বিভীষিকা দেখাবার আকাঙ্ক্ষায়, শুষ্ক বংশবাটিকায় তারা হঠাৎ বাজিয়ে দিয়ে গেল ঘর্ম্ম-ঘোষণার দুন্দুভি,

হঠাৎ একটি খেলা দেখাল!—উড়ন্ত চাষপাখীর ডানা থেকে পালক খসিয়ে আলপনা এঁকে দিল পথে।

তপ্ত পাহাড়ের তলদেশ থেকে শিলাজতু কুড়িয়ে নিয়ে লেপে দিচ্ছে দিক্। কী দুরন্ত বেগ এই বাতাসের! গিরিগুহায় গম্ভীর ঝঙ্কার তুলে ঘুরতে ঘুরতে ছুটল সেই হাওয়া। ভুবনকে যেন ভস্ম করবার জন্যে অভিচারচরু পাক করতে করতে ছুটল সেই হাওয়া। তরুর কোটরে কোটরে পুড়ে গ'লে গেল চটকদের অণ্ডখণ্ড; সেই পুটপাকের কী কটু গন্ধ! মন্দার-স্তবকের রক্তাহুতি নিয়ে, অরণ্যবহ্নিকে তর্পণ করতে করতে যেন নেচে উঠল সেই হাওয়া।

উন্মাদ মাতরিশ্বাদের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল দারুণ দাবাগ্নি। কখনও মনে হ'ল ইনি যেন স্বচ্ছন্দতৃণচারী পীতশুক্ল হরিণ, কখনও তরুতল-বিবরবিবর্ত্তী বভ্রুবর্ণ নকুল, কখনও পক্ষীনীড়ধ্বংসী শুক্লবরণ শ্যেন।

সহস্র ভস্ত্রার মত হাজার হাজার অজগরের গলগুহার বাতাসে সন্ধুক্ষিত হতে লাগল দাবাগ্নি। রস পান ক'রে মাংসল হয়ে উঠল দাবাগ্নি।

কোথাও উঠল দগ্ধ গুগ্‌গুলের রুদ্রগন্ধ,

দাউ দাউ ক'রে কোথাও জ্ব'লে উঠল মূলশুদ্ধ পুষ্পিত শর আর মদনবৃক্ষ,

ফট্ ফট্ ক'রে কোথাও খৈয়ের মত ফুট কেটে ফেটে গেল নীবার ধানের শুষ্ক বীজ।

অদ্ভুত হ'ল দাবাগ্নির দৃশ্য।

অতি উগ্র এই গ্রীষ্মের একটি অপরাহ্ণে ভোজন সমাপন ক'রে রুদ্ধ ঘরে অবস্থান করছিলেন বাণভট্ট। এমন সময় তাঁর পারশব ভ্রাতা চন্দ্রসেন প্রবেশ ক'রে তাঁকে বললেন—

"মহারাজ কৃষ্ণদেবের নিকট থেকে জনৈক দীর্ঘাধ্বগ দ্বারে এসে অপেক্ষা করছে।

মহারাজ কৃষ্ণদেব—সর্ব্বচক্রবর্ত্তী-ধৌরেয় চতুঃসমুদ্রের অধিপতি মহারাজাধিরাজপরমেশ্বর শ্রীহর্ষদেবের ভ্রাতা।"

বাণ বললেন—"অবিলম্বে নিয়ে এসো।"

চন্দ্রসেনের সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করল দীর্ঘাধ্বগ লেখহারক।

বাণ দেখলেন :—

কর্দ্দম-পঙ্কিল তার উরুলম্বি আঙ্‌রাখা ;
অনেক দূর থেকে হেঁটে আসাতে গুরুভার তার জঙ্ঘা ;
মাথার চারিদিকে লেখমালিকার আবেষ্টনী ;
সূত্রসার বস্ত্রের বন্ধনীতে, কণ্ঠে কি যেন একটি ঝুলছে।

দূর থেকে বাণ প্রশ্ন করলেন—

"ভদ্র, যাঁকে আমরা সকলের নিষ্কারণ-বন্ধু ব'লে জানি, আমাদের মাননীয় সেই কৃষ্ণদেব কুশলে আছেন তো?"

"হ্যাঁ, কুশলে আছেন।"

এই কথা ব'লে প্রণাম ক'রে লেখহারক অনতিদূরে উপবেশন করল। বিশ্রাম ক'রে বললে—"আপনার নিকটে এই লিখনখানি তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মালিকা থেকে লিখনখানি মুক্ত ক'রে তাঁর হাতে অর্পণ ক'রে দিল লেখহারক।

সাদরে গ্রহণ ক'রে বাণ পড়লেন—

"মেখলকের মুখে আমার বক্তব্য শ্রবণ করবেন।
আপনি বুদ্ধিমান, আশা করি বর্জ্জন করবেন—
সাফল্যের প্রতিবন্ধক দীর্ঘসূত্রতা।"

লিখনে এইটিই ছিল মুখ্য কথা, অন্যগুলি বাঁধাবুলি। পরিজনদের সরিয়ে দিলেন বাণ। মেখলক তখন বললে—

"প্রভুর এই ভাষা।—

আপনি আমার মাননীয়। স্নেহ এবং অনুবন্ধের একটি না একটি কারণ থাকে। যেমন সমগোত্রতা, সমান-জাতীয়তা, এক দেশেই বসবাস, নিত্য-দর্শনের অভ্যাস, সমানশীলতা, পরস্পরের অনুরাগ-শ্রবণ, পরোক্ষে উপকার করা এবং এই প্রকার আরও কিছু। আপনার সঙ্গে আমার দেখা নেই, তবু মনে হয় আপনি আমার নিকটে রয়েছেন। অকারণ-পক্ষপাতিত্ব আমার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করেছে, যেমন দূর থেকে কুমুদফুলকে স্নিগ্ধ করে চন্দ্র। আপনি এখানে নেই, কিন্তু এখানে দুর্জ্জনেরা রয়েছে। তারা মহারাজ-চক্রবর্ত্তীকে আপনার বিরুদ্ধে এমন অনেক কিছু বুঝিয়েছে, যা ঘটে নি বা ঘটবে না। আপনার বন্ধু বা নিরপেক্ষ-মধ্যস্থের মত এখানে কেউ নেই। কোন একজন অসহিষ্ণু শত্রু আপনার নামে বিসদৃশ অনেক কিছু রটিয়েছে। তার চিত্তবৃত্তি আপনার শিশুচাপল্যকে অপরাধীর চোখে দেখেছে। অন্য লোকেরা যেমন শুনছে তেমন বলছে। যারা অবিবেকী তাদের চিত্ত দেখেছি গতানুগতিক একটি খাত দিয়ে জলধারার মত লোলভাবে ছুটে চলে। সম্রাট্! তিনি আর কি করতে পারেন! একই কথা অনেকের মুখে বারম্বার শুনতে থাকলে, অটল হয়ে যায় ধারণা ও বিশ্বাস।

মহারাজচক্রবর্ত্তীকে আমরা জানিয়েছি,—

'সকলের মধ্যেই দেখা যায়, প্রথমবয়সে শৈশবকে অপরাধী ক'রে তুলেছে চাপল্য।'

এইরূপ ভাষণে অনেকটা ফল ফলেছে। প্রভুও বুঝেছেন। এখন অবিলম্বে রাজকুলে শুভাগমন আপনার অবশ্যকরণীয়। আমি সমীচীন মনে করি না—কেবলমাত্র বন্ধুদের মধ্যে ব'সে থেকে দিনাতিপাত করা। তাই যদি করেন, তা হ'লে অরণ্যের নিষ্ফল তরুর মত জীবন কেটে যাবে। সমাদর পাব না—এই কথা ভেবে মহারাজচক্রবর্ত্তীর সভায় অনাগমন বা আগমন-ভীতি আপনার নিকটে আশা করি না।

এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে, যথা—

'কবিরা শ্রীকন্দর্পের তুলনা দিয়ে থাকেন—দুর্বিদগ্ধ নৃপতির সঙ্গে।
কারণ দুজনেই জীবনটাকে হঠাৎ মোহের মধ্যে ফেলে দিয়ে যান—
অবিচারীর মত। দুঃখ দেন, খরশরের মত সহস্র সহস্র উপায়ে।' ৩।

অনেক নৃপতি রয়েছেন, যাঁদের উপর এই কবি-উক্তি খাটতে পারে,
কিন্তু আমাদের মহারাজ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। তিনি অমৃতের যেন
পরিণতি। নৃগ, নল, নিষধ, নহুষ, অম্বরীশ, দশরথ, দিলীপ, নাভাগ,
ভগীরথ, এবং যযাতি,—এঁদের চেয়েও মহীয়ান আমাদের মহারাজ।
এঁর নয়নাঞ্জনে নেই অহঙ্কারের কালকূট ;
এঁর বাণী ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না গর্ব্বের গলগ্রহে ;
এঁর পরিস্থিতি স্থৈর্য্য ভোলে না উন্মার অপস্মারে ;
বক্ত্রাধরে গড়িয়ে পড়ে না অনির্ভর অক্ষর।
যা কিছু সাধু এবং নির্ম্মল,—তাতেই তাঁর রত্নবুদ্ধি ;
মুক্তাশুভ্র গুণগ্রামই তাঁর কাছে অলঙ্কার,
—প্রস্তরিত আভরণের প্রাচুর্য্য নয় ;
জীবনের জীর্ণ তৃণে তাঁর বিশ্বাস নেই,
—রয়েছে যশে ;

প্রজারঞ্জনই তাঁর লক্ষ্য। তিনি পান করেন—মদ্য নয়—আনন্দ। চর্ম্ম-পুত্রিকার মত কলত্ররঞ্জনে তাঁর বাসনা নেই। গুণবান্ ধনুকই তাঁর সহায়, পিণ্ডজীবী ভৃত্যেরা—অনাদর।

মহারাজচক্রবর্ত্তীর মহিমার কথা ব'লে শেষ করা যায় না।
মিত্রের উপকার করা, বন্ধুর জন্যে ধনলক্ষ্মী বিতরণ করা,
—তাঁর আত্মার সর্ব্বকালীন অভিলাষ।
তাঁর প্রভুত্ব ভৃত্যদের উপাদান।
পণ্ডিতরা বিশ্রাম করেন তাঁর বৈদগ্ধ্যের ছায়ায়।

যারা স্বল্পপুণ্য, তারা রাজচক্রবর্ত্তীর আনন্দস্যন্দিনী চরণপল্লবের ছায়ায় অধিকার লাভ করে বিশ্রামের।

ঐশ্বর্য্য তাঁর,—কিন্তু উপকার পায় যারা কাঙাল, যারা ব্রহ্ম-নিষণ্ণ ;
তাঁর হৃদয় বিস্মৃত হয় না শুভকার্য্যের প্রতিদান ;
তাঁর আয়ুর প্রয়োজনের মূলে রয়েছে ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি ;
বিপদের মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি লাভ করেন শরীরধারণের আনন্দ।"

শেষ হ'ল মেখলকের সংবাদ-দান।

বাণ তখন চন্দ্রসেনকে বললেন—"এঁকে নিয়ে যাও, দেখো, অশনবসনের এবং বিশ্রামসুখের ক্লেশ যেন না হয়।"

বিদায় নিল মেখলক। দেখতে দেখতে গড়িয়ে গেল বেলা। বৈকালী রৌদ্রটিকে পাত্র ভ'রে ভ'রে পান ক'রে রক্তপদ্মগুলি মুদ্রিত হয়ে গেল।
ক্রমে শিথিল হ'ল সপ্তাশ্বের গতি।
সূর্য্যদেবের মুখ!—

গাঢ় লাল—

যেন জবাফুলের তোড়া।

কমলিনীদের কণ্টকে ছিন্ন তাঁর চরণ, পঙ্গু অবশদেহে প'ড়ে গেলেন অস্তপাহাড়ের শিখরে!

যখন সায়ংসন্ধ্যা সমাপন ক'রে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করলেন বাণ, তখনও চাঁদ ওঠে নি আকাশে।

রজনীর বিরহশ্যাম মুখে তখনও ধীরে ধীরে দুলছে তমঃকণার গুচ্ছ গুচ্ছ অলক।

শয়ন-মন্দিরের বিজনতায় চিন্তা করতে লাগলেন বাণ—

"এখন কি করা যায়? আমার সম্বন্ধে দেখছি মহারাজ হর্ষদেবের মনে জ'ন্মে গেছে অন্য কিছু ধারণা। কৃষ্ণদেব এই কথাই তো আমাকে ব'লে পাঠিয়েছেন। এখন কি করা যায়! সেবা জিনিষটাই কষ্টদায়ক। ভৃত্য হয়ে থাকা—অসহ্য। বিরাট রাজগৃহের ব্যাপারও গুরুতর, তল পাওয়া যাবে না। এমন নয় যে, এই রাজবংশের প্রতি পিতৃপিতামহের কাল থেকে আমাদের বংশের একটা প্রীতি জ'ন্মে গেছে। সেখানে আমাদের গতিবিধি নেই, উপকার এবং প্রত্যুপকারের বাধ্যবাধকতা নেই। আমাকে যে তাঁরা মানুষ করেছেন—তাও বলা চলে না। আমার গৌরব যে বাড়বে, তাও আমি আশা করি না। তবে কি করা যায়! একটি দিনের জন্যও মহারাজকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নি। প্রজ্ঞাসংবিভাগের মিথ্যা প্রলোভন দেওয়া অসাধ্য। এমন কিছু আমি জ্ঞানী নই।

আমার এমন সৌন্দর্য্য নেই যে, দর্শনদানেই তাঁর মন ভোলাব। কী করি! নিজেকে বাঁচিয়ে কথা-ঘুরানোর কৌশল আমার জানা নেই, খরচ ক'রে সকলকে বশে আনব তারও উপায় নেই, রাজার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও

নেই স্নেহের পরিচয়। যাক্, ভেবে লাভ নেই। যাওয়াই মঙ্গল। ভগবান্ পুরারাতি যা ভাল বোঝেন, করবেন।”

তার পরের দিন ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে গেল বাণের। স্নান সমাপন ক'রে ক্ষৌমবসনের শুভ্রতা, হস্তে স্ফটিকের জপমালা, প্রাস্থানিক-সূক্ত এবং মন্ত্রপদ বহুবার পাঠ ক'রে দেবদেব বিরূপাক্ষের বিরচন করলেন পূজা। ক্ষীর দিয়ে স্নান করিয়ে অর্ঘ্য দিলেন গন্ধফুলের। বেদীর চৌদিকে গন্ধধূপের ধোঁয়া, ধ্বজা আর প্রদীপের আনন্দ। অগ্নিদেবকে সভক্তি আজ্যাহুতি দিলেন বাণভট্ট। ফুটে উঠল তিল। শিখরে শিখরে সঙ্কেত এল শুভযাত্রার।

গলায় ঝুলিয়ে শ্বেতপুষ্পের মাল্য, অঙ্গে পরিয়ে শ্বেতচন্দনের অঙ্গরাগ, শিখায় সংসক্ত ক'রে সিদ্ধার্থক, শ্রোত্রশিখরে বাণ পরলেন মাঙ্গলিক কর্ণফুল ;—

রোচনা-চিত্রিত এক গিরি-কর্ণিকার কর্ণফুল !

কনিষ্ঠা পিতৃষ্বসা মালতীদেবী এলেন; শুভ্র-বসনা, সাক্ষাৎ যেন ভগবতী মহাশ্বেতা। মায়ের মত স্নেহ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুষ্ঠান করলেন যাত্রামঙ্গল। সাশীর্ব্বাদ বিদায় দিলেন বংশের প্রাচীনারা। অনুজ্ঞা দিলেন বন্দিতচরণ আচার্য্যেরা। কুল-বৃদ্ধেরা এলেন; বাণ তাঁদের নমস্কার করলেন, তাঁরা করলেন শিরঃঘ্রাণ। যাত্রা-পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করলেন নক্ষত্র-শান্তি পূর্ণ কুম্ভ।—সেই পূর্ণ কুম্ভটি রক্ষিত ছিল একটি মার্জ্জিত হরিতবরণ অঙ্গন-বেদীতে। তার কণ্ঠ কুসুমিত, তার বক্ষে সুধাচূর্ণের পঞ্চাঙ্গুলির স্থাসক। কুম্ভশিরে নবীন আম্র-পল্লবের শোভা।

অতিরথ-মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে, কুলদেবতাদের প্রণামাঞ্জলির অর্ঘ্য নিবেদন করতে করতে,

বাণভট্ট সঞ্চালিত করলেন তাঁর যাত্রাপ্রথম দক্ষিণ চরণ।
বিদায় নিলেন প্রীতিকূটের।

প্রথম দিনের অধ্বপরিশ্রমের পর ‘মল্লকূট’ গ্রামে পৌঁছলেন বাণ। চণ্ডিকা-কানন অতিক্রম ক'রে পৌঁছতে হয় মল্লকূটে। সারা কানন গ্রীষ্মের প্রদাহে—জলহীন। বরাট বিরাট বৃক্ষ, কিন্তু শাখাগুলি পত্রহীন। সমস্ত কাননটিকে একবার মনে

হয়—শুষ্ক,—আবার পরক্ষণেই মনে হয়—পল্লবিত,—তৃষিত শ্বাপদকুলের লম্বিত লোলজিহ্বার সহস্র সহস্র লতায়, ভল্লুক এবং গোলাঙ্গুলগুলির আক্রমণে। মধুগোল থেকে কাননটিকে পুলকিত ক'রে মৌমাছিরা উড়ছে। স্থূল অভীরু গাছে শত শত কন্দল।

দগ্ধস্থলী কানন রোমাঞ্চিত।

এই চণ্ডিকা-কাননের প্রবেশপাদপে উৎকীর্ণ ছিল কাত্যায়নীদেবীর একটি প্রতিযাতনা। সেইটিকে নমস্কার না ক'রে পথিকেরা সাহস করত না প্রবেশ করতে কাননে।

মল্লকূটে সুখবাস করেছিলেন বাণভট্ট, ভ্রাতা চন্দ্রসেন ও 'জগৎপতি'নামা—সুহৃদের অর্চনা এবং আতিথ্যে কৃতার্থ হয়ে।

ভাগীরথী উত্তরণ ক'রে বাণভট্ট তার পরের দিন রাত্রি যাপন করেন—একটি ছোট্ট বনগ্রামে, নাম 'যষ্টিগ্রহক'। এবং তার পরের দিন 'অজিরবতী' নদীর তীরে 'মণিতার' নগরে,—যেখানে মহারাজ শ্রীহর্ষের সন্নিবেশিত হয়েছিল প্রাসাদ-শিবির—সেখানে পৌঁছে যান বাণ। তাঁর আস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল রাজভবনের অনতিদূরে।

স্নানাহার সমাপন ক'রে কিছুকাল বিশ্রান্তির পর মেখলককে সঙ্গে নিয়ে রাজদ্বারের দিকে অগ্রসর হলেন বাণ। প্রখ্যাত রাজন্যদের শিবির-সন্নিবেশ,—একটি দ্রষ্টব্য! বেলা তখন এক প্রহর বাকি। মহারাজ শ্রীহর্ষের সমাপ্ত হয়ে গেছে ভোজন-বিলাস।

রাজদ্বারে পৌঁছানো, সে কি সহজ ব্যাপার!

হস্তীতে হস্তীতে শ্যামায়মান হয়ে গিয়েছিল রাজদ্বার। তারা যে-সে হস্তী নয়; প্রত্যেকটিই যেন হস্তীরাজ্যের এক-একটি ইন্দ্র।

দ্রষ্টব্য বটে নাগেন্দ্র-পল্লী!

বাণ দেখলেন—

গজকুম্ভে পট্টবন্ধনের উদ্দেশ্যে একটি দলকে নিয়ে আসা হ'ল;
একটি দলের পিঠে বাঁধা হ'ল দুন্দুভি;

দেখতে দেখতে নূতন একদল জিঞ্জির-বাঁধা হাতী এল ;

হাতী আসতে লাগল রাজস্বের মত, উপহার-স্বরূপে। নাগবীথিপাল খেদা থেকে যে সব হস্তী এবং হস্তিনী পাঠিয়েছিল, তারা এসে উপস্থিত হ'ল। মহারাজ হর্ষের প্রথম-দৃষ্টির সৌভাগ্যলাভের লোভে আনীত হ'ল বহু হস্তী।

হস্তী-ভেট নিয়ে উপস্থিত হ'ল পল্লীপরিবৃঢ়েরা।

একদল হাতী এল ;—তারা অভিনয় দেখিয়ে রাজাদের নির্ব্বাপিত ক'রে যায় কৌতুক ;—তারা হস্তীযুদ্ধের হস্তী!

সেই সময়টুকুর মধ্যেই দাতব্য হয়ে গেল অনেক হস্তী। কতকগুলি আচ্ছিদ্যমান হ'ল, কতকগুলি মুচ্যমান হ'ল। প্রহরে প্রহরে প্রহরা দিতে বেরিয়ে গেল যামহস্তীর দল।

তার পরে বাণের চোখে পড়ল তুরঙ্গের তরঙ্গ। তারা যেন মৃদঙ্গের মত খুরধ্বনিতে নাচিয়ে দিচ্ছিল রাজলক্ষ্মীকে। দাহানার দুই কষে শুভ্রফেনের অট্টহাস। 'রণং দেহি' ব'লে হর্ষহ্রেষার তূর্য্য বাজিয়ে তারা যেন আহ্বান করছিল উচ্চৈঃশ্রবাকে। মণ্ডন-চামরের পক্ষ মেলে তারা যেন ভেদ করতে চায় গগনতল।

তারপর বাণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কপি-কপোল-কপিল উষ্ট্রের সংহতি। তাদের বর্ণপ্রভায় পিঙ্গল হয়ে গিয়েছিল রাজদ্বার।

উষ্ট্রসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে পাঠানো হয়ে গিয়েছিল, কতকগুলিকে পাঠানো হচ্ছিল, কতকগুলি আবার বার্ত্তাবহের কৃত্য সমাধা ক'রে ফিরে আসছিল। তাদের মুখে কড়ির মাল্য ;—কত যোজন পথ চলেছে সেই সংখ্যাগণনার যেন অক্ষর। কড়ির মাল্য থাকায় সেই ক্রমেলক-সংহতিকে মনে হচ্ছিল, যেন তারা নক্ষত্রিত সন্ধ্যায় খণ্ড খণ্ড রৌদ্র। তাদের অরুণবরণ চামরিকার কর্ণপূর যেন রক্তোৎপল ; তাদের গাত্রচর্ম্ম যেন রক্তশালিধান্যের ক্ষেত্র। তাদের গলায় ঝন্ঝন্ ক'রে বাজছিল স্বর্ণসুন্দর ঘুরুঘুরুক ঘণ্টার মালিকা,—করঞ্জবনে যেন শব্দ ক'রে ফাটছিল শত শত শুষ্ক-বীজের কোশী।

তার পরে বাণ দেখতে পেলেন হাজার হাজার শ্বেতায়মান আতপত্রের খণ্ড,— যেন এক শ্বেতদ্বীপের সৃষ্টি।

সেই ছত্র-সৌন্দর্য্য চিত্তপটে ভ্রান্তি আনে বৃষ্টিশেষ শারদীয় শুভ্রমেঘের। সেগুলিতে ছিল মুক্তাফলের জালক, প্রসন্নপ্রবালের দণ্ড, এবং শেষ-নাগের ফণাফলকের মত পরিস্ফুরৎ স্ফীত মাণিক্যের খণ্ড।

কোন কোন ছত্রের শিখরে আবার রাজহংসের চিত্রণ,—যেন রাজহংস-সেবিত শ্বেতগঙ্গার পুলিন।

সেই ছত্রগুলি

যেন পরাস্ত করছিল গ্রীষ্মকে, উপহাস করছিল সূর্য্যের প্রতাপকে, পান করছিল রৌদ্ররসকে।

রাজদ্বারের যতই সন্নিকটে আসতে লাগলেন বাণ, ততই বর্ণবৈচিত্র্যে বিস্মিত হতে লাগল তাঁর হৃদয়।

হঠাৎ মনে হ'ল, রাজদ্বারটি যেন দোলায়িত হচ্ছে সহস্র সহস্র জ্যোৎস্না-শুভ্র চঞ্চল চামরের সঞ্চালনে—

সে চামরগুলি যেন অন্তরীক্ষে মৃণালসূত্রের আবির্ভাব;

সে চামরগুলি যেন শরৎকালের হিল্লোলিত কাশফুলের ঢেউ।

রাজদ্বারখানি রত্নসম্ভারের একটি প্রস্ফূর্ত্ত ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তিরূপে হ'ল প্রতীয়মান,

করিকর্ণের শঙ্খ-শুভ্রতায়—হংসযূথায়মান,

পতাকায়—কল্পলতা অরণ্যায়মান,

ময়ূরপিচ্ছে—মাণিক্যায়মান।

সেখানে অংশুকে অংশুকে ব'হে যাচ্ছিল মন্দাকিনীর প্রবাহ,

ক্ষৌম বসনের লসনে উল্লসিত হচ্ছিল ক্ষীরোদসাগর,

পান্নার কিরণে কিরণে সৃষ্টি হচ্ছিল কদলীবনের শ্যামশ্রী।

সেখানে ছড়ানো ছিল এত পদ্মরাগ, যে তাদের আভায় রাজদ্বারে যেন জন্ম নিয়েছিল নতুন একখানি দিন;

ছড়ানো ছিল এত ইন্দ্রনীলমণি, যে তাদের প্রভায় উৎপন্ন হয়েছিল নতুন একখানি আকাশ ;
ছড়ানো ছিল এত মহানীল, যে তাদের কৃষ্ণকিরণে সূচিত হয়েছিল এক অপূর্ব্ব নিশা ;
ছড়ানো ছিল এত গরুড়মণি, যে তাদের ছটায় স্যন্দমান হয়েছিল সহস্র সহস্র যমুনা ;
ছড়ানো ছিল এত পুষ্পরাগমণি, যে তাদের রক্তরশ্মিতে রাজদ্বারে যেন জ্ব'লে, উঠেছিল আগুন-লাগা এক মঙ্গল-নক্ষত্র।

সেই রাজদ্বারে কত যে ভুজনির্জ্জিত শত্রু মহাসামন্ত উপস্থিত ছিল তার ইয়ত্তা নেই।

তাদের অনেকে পায় নি প্রবেশাধিকার।
অনেকে ব'সে ছিল মাথা হেঁট ক'রে।
কেউ নখ দিয়ে বিলিখন করছিল ভূমি, নখরকিরণগুলি যেন—সেবাচামর ;
কারোর বুকে ইন্দ্রনীলমণির তরলপ্রভা ; দেখে মনে হয়, মহারাজের ক্রোধশান্তির উদ্দেশ্যে যেন তারা কণ্ঠে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে কৃপাণপট্ট।
অনেকে ধারণ করেছিল দীর্ঘশ্মশ্রু।

আবার অনেকে বিজিত হ'লেও অনন্যশরণ হয়ে সম্মানিতের মত ব'সে ছিলেন। যে সকল প্রতীহারেরা অর্থী প্রার্থীর অনুনয় এবং বিনয়ের সঞ্চয় গ্রহণ ক'রে সদাসর্ব্বদা ভিতরে যাওয়া-আসা করছিল,—কেউ কেউ তাদের অশ্রান্ত শতপ্রশ্নে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'ভদ্র, আজই তো দেখা হবে ? দেখা দেবেন তো মহারাজ ?' পরমেশ্বরের দর্শনাশায় এইরকমে সারাদিন অতিবাহিত করছিল শত্রুসামন্তেরা।
সেই রাজদ্বারে বাণভট্ট দেখতে পেলেন আরও অনেকে উপস্থিত রয়েছেন,—যাঁরা এসেছেন দূর দূর দেশ থেকে। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন মহীপাল ; মহারাজের প্রতাপানুরাগে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা এসেছিলেন মহারাজের সেবার প্রতীক্ষায়।

তাঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল—একান্তে উপবিষ্ট রয়েছেন দলে দলে জৈন, অর্হৎ, পাশুপৎ, পারাশরি, ব্রহ্মচারী, নানান দেশজন্মা জানপদ, সর্ব্বসমুদ্র-তীরবনবলয়বাসী ম্লেচ্ছজাতি, দেশ-দেশান্তর থেকে আগত রাজদূত।

এই সব দেখতে দেখতে বাণ উপস্থিত হলেন রাজদ্বারে ;—
তার সমৃদ্ধিসম্ভার শত শত মহাভারতেরও অকথনীয়।

প্রজাপতির যেন প্রজা-নির্ম্মাণভূমি,
ত্রিলোকের সার দিয়ে গড়া যেন চতুর্থলোক,
সহস্র সহস্র কৃতযুগের কল্পিত নিবেশ,
অর্বুদ অর্বুদ স্বর্গের রমণীয়তার রচনা,
কোটি কোটি রাজলক্ষ্মীর আদৃত আস্থান।

সঞ্জাতবিস্ময় বাণ মনে মনে ভাবতে লাগলেন—

"এত, এই ; এই বিরাট-প্রমাণ প্রাণিজাতকে সৃষ্টি করতে কি পরিশ্রম হয় নি প্রজাপতিদের ? হয় নি কি মহাভূতদের পরিক্ষয় ? বিচ্ছেদ হয় নি কি পরমাণুদের ? অন্ত হয় নি কি কালের ? শেষ হয় নি আয়ু ? পরিসমাপ্তি হয় নি আকারসৃষ্টির ?"

রাজদ্বারের দ্বারপালেরা দূর থেকেই চিনতে পেরেছিল,—মেখলককে। "পুণ্য-ভাগিন্, এখানেই তা হ'লে ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন" এই কথায় বাণকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে, অপ্রতিহতগতি মেখলক রাজদ্বার অতিক্রম ক'রে ভিতরে প্রবেশ করল।

ক্ষণকাল পরেই ফিরে এল মেখলক। তার পশ্চাতে এল একজন প্রাংশু পুরুষ।

কর্ণিকার ফুলের মত গৌর তার রঙ,
স্বচ্ছ কঞ্চুকে আচ্ছন্ন তার দেহ,
মাণিক্যের পদক-আঁটা সোনার কোমরবন্ধে কৃশ দেখাচ্ছে তার কটি,
হিমালয়ের শিলার মত বিশাল বক্ষ,
ধূর্জ্জটির বৃষের ককুদের মত বিকট তার অংসতট ;
তার বুকের উপর দুলছিল একখানি হার

—চঞ্চল ইন্দ্রিয়-হরিণদের যেন সংযমন-পাশ ;

দুটি কানে জ্বলছিল মণিকুণ্ডলের জোড়,

—যেন চন্দ্র আর সূর্য্যকে ধ'রে নিয়ে এসে প্রশ্ন করা হচ্ছে "বলতে পারেন, পূর্ব্বযুগে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যবংশজাত কোনো ভূপতি আমাদের মহারাজের মত ছিলেন কি ?"

তার শ্রীআননের জ্যোতির্বেণিকার কাছে তিরস্কৃত হয়েই যেন এবং তার অধিকার-গৌরবকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েই যেন, সূর্য্যদেব কিরণ-বিকীরণ ক'রে পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছিলেন তার পথ।

মহারাজের প্রসাদ লাভ ক'রেই সে মস্তকে ধারণ করেছিল বিকচপুণ্ডরীকের বিশিষ্ট মাল্য ;

তার দীর্ঘ দৃষ্টি দূর থেকেই আনন্দিত করছিল জনতাকে ; নৈষ্ঠুর্য্যের অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও পদে পদে তার অবনম্র হচ্ছিল শুভ্র উষ্ণীষধারী শির ;

বাম করে কৃপাণের শোভা, কৃপাণের ৎসরুটি স্থূল মুক্তাফলের চ্ছুরণে দন্তুর ;

দক্ষিণ করে শাতকৌম্ভী চিক্কণ বেত্রযষ্টি,—

যষ্টিখানি যেন একখানি তাড়িতীলতা,

হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে

যার অস্থির চঞ্চলতা।

মেখলক বললে—

"ইনি মহাপ্রতীহারদের অগ্রণী দৌবারিক। এঁর নাম 'পরিযাত্রা'। মহারাজের প্রিয়। কল্যাণকামী আপনি এঁকে অনুগৃহীত করুন যোগ্য সমাদরে।"

অগ্রসর হয়ে এল দৌবারিক। তারপর বাণকে প্রণাম ক'রে মধুর বিনয়ে নিবেদন করলে, "আসুন। মহারাজের সঙ্গে দর্শন হবে, ভিতরে আসুন। প্রসন্ন রয়েছেন মহারাজ।"

"আমিও ধন্য, মহারাজ যখন আমাকে অনুগ্রাহ্য বিবেচনা করেন।"

এই কথা ব'লে বাণ দৌবারিক-প্রদর্শিত পথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

প্রবেশ ক'রেই সর্ব্বপ্রথমে বাণের নেত্র-গোচর হ'ল মহারাজের প্রিয় তুরঙ্গের মন্দুরা।

ঘোড়ায় ঘোড়ায় ভরা।

তাদের মধ্যে রয়েছে বনায়ুজ, আরট্টজ, কাম্বোজ, ভারদ্বাজ তুরঙ্গ ;
রয়েছে সিন্ধুদেশীয়, রয়েছে পারস্যদেশীয় ;
রয়েছে পদ্মের মত অরুণবরণ ঘোড়া ;
রয়েছে শ্যাম রঙের, শ্বেত রঙের, হলুদ রঙের ঘোড়া ;
সবুজ রঙের আভা কারোর গায়ে,
কারোর গা আবার তিত্তির পাখীর মত গুলদার।
পঞ্চকল্যাণ যে কত ঘোড়া ছিল তার ইয়ত্তা নেই।
কতকগুলি ঘোড়ার চোখ মল্লিকাফুলের মত শুক্লবর্ণে বেষ্টিত
—তারা মল্লিকাক্ষ।
কতকগুলো ঘোড়া আবার কৃত্তিকানক্ষত্রের মত বুটিদার
—তারা কৃত্তিকাপিঞ্জর ;

তাদের দীর্ঘ নির্মাংস মুখ,
ক্ষুদ্র কর্ণকোশ,
সুবৃত্ত শ্লক্ষ্ণ সুন্দর-গঠন গলদেশে ঘন্টিকাবন্ধ,
যূপের মত সুঠাম বক্রায়ত উদগ্র গ্রীবা,
উপচয়-স্ফীত স্কন্ধসন্ধি,
সামনে-বেরিয়ে-আসা বক্ষ,
মাংসহীন সরল জঙ্ঘা, এবং
লৌহপীঠ কঠিন খুরের,—
প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

এত সুন্দর দেখতে তাদের গোলগড়ন উদর যে, মনে হয় অতিবেগে দৌড়তে গেলে পাছে ছিঁড়ে যায় এই ভয়ে ভগবান তার মধ্যে সন্নিবেশিত করেন নি অন্ত্র। তাদের পৃথু জঘন উদ্দৎ-দ্রোণী দিয়ে ভাগ করা। মাটি ছুঁয়ে পুচ্ছপল্লব দুলছে।

তাদের মধ্যে অনেকগুলিকে মাটিতে পোঁতা শক্ত দড়ি দিয়ে দু পাশ দিয়ে বেঁধে, কোন রকমে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। পিছন থেকে দড়ি দিয়ে কারোর একটি পা টেনে সটান ক'রে বাঁধা, তাই দীর্ঘদেহ হ'লেও অশ্বটিকে দীর্ঘতর দেখাচ্ছে। কারোর কারোর গলায় হরেক-রঙা-সুতোয়-গাঁথা অলঙ্কার দুলছে, কারোর বুজব-বুজব ক'রে আসছে চোখ।

আবার অন্য কতকগুলো গায়ে সুড়সুড়ি লাগাতে চামড়া চমকিয়ে চমকিয়ে গাখানাকে ঝাঁকাচ্ছে, দাঁত দিয়ে চামড়া ধরছে আর ছাড়ছে—লোমে লাগছে দূর্বা-রসশ্যাম ফেনার কণা। অগাধ আলস্যে গায়ের উপর লেজের চামর বোলাচ্ছে কতকগুলো ঘোড়া। এক পায়ের খুরের উপর ভর দিয়ে এক দিকের কোমরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর কতকগুলো; কতকগুলো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে যেন ধ্যান করছে; কতকগুলো মাঝে মাঝে শব্দ করছে ফরর-ফরর; ঘাস বিচিলি খাবার অভিলাষ জানিয়ে, কতকগুলো আবার খুর-ধারণী কাঠের উপর খুরের আঘাত ক'রে আগা দিয়ে মাটি ওলটাচ্ছে। অন্য ঘোড়ার সামনে যবের আঁটি পড়ছে দেখে, কতকগুলো ছটফট করছে হিংসায় রাগে; আবার তারাই চণ্ড চণ্ডালদের গলার হুঙ্কার শুনে ভয় পেয়ে তখনি থেমে যাচ্ছে;—কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদের দীর্ঘ চোখের কাতর তারা। তুরঙ্গদের দেহ ছিল কুঙ্কুম দিয়ে মাজা, তাদের দেহ দেখে মনে হয় যেন মহারাজের এই প্রিয় তুরঙ্গেরা সর্ব্বদা নীরাজন অনলের সন্নিহিত রয়েছে।

সুখী তারা, তাই তাদের মাথার উপর বিতত ছিল চন্দ্রাতপ।

বড় আদরের তারা, তাই তাদের মন্দুরার পুরোভাগে পূজিত হচ্ছিলেন অভিমত দেবতা।

মন্দুরা অতিক্রম ক'রে আরও কিছুদূর এগিয়ে চললেন বাণ। বাঁ হাত কাটিয়ে একটু অগ্রসর হতেই তাঁর হৃদয়ের কুতূহল দেখতে পেল, প্রচণ্ড এক হস্তীশালা। দূর থেকে চেনা যায় না এটিকে হস্তীশালা ব'লে।

এত তার উচ্চতা যে আকাশকে নিরবকাশ ক'রে দিয়েছে; হস্তীশালার প্রান্ত ঘিরে প্রকাণ্ড এক কদলীবন; সেই কদলীবনের মধ্য দিয়ে ব'য়ে চলেছে নদীর জলধারার মত মধুকরময়ী মদস্রুতি; ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে উপদিগ্ধ ক'রে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ফুল্লবকুলের ভ্রান্তি-জাগানো সেই মদগন্ধ।

বাণ জিজ্ঞাসা করলেন পরিযাত্রাকে—

"এখানে মহারাজ কি করছেন?"

পরিযাত্রা উত্তরে বললে—

"মহারাজের একটি বিক্রমক্রীড়া সুহৃৎ রয়েছে। সেটি বারণপতি 'দর্পশাত'। সার্থকনামা রাজবাহন এই দর্পশাত মহারাজের জাত্যন্তরিত আত্মা, তাঁর

বহিশ্চর প্রাণ। এই যে বিরাট প্রাসাদটি দেখা যাচ্ছে এটি তারই আস্থানমণ্ডপ।"

বাণ বললেন—

"ভদ্র, দর্পশাতের নাম শুনেছি। যদি দোষ না হয়, তা হ'লে বারণেন্দ্রকে একবার দেখি। বাধিত হব যদি সেখানে আমাকে নিয়ে চল। কুতূহল আমাকে পরবশ করেছে।"

"বেশ, ভাই চলুন। দোষ হবার কিছু নেই।"

ইভধৃষ্ণ্যাগারে প্রবেশ ক'রে দূর থেকেই বাণ শুনতে পেলেন দর্পশাতের শুণ্ড-নিঃসৃত গম্ভীর গল-গর্জ্জন। দেখতে পেলেন—হস্তি-গর্জ্জনকে মেঘমন্দ্র বিবেচনা ক'রে আকাশে উড়ছে চাতককদম্ব, এবং মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—অকাল-কোলাহল সৃষ্টি ক'রে—কলকেকা-কলকল-মুখরমুখ ভবন-নীলকণ্ঠের দল। পৃথিবী যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে কদম্বসংবাদি মদসুরার সৌরভে।

বারণেন্দ্র দর্পশাত দাঁড়িয়ে ছিল—কায়বন্ত যেন অকালশ্রাবণ।

মদোদয়ের সরোবরে স্নান ক'রে সে যেন তখন সবেমাত্র বিসর্জ্জন দিয়েছে মধুবিন্দুপিঙ্গল-পদ্মাকারমতী প্রৌঢ়া চতুর্থীদশা এবং পঞ্চমীতে প্রবেশ করবে ব'লে অবতংস-শঙ্খের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমন্দ্র-কর্ণতালের দুন্দুভি বাজিয়ে গান করছে আনন্দে।

সে তার দীর্ঘ দেহটিকে অবিশ্রান্ত দোলাচ্ছিল, তিন পায়ে ভর দিয়ে—ললিতলাস্যের বিচিত্রতায়। এবং প্রাচীরতটে গাত্র মার্জ্জনা ক'রে মেটাচ্ছিল কণ্ডূতি। তার দীর্ঘ দেহের চেষ্টা দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বাহির হয়ে যেতে চায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবী থেকে।

বহু দিনের পুরাতন পরিচিত মাহুতেরা সরস-কিশলয় ও লতার গ্রীষ্মকালোচিত উপচার দিয়ে দর্পশাতকে পরিতৃপ্ত করতে লাগল এবং ঘাসিকেরা তার গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল মৃণাল ও শৈবাল-মিশ্রিত শীতল সলিল।

দর্পশাত যখন শুঁড় উচু ক'রে দাঁড়াল তখন মনে হ'ল, সে যেন দিগ্বারণদের আহ্বান করছে যুদ্ধে; যেন সে দ্বীপ, কানন, সমুদ্র, পর্ব্বত, দিক্, চক্রবাল, সমস্ত

অর্গলিত ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে; যেন সে আঘ্রাণ পেয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী মত্তগজের; অনেক যুদ্ধের বিজয়গণনা-লেখার মত বলিবলয়ের শোভায় তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে তার—শুণ্ডদণ্ড।

যখন বিরাট নগ্নতায় তার তীক্ষ্ণ দন্তজোড় দেখা গেল তখন মনে হ'ল সে যেন তার দাঁতের করাত দিয়ে ব্রহ্মস্তম্ভকে চিরে ফেলতে চায়। গজদন্তের কি অপূর্ব্ব কান্তি! এ যেন এক শুভ্র কুমুদ-ফোটানো কান্তি, এ যেন আ-দিগন্ত যশোরাশিকে ছড়িয়ে-দেওয়া কান্তি!

শুণ্ডোদ্ধরণলীলার অবকাশে বারণেন্দ্রের রক্তাংশুক-সুকুমারতল দেখা যাচ্ছিল তালু;—রক্তপদ্মের একখানি বনকে যেন একবার গিলে ফেলে দর্পশাত আবার যেন উদ্গীর্ণ ক'রে দিচ্ছে কচি কচি লাল লাল তার পল্লব। স্বভাবপিঙ্গল চক্ষু থেকে ঝ'রে পড়ছিল কমলের কবলপীত পিঙ্গল মধুরস।

গণ্ডদ্বয়ের অজস্র মদস্রুতিতে ছিল চূত, চম্পক, লবলী, লবঙ্গ, এলা, কক্কোল, কর্পূর এবং পারিজাতের উপভোগগন্ধ।

শুণ্ডের মধ্যে অর্দ্ধভগ্ন একখানি ইক্ষুদণ্ড তুলে নিয়ে দর্পশাত কণ্ডুয়ন করছিল সেই স্থানটি, যেখানে গণ্ডের উপর চাপ বেঁধে জ'মে গিয়েছিল মদস্রাব। দেখে মনে হ'ল, বারণ-চক্রবর্ত্তী যেন লেখনী দিয়ে দানপট্ট লিখে, বাচাল ভ্রমরের মুখে, করিপতিদের জায়গীর দিচ্ছেন অরণ্য।

দর্পশাতের মাথার উপর বিলাস-নক্ষত্রমালার মত রাখা হয়েছিল খণ্ড খণ্ড তুষারের শিলা; গজকুম্ভটিকে শীতল ক'রে অনবরত ঝরছিল বিন্দু বিন্দু তার হৈম সলিল; "নিখিল গজসাম্রাজ্যের আমি সম্রাট"—এই কথাটিকে ঘোষণা ক'রে কুম্ভের উন্নত শিখরে বিরাজ করছিল সেই তুষারশিলার মুকুট।

দিঙ্মুখকে একবার স্থগিত এবং আরবার অপাবৃত ক'রে দর্পশাত যেন দন্ত-পালঙ্কিকায় রাজ্যলক্ষ্মীকে বসিয়ে কর্ণতাল-তালবৃন্তের ব্যজনী দিয়ে মুহুর্মুহু বীজন করছিল—স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা জানিয়ে।

চামরের মত চঞ্চল ছন্দে দুলছিল তার দীর্ঘবংশক্রমাগত পুচ্ছ—গজাধিপত্যের যেন চিহ্ন।

দিগ্বিজয়-পীত সরিৎগুলিকে যেন শুণ্ডের মুখনল দিয়ে কখনও শীকরধারার ছলনায় ছিটিয়ে দিচ্ছিল দর্পশাত, কখনো হঠাৎ অবয়বগুলিকে সটান ক'রে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল নিষ্পন্দ।

ঐ বুঝি সে শুনতে পেয়েছে অন্য হস্তীর গর্জ্জন-দামামা, অপমানের শোধ
তোলবার আগ্রহে দুঃখ নিবেদন করছে দীর্ঘ-শূৎকারে।

কখনো যেন "যুদ্ধ হ'ল না" এই আক্রোশে অনুশোচনা করছিল
নিজে নিজে।

কখনো আবার মাথার উপর মাহুত ব'সে আছে এই লজ্জায় যেন শুঁড়ের অঙ্গুলি দিয়ে বিলিখন করতে লাগল মহীতল, মোচন করল মদধারা, অবজ্ঞাভরে খাদ্যগ্রাস গ্রহণ ক'রে তখনি আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। পরে মাহুতের ভৎর্সনায় শান্ত হয়ে মদতন্দ্রায় নয়নের ত্রিভাগ মুদ্রিত ক'রে কোনরকমে ধীরে ধীরে তুলে নিতে লাগল অনাদৃত সেই খাদ্যগ্রাস; মুখের দু কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল চর্ব্বিত তমাল-পল্লবের শ্যামরস।

দর্শনীয় বটে দর্পশাত।—

দর্পে যেন দলছে, দানে যেন গলছে,
মদে যেন মূর্চ্ছা যাচ্ছে, শৌর্য্যে যেন লাফাচ্ছে,
ফেটে পড়ছে তারুণ্যে, উৎসাহের যেন উৎস।

তম্‌তম্ করছে তেজে,
চিক্‌চিক্ করছে লাবণ্যে,
ছিটিয়ে দিচ্ছে সৌভাগ্য।

বিরোধাভাস ছিল দর্পশাতের পরিকল্পনায়।

নখে স্নিগ্ধ, রোমে পরুষ;
মুখে অধ্যাপক, বিনয়ে নম্রশিষ্য;
শিরে মৃদু, সৌখ্যে দৃঢ়;
স্কন্ধে হ্রস্ব, আয়ুঃতে দীর্ঘ;
উদরে দরিদ্র, দানে উদার;
মদলীলায় বলরাম, বশ্যতায় কুলস্ত্রী;
ক্ষমায় বুদ্ধ, ক্রোধে বহ্নিবর্ষ।

কলকুতূহলে সে ছিল নারদের অবতার,
শত্রুসৈন্যের শিরে নির্মেঘ বজ্রপাত,

দশনকর্ম্মে আশীবিষ,
শত্রুসংবেষ্টনে যমের জাল, এবং
বক্রাচারে রক্তদেহ মঙ্গলগ্রহ।

দর্পশাতকে একবার দেখে মনে হ'ল—

সে যেন—অহঙ্কারের মহানিকেতন, দর্পের বজ্রমন্দির, রাজ্যের সঞ্চারি গিরিদুর্গ, পৃথিবীর লৌহপ্রাকার।

সে যেন—অভিমানের নিবাসপ্রাসাদ—
মুক্তাশৈলের মত দন্ত যেখানে স্তম্ভ,
ক্রোধের ধারাগৃহ—
যেখানে নিত্য উৎসারিত হচ্ছে মদমিশ্র গন্ধোদক।

আবার পরক্ষণেই মনে হ'ল—

সে যেন—মত্তলাস্যের মদনোৎসব, মধুপমণ্ডলীর আপানমণ্ডপ, কর্ণতাল-তাণ্ডবের সঙ্গীতশালা।

সে যেন—মনস্বিতার ইচ্ছাবিমান—
যেখানে বাজছে ঘণ্টা, দুলছে চামর, চলছে সাজ,
মর্ত্ত্যনন্দনের পারিজাত—
যেখানে শ্যামলিমার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে উঠছে হাজার হাজার শিলীমুখের গুঞ্জিত ঝঙ্কার।

বাণের মন বললে—

"নিশ্চয়ই এর সৃষ্টি-সময়ে পরমাণুর রূপ ধরানো হয়েছিল গিরিগুলোকে। তা না হ'লে কোথা থেকেই বা আসবে এত গৌরব! আশ্চর্য্য! বিন্ধ্যের দুটো দাঁত, আদি বরাহের একটা কর……"

এমন সময় বিস্ময়মান বাণকে দৌবারিক ছন্দে বেঁধে বললে—"দেখুন, 'দর্পশাতের কথা আর বলবেন না। এ দুর্বার, এ ভয়ানক। মহারাজের যে সব শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান অরণ্যে, যাঁরা নিঃশেষ-নষ্টা শ্রীকে পুনরুদ্ধারের জন্য গড়েন আকাশকুসুম, গড়েন সহস্র চিন্তার বাহিনী, তাঁদের স্মৃতিপথে যেই উদয় হয় এই দর্পশাত তখনই দিশাহারা শূন্য হয়ে যায় তাঁদের চিত্ত। তাঁদের হৃদয়স্থিত আশা-গজেন্দ্রও অসহ্য এই নাগেন্দ্রের।' ৪

এখন অগ্রসর হোন। আবার একে দেখতে পাবেন। মহারাজকে দর্শন করুন।”

এই কথায় অভিহিত হয়ে বাণ কোন রকমে মুক্ত করলেন নিজের দৃষ্টি—

যে দৃষ্টি লগ্ন হয়ে গিয়েছিল হস্তীর মদধারাপঙ্কিল কপোলপট্টে,

যে দৃষ্টি অর্দ্ধমুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল মাতালের মত এক মদগন্ধে।

দৌবারিকের উপদিষ্ট পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন বাণ। এক এক ক’রে অতিক্রম ক’রে গেলেন তিনটি কক্ষ—ভূপাল-সহস্রসঙ্কুল। তার পরে চতুর্থ কক্ষে ভুক্তাস্থান-মণ্ডপটি পার হতেই দর্শন পেলেন মহারাজের। মণ্ডপের পুরোভাগে অঙ্গনখানিকে উজ্জ্বল ক’রে রাজমান ছিলেন মহারাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রীহর্ষদেব—

যিনি ধর্ম্মের আবর্ত্তন, সৌভাগ্যের পরমপ্রমাণ,

যিনি রূপাণু-সৃষ্টির পূর্ণসমাপ্তি,

যিনি পরাক্রমের খনি-পর্ব্বত, কান্তির কথাবসান,

যিনি করুণার একাগার,

যিনি গম্ভীর, প্রসন্ন, ত্রাসজনন, কৌতুকজনন এবং পুণ্যবান।

দূর থেকে মহারাজচক্রবর্ত্তীকে দেখতে লাগলেন বাণ।

মহারাজকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল পংক্তিবদ্ধ শরীরপরিচারক ; বংশপরম্পরানুক্রমে তারা রাজবংশের দেহ-সেবার গুরুভার বহন ক’রে এসেছে। ব্যায়ামব্যায়ত তাদের প্রাংশু শরীর। কর্ণিকাফুলের মত গৌর তাদের রঙ। তারা দাঁড়িয়ে ছিল—যেন এক-একটি হৈমস্তম্ভ।

মহারাজের সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন বিশিষ্ট কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি।

এবং একখানি মুক্তাশৈলের শিলাপট্টশয়নে সুখাসীন ছিলেন মহারাজ হর্ষদেব। পালঙ্ক-প্রান্ত-বিন্যস্ত একখানি ভুজের উপর সমর্পিত ছিল সমগ্র বিগ্রহভার। কী সুন্দর সেই সুখাসন! তার গজদন্তশুভ্র চারটি চরণ চার ফালি চাঁদ দিয়ে যেন তৈরি! হরিচন্দনের রসে-ধোওয়া, তুষারের শীকর দিয়ে শীতল-করা সুন্দর সেই শিলাতল।

দূরবিসর্পি একখানি মোহন লাবণ্য মণিমাণিক্যের আভরণ-পরা মহারাজের অঙ্গ থেকে উৎসারিত হয়ে সৃষ্টি ক'রে চলেছিল বৈশাখী এক অভিনব রূপসরোবর ;—যার মৃদু মৃণাল-জাল-জটিল জলে সরাজক ক্রীড়া করছিলেন মহারাজ। সেই অনিন্দ্য জ্যোতিঃশৈলীর মধ্যে প্রবেশ করতে না পেরে পুণ্যদিবসখানি যেন মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করছিল মহারাজকে।

মহারাজ কি কেবল তেজের পরমাণু দিয়েই গড়া ? তাঁকে কি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর ক'রে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মঙ্গলচিহ্নসঞ্চয় ? বিষম সঙ্কটময় রাজপ্রচলিত মার্গে পাছে তাঁর পদস্খলন হয়, সেই ভয়ে ধর্ম্মকে কি তিনি কোল দিয়েছিলেন ?

মহারাজচক্রবর্ত্তীকে দেখতে লাগলেন বাণ—

বাচনিক বরাভয় লাভ ক'রে অন্য ভূপাল-পরিত্যক্ত ভীরু সত্যধর্ম্ম যেন সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা ক'রে চলেছিল মহারাজের।

দশটি দিগ্বধূর মত মহারাজকে প্রণাম ক'রে গেল আসন্ন বারবিলাসিনীদের চরণ-নখরপাতিনী প্রতিযাতনাগুলি ; চতুঃসমুদ্রের সমস্ত লাবণ্য নিয়ে তাঁকে যেন আলিঙ্গন করলেন লক্ষ্মীদেবী।

মহারাজ তখন রাজন্যদের মধ্যে বিতরণ করছিলেন আভরণের ইন্দ্রধনু ; মধুপান না ক'রেই ভাষণে ভাষণে বর্ষণ করছিলেন মধুরস ; আকৃষ্ট না হয়েও যেন হৃদয়খানিকে মেলে ধরছিলেন বিশ্রম্ভালাপে ; প্রসাদবণ্টন-ব্যাপারে যোগ্য স্থানে সঞ্চালিত করছিলেন নিশ্চলা কমলাকে।

যখন আলোচিত হচ্ছিল প্রসিদ্ধ বীরদের সমরকাহিনী, তখন বারম্বার চিরভক্ত কৃপাণের ধারাজলে নিপতিত হচ্ছিল তাঁর দৃষ্টি,—বৃষ্টির মত স্নেহের ; কপোলতল অঞ্চিত হয়ে উঠছিল রণলক্ষ্মীর কানে-কানে-বলা অনুরাগের বাণীতে।

আবার যখন প্রতাপভীত রাজন্যদের সঙ্গে মগ্ন হচ্ছিলেন হাস্য-পরিহাস-বিজল্পনায়, তখন তাঁর স্বচ্ছ হৃদয়খানিকে প্রকাশ ক'রেই যেন ঝ'রে পড়ছিল দশনের শুভ্র কিরণ।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তিনি ব্যথা পাচ্ছেন, গিরিরা প্রণাম করে নি ব'লে ;

ব্যথা পাচ্ছেন, রাজন্যেরা মুকুটের মধ্যে তাঁর প্রতিবিম্বটিকে আবদ্ধ রেখে
তাঁর দর্পে লঘুতা আনছে ব'লে।
মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়—থেকে থেকে তাঁর দীর্ঘদৃষ্টির দিগন্তপাতি ভঙ্গিমা
দেখে;—মনে হয় যেন পর্য্যবেক্ষণ করছেন লোকপালদের কার্য্যকলাপ।

বাণ দেখতে লাগলেন হর্ষদেবকে,—
মাণিক্য-মেখলা মহানীলমণির একখানি মহান্ পাদপীঠে বামচরণখানিকে
বিন্যস্ত ক'রে মহারাজ ব'সে রয়েছেন লীলাভরে,—যেন পা রেখেছেন
কলিযুগের মাথার উপর; পাদপীঠের মাংসলময়ূখে মলিনিত হচ্ছিল
মহীতল। মণিপাদপীঠে ঢ'লে পড়েছিল সূর্য্যের অস্তোন্মুখ রশ্মি, তাই
মনে হ'ল সূর্য্য যেন বিদায়-নেবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন মহারাজের
চরণে।
ধরিত্রীর শিখরে মহাদেবী-পট্টবন্ধনের মহিমাটিকে আরোপ ক'রেই যেন
বামচরণের অঙ্গুলি থেকে নির্গত হচ্ছিল ক্ষৌমপাণ্ডুর দীধিতি।
সুন্দর দেখাচ্ছিল মহারাজের দুখানি চরণ। অতি লোহিত চরণ। অপ্রণত
লোকপালদের কোপরস দিয়ে যেন রাঙানো; সংবাহন-তৎপরা লক্ষ্মীর
যেন ফুল্লতামরসে-গড়া বাসভবনের কল্পনা; যেন দুখানি অস্তময়
সন্ধ্যারাগ। রাজন্যদের শেখর-কুসুম থেকে সেই চরণ দুটি যেন ঝরিয়ে
দিচ্ছিল মধু-রসের স্রোত;
আহা, দুটি পদ্মের মত দুখানি চরণ। সেই চরণ দুটিকে ঘিরে অবিরাম
গুঞ্জন করছিল ভ্রমরের মণ্ডল,—সামন্তদের মুকুটে যে মালা ছিল তারই
সৌরভভ্রান্ত ভ্রমরের মণ্ডল—ভ্রান্তি জাগিয়ে শত্রুর উত্তমাঙ্গের; এবং
চরণতলের পদ্ম, শঙ্খ, মীন, ও মকর-আঁকা চতুঃরেখা, দিগ্বিদিকে
বিঘোষিত করছিল মহারাজের চতুঃসমুদ্রের একাধিপত্য।
মনে কত যে উপমা জাগায় মহারাজের উরুদ্বয় তার স্থিরতা নেই;—
নয়নে এনে দেয়—দিঙ্নাগের বিকট মকর-মুখের প্রতিষ্ঠান-মনোহর
দন্তমুসলের ছবি;
এনে দেয়—ফেনিল-কান্তি লাবণ্য-সমুদ্রের উদ্বেল-প্রবাহের ছবি;

এনে দেয়—ছুটি চন্দনগাছের চিত্র, মূল যার ভোগিরাজের শিরোরত্নের
রশ্মি দিয়ে রাঙানো।

মহারাজের হৃদয়ে ভূভার ধারণের যে চিন্তাকূট ন্যস্ত ছিল এই উরু ছুটি যেন
তারি মাণিক্যস্তম্ভ।

শ্রেণীতটে অধরবাস—নেত্রসূত্র যার ক্ষেত্র। কী তার শুভ্রতা! যেন অমৃতফেনের
পুঞ্জীভূত সঙ্কল্প। আর সেই শুভ্রতার উপর—বাসুকিনাগের
নির্ম্মোকপরা মন্দর-পাহাড়ের ভ্রান্তি জাগিয়ে একটি অপূর্ব্ব
আলোক সম্পাতিত করছিল মেখলার মধ্য-মণি।

চমকাচ্ছিল,—সারা দেহখানি ঘিরে আর একখানি উত্তরবাস;—তারার চুমকি-
বসানো নির্মেঘ আকাশখানি যেমন ক'রে চমকায় ভুবনখানিকে
ঘিরে।

মহারাজের সেই অরুণাভ উরঃ-কবাট! এই কবাট সহ্য করেছে কত না
জানি সংগ্রামবাহিনীর সংক্ষোভধ্বনি-বহুল সম্মর্দ্দ।

অপর্য্যাপ্ত অম্বরের বিস্তৃতির মত বিশাল, কৈলাসের স্ফটিকতটের মত কঠিন মসৃণ
সেই বক্ষ।

মহারাজের গ্রীবাটিকে পরিবলিত করেছিল মোহন একখানি হারদণ্ড। সেটিকে
দেখে মনে হ'ল মহারাজের ভুজস্তম্ভের উপর ভূভার-ধারণের
দায়িত্বটিকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত-আরামে গ্রীবা
জড়িয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন অনন্তনাগ। যেন সেই হারদণ্ড একখানি
সীমাসূত্র, বিভাগ ক'রে দিয়েছেন শ্রীমতী সরস্বতীকে,—বদনের
রাজত্ব এবং শ্রীমতী লক্ষ্মীকে,—বক্ষের রাজত্ব।

হারদণ্ডে যে মুক্তাফলক ছিল তারই কিরণ পড়েছিল মহারাজের বক্ষে; সেই
কিরণখানি স্মরণ করিয়ে দেয় মহারাজের 'মহাদান'-ব্রতের
দীক্ষাচীর—যার উপর লেখা ছিল "জীবনের যা কিছু সম্বল,
দিয়ে যাব।"

সুগঠিত দীর্ঘ ভুজদণ্ডযুগে নিবদ্ধ ছিল ছুখানি রত্নপ্রতাপী কেয়ূর! মনে হ'ল
এই ভুজার্গল দিয়েই বুঝি একমাত্র রোধ করা যায় সর্ব্বলোকের
আলোকের পথ। এ ছুটি যেন চতুঃসমুদ্রের পরিখা-শিলাপ্রাকার,
ভুবনলক্ষ্মীর প্রবেশমঙ্গলের মহামণি-তোরণ।

চতুর্দ্দিক অভিসিঞ্চিত ক'রে রাজ-অধর থেকে ঝ'রে পড়ছিল পারিজাতপল্লবের গন্ধরসের মত একটি অপূর্ব্ব রক্তিমা, সৃষ্টি ক'রে অমৃতমন্থনের দিবস।

সুহৃদদের পরিহাসে প্রসন্ন হয়ে যখন মৃদুমধুর হাস্য ক'রে উঠলেন মহারাজ, তখন প্রকৃতিমূঢ়া রাজ্যশ্রীকে যেন প্রজ্ঞার আলোক দেখিয়েই বিকীর্ণ হয়ে পড়ল তার বিমল দশনের শিখা-প্রতান। দশন-পংক্তিটি যেন একখানি শ্বেত-কুমুদের অরণ্য-আঁকা ছবি,—যেন সেই অরণ্য থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে শরৎ-নিশার অম্লান জ্যোৎস্না।

নাসাবংশের অপূর্ব্ব লালিত্য! দেখে মনে হ'ল বিকচমুখকমলের কর্ণিকাকোশ যেন অধোমুখী হয়ে পান করছে শ্বাসসুরভি।

আর তাঁর লাবণ্যসমুদ্র-উদ্বেল-করা ক্ষীরস্নিগ্ধ চক্ষুর শুভ্রতা!

বাণ দেখতে লাগলেন হর্ষদেবকে,—

চামরগ্রাহিণীর প্রতিবিম্ব পড়েছিল মহারাজের কপোলভিত্তির বিমলতায়;
—এ কি মুখ-নিবাসিনী বিগ্রহিণী সরস্বতী!

চূড়ামণির অরুণবরণ কিরণে আরক্তিম হয়ে গিয়েছিল মহারাজের ললাট;
—এ কি ভারতীর ঈর্ষ্যাকুপিতা কমলার প্রসন্ন চরণের যাবক-স্পর্শ!

মহারাজের কান থেকে দুলছিল পুষ্পের মাল্য-বিজড়িত হৈরিক কুণ্ডল, গুঞ্জন তুলে উড়ে বেড়াচ্ছিল মধুসঞ্চয়ীর দল; দেখে মনে হ'ল, ভ্রমরেরা বীণ ক'রে নিয়েছে কুণ্ডলমণির কুটিল কোটিকে, তন্ত্রী ক'রে বাজাচ্ছে কুণ্ডলমণির চঞ্চল-চরণ রশ্মিকে, এবং মহারাজ যেন তন্ময় হয়ে শুনছেন সেই বীণায়-তোলা ভ্রমরদের স্বর-ব্যাকরণ-বিবেক-বিশারদ কলক্বণন। মহারাজের কেশপ্রান্তে উৎফুল্লমালতীর একখানি মৌলিমাল্য। মুক্তা আর পান্নায় মোহন ছিল মহারাজের শিরঃ-শিখণ্ডের আভরণ। তাদের কিরণের মিলন-মালিন্য স্মরণ করিয়ে দেয় প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার বেণিকাবারির কথা; সেই বারি যেন স্বয়ং অভিষিক্ত ক'রে যাচ্ছিল হর্ষদেবকে।

বাণের দেখা যেন আর ফুরোতে চায় না। এ তো মহারাজ-দর্শন নয়, এ যেন দিগ্‌দর্শন। সেই সম্রাটসভায় চোখে না প'ড়ে যায় না বারবিলাসিনীদের দল। তারা অবশ্য-দ্রষ্টব্য। তারা যেন মহারাজের পরিমণ্ডল থেকে হরণ ক'রে নিচ্ছিল সৌভাগ্য,—এমনি তাদের রূপ।

তাদের মধ্যে কারোর শ্রান্ত ললাট থেকে গ'লে পড়েছিল কৃষ্ণাগুরুর পঞ্চতিলকের নীলায়মান রেখা। প্রার্থনা ও চাটুবাদের চাতুরী দেখিয়ে মহারাজের শ্রীচরণে মাথা কুটে কুটে যেন তারা শত শত কৃষ্ণনীল চিহ্ন, এঁকেছে ললাটে।

তাদের হৃদয়োল্লাসী হারগুলি—ক্ষুব্ধমনের উৎকলিকার প্রকাশ। তাদের ভ্রূলতার কী বিলাসী তরঙ্গ! একখানি ঈর্ষ্যা যেন তর্জন করছে লক্ষ্মীকে।

হৃদয়-হরণের কোনো মন্ত্রই তাদের অবিদিত নেই।

মহারাজের হৃদয়কূপ থেকে পত্নী-প্রীতি-সলিলকে নিঃশেষিত করবার আগ্রহেই কেউ যেন তার সুন্দর স্তনকলসের মুখে বেঁধে রেখেছিল স্থূল বকুলের একখানি মাল্য-রজ্জু;

মহারাজকে আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যেই কারোর মুখ থেকে বেরোচ্ছিল দীর্ঘশ্বাস—যেন মলয়মারুতময় পাশ;

স্তন-কম্পিকার বিকারে কারোর কণ্ঠহারে দুলে দুলে উঠছিল মধ্যমণি;—কিরণের তন্তু দিয়ে আকর্ষণ ক'রে হঠাৎ যেন হৃদয়ে প্রবেশ করাতে চায় মহারাজকে।

আভরণের কিরণ-বাহু মেলে কেউ যেন দিতে চাইছিল আলিঙ্গন। পরাধীন মনখানির গতিরোধ করবার আগ্রহেই কেউ যেন করপল্লব উত্তানিত ক'রে ঢেকে রাখছিল নিজের মুখের মনোহর জৃম্ভাটিকে।

যেখানে কামান্ধ ভ্রমর, সেখানে সঙ্কুচিত হয়ে যায় কটাক্ষ, বিলাসিনীরা সুচতুর চেষ্টায় নয়নকোণায় নিয়ে আসছিল—পুষ্পপ্রহারের মূর্চ্ছা-ভঙ্গ ভঙ্গী।

নিজেদের মধ্যে বিলাসিনীদের বিদ্বেষভাব যায় নি। এ ওর দিকে, ও এর দিকে হানে দীর্ঘনয়নের ভ্রূকুটি। কর্ণকমলকে পীড়িত করে কটাক্ষ।

হায় রে, বিলাসিনীদের আশা যেন আর মেটে না।

কোমল কপোলভিত্তিতে মহারাজের যে প্রতিবিম্ব পড়েছিল সেটিকে তারা পান ক'রে নিচ্ছিল নয়নের তৃষ্ণা দিয়ে;—আহা, তাদের সেই অনিমেষ-দর্শন সুখরাশি-মন্থরিতপক্ষ্ম আঁখি।

তাদের অকারণ হাসির কাম-তরঙ্গ চারিদিকে সৃষ্টি করছিল অজস্র চন্দ্রোদয়।

হাবভাবলাস্যলীলায় মহারাজের হৃদয়টিকে জয় করতে না পেরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলিত করতে লাগল অঙ্গ, মোট্টায়িত করতে লাগল হস্ত, হস্তের মধ্যে অঙ্গুলি, নখের জ্যোতিতে কুণ্ডলী বাঁধল কিরণের; মনে হতে লাগল তারা যেন রোষভরে দীর্ণ ক'রে ফেলছে শ্রীমদনের অকিঞ্চিৎকর কার্ম্মুক।

একজন বিলাসিনী মহারাজের চরণসেবায় রত ছিল; স্পর্শে কি ছিল জানি না, হঠাৎ কেঁপে গেল তার ঘর্ম্মসিক্ত হাত, হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেল চরণকমল; ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির শৈলী এঁকে আলস্যলীলায় মহারাজ তার মাথায় মৃদু আঘাত করলেন,—বীণাদণ্ড দিয়ে।

মহারাজের হাতের নিত্যসহচর সেই বীণাদণ্ডটি—যেন লক্ষ্মীর বীণ-শিক্ষক।

হর্ষদেবকে যতই দেখতে লাগলেন বাণ, ততই মহারাজ প্রতিভাত হতে লাগলেন অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচিত্রতায়।

ঐশ্বর্য্য বললে — "উনি নিঃস্নেহ";
দোষবৃন্দেরা রটনা করলে — "ওঁকে আশ্রয় করা ভুল";
ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রচার করলে — "মহারাজ নিগ্রহরুচি";
কলি বললেন — "দুর্গম্য";
"অরসিক, অরসিক" — হ'ল ব্যসনের মন্তব্য:
"ভীরু, ভীরু" — হেঁকে উঠল অযশ;
মনোভব জানালেন — "হৃদয় ব'লে মহারাজের কিছু নেই";
সরস্বতীর স্বীকার — "উনি স্ত্রৈণ";
পরস্ত্রীদের উক্তি — "উনি অপদার্থ";
সন্ন্যাসীদের ভাষণ — "মহারাজ চরমে পৌঁছেছেন";
বারাঙ্গণাদের স্বগত নিবেদন — "উনি ধূর্ত্ত";
সুহৃদেরা, বিপ্রেরা, সংগ্রামশত্রুরা যথাক্রমে উল্লেখ করলে—
"মহারাজ নেতা, মহারাজ কর্ম্মী, মহারাজ সুসহায়।"

প্রজাপতিরা যাঁকে নৃপসৃষ্টির অবভৃত-স্নানদিবসের মত মনে করেন, সাম্রাজ্যের

অশুভ-চারিত্র্যের যিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, যিনি লক্ষ্মী-সমুত্থানের দ্বিতীয় সুধামন্থন-দিবস, সরস্বতীর যিনি বিদ্যা-সঙ্গীত-কলা-ভবন,—

সেই পুরুষোত্তমের প্রতিবেশিক, দর্পের উৎপত্তিদ্বীপ, বিবুধ-সৃষ্টির বীজকোষ—চক্রবর্ত্তীমহারাজ হর্ষদেবকে দূর থেকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন বাণ ;—এক অনির্ব্বচনীয় প্রফুল্লতায় পূর্ণ হ'ল তাঁর চিত্ত।

তাঁকে দেখে বাণ অনুগৃহীত হলেন, নিগৃহীত হলেন, পূর্ণকাম হলেন, শূন্যকাম হলেন ;

রোমাঞ্চিত মুখের উপর বিন্দু বিন্দু ফুটে উঠল উদার আনন্দবারি। তিনি ভাবতে লাগলেন,—

"ইনিই কি সেই সুজাত, প্রাতঃস্মরণীয়, ব্রহ্মস্তম্ভ-ফলভোক্তা পরমেশ্বর হর্ষদেব ? চতুঃসমুদ্র-মেখলিত যাঁর বাসভবন, পুরাণ-প্রথিত নরপতিদের যিনি জয়-জ্যেষ্ঠ-মল্ল ? এঁকে পেয়েই আজ রাজন্বতী হয়েছেন পৃথ্বী। ইন্দ্রের মত, কই, এঁর তো শুনি না গোত্রবিনাশ-পিশুন জনরব ? যমের মত, কই, এঁর তো হাতে দেখছি না অতিবল্লভ শাসনদণ্ড ? ইনি তো বরুণ নন,—কুটিল কুম্ভীরের মত কৃপাণী দিয়ে রক্ষা করছেন না তো রত্নালয়! কুবের ?—তাও তো বলতে পারি না এঁকে। ইনি তো কৃপণ নন ;—এঁর কাছে এলেই তো সকলে পাচ্ছে দক্ষিণার দাক্ষিণ্য। জিনেদের মত এঁর তো দেখছি না অর্থবাদশূন্য দর্শন! বিচিত্র এই অমরাবতীর রাজত্ব।

এঁর এত ত্যাগ যে অর্থী খুঁজে পাওয়া যায় না ; এঁর প্রজ্ঞার তুলনায় শাস্ত্র স্বল্প ; এঁর কবিত্বের কাছে বাক্য অপর্য্যাপ্ত ; এঁর এত শৌর্য্যসাহস, কিন্তু ফোটাবার স্থান নেই ; এঁর এত উৎসাহ, কিন্তু কিসের উপর করবেন প্রয়োগ ? দিক্‌দিগন্ত সীমাবদ্ধ করতে পারে না এঁর কীর্ত্তিকে, জনতার হৃদয় ধ'রে রাখতে পারে না এঁর অনুরাগকে, সংখ্যাতীত এঁর গুণগ্রাম, এঁর কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়েছে চতুঃষষ্টিকলা।"

এই সমস্ত চিন্তা করতে করতে রাজসমীপে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-করে উপবীত ধারণ ক'রে স্বস্তিবাচন করলেন বাণ।

এমন সময় রাজগৃহের উত্তরে অনতিদূরে জনৈক গজ-পরিচারক অপরবক্ত্র-ছন্দে গান গেয়ে উঠল সুমধুর—

"হে করিশিশু, চঞ্চলতা ত্যাগ কর, মাথা নত ক'রে পালন কর বিনয়ব্রত; সিংহের নখশীর্ষের মত এই যে বক্র গুরুভার অঙ্কুশ তোমার মাথার উপর রয়েছে, সে সহ্য করবে না অবিনয়।" ৫

সেই গান শুনে মহারাজ চোখ ফেরালেন এবং গিরিগুহাগত সিংহের গর্জ্জনের মত গম্ভীরস্বরে আকাশ পূর্ণ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—

"এই কি সেই বাণ?"

"ইনিই তিনি।"—বিজ্ঞাপন করল দৌবারিক।

"এখনও এঁর উপর প্রসাদ দেখাই নি। এঁর দিকে চোখ ফেরাব না।"—এই স্থির ক'রে হর্ষদেব ফিরিয়ে নিলেন নিজের অপাঙ্গ-নীয়মান তরল-তারক দীর্ঘ নয়নের প্রভা,—সৃষ্টি ক'রে দিয়ে শুভ্রনীলা একখানি তিরস্করিণী।

পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন মালবরাজপুত্র, তাঁর প্রিয়তম সখা। তাঁর দিকে দেহখানিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হর্ষদেব ব'লে বসলেন,

"ইনি একটি মহাভুজঙ্গ।"

নরেন্দ্র-বাণীর ক্ষুরধার প্রণিধান করতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে রইলেন মালবরাজ-পুত্র। মূক হ'ল রাজলোক।

মৌন হয়ে রইলেন বাণ,—ক্ষণকাল; তারপর নিবেদন করলেন—

"হে দেব, আপনার বাণীতে রয়েছে অজ্ঞাত-তত্ত্বের পরিচয়, অশ্রদ্ধার ইঙ্গিত, পরচালনার প্রকাশ, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞানতার আভাস। বাসনা-অনুযায়ী পথ কেটে কেটে চ'লে যায় মানুষের বৈচিত্র্যময় স্বভাব—জনশ্রুতির মত। কিন্তু যাঁরা মহান্ তাঁদের যথার্থদর্শী হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের সমপর্য্যায় ক'রে আমার সম্বন্ধে একটা বিসদৃশ ধারণা পোষণ করা আপনার কাছে আশাতীত। আমি ব্রাহ্মণ, সোমপায়ী বাৎসায়নদের বংশে আমার জন্ম। যথাসময়ে উপনয়নাদি সংস্কার আমার হয়েছে। পাঠ করেছি সাঙ্গ বেদ। শ্রবণ করেছি যথাশক্তি শাস্ত্র। দারপরিগ্রহ ক'রে এখন অভ্যাগারিক হয়েছি।

'কা মে ভুজঙ্গতা !'*

কী দেখলেন আমার ভুজঙ্গতা ? সত্য বটে, চপলতাশূন্য ছিল না আমার শৈশব। কিন্তু সে চাপল্য ইহলোক পরলোকের তো বিরোধী নয়। আমি তা গোপন করতে চাই না। আমার হৃদয় হয়তো সেইজন্যই গ্রহণ করেছে অনুতাপব্রত।

আপনি এখন সুগত বুদ্ধের মত শান্ত নির্ব্বিকারচিত্তে রাজত্ব করছেন ; প্রজাপতি মনুর মত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার আপনি কর্ত্তা, সাক্ষাৎদণ্ডধারী যমরাজের মত শাসন ক'রে চলেছেন সপ্তসমুদ্রমেখলা দ্বীপমালিনী পৃথ্বী। কে এমন মূঢ় নির্ভীক রয়েছে, যে এই ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান থেকে মনে মনেও কাল্পনিক অভিনয় করতে সাহস করে সর্ব্ব-সঙ্কট-সখা অবিনয়ের ?

তাদের কথা ছেড়ে দিন, যাদের মধ্যে এতটুকুও অঙ্কুরিত হয়েছে মানবতার বীজ। আপনার প্রভাবে অভিভূত হয়ে ভ্রমরগুলিও ভয়ে ভয়ে মধুপান করে। চক্রবাকগুলোও লজ্জায় সোহাগ জানায় না চক্রবাকবধূদের। এমন কি, বাঁদরগুলোরও দেখতে পাই সচকিত-চাপল্য। মাংসাশী হিংস্র পশুগুলো মাংস ভক্ষণ করে অনুকম্পায় মৃদু হয়ে। আপনি প্রভু, সময়ে নিজেই চিনতে পারবেন আমাকে। প্রজ্ঞাবানদের প্রকৃতিতেই থাকে অনপাচীন চিত্তবৃত্তির গ্রহণ-ধর্ম্ম।"

এই কথা ব'লে স্তব্ধ হলেন বাণ।

"আমাদেরও শ্রুতিগোচর হ'ল" এই ব'লে হর্ষদেবও ক্ষণকাল মৌন হয়ে রইলেন। বাণকে অনুগৃহীত করলেন না সম্ভাষণ বা আসনদান ইত্যাদির প্রসাদে। কেবল স্নেহগর্ভ দৃষ্টিপাতের অমৃতবর্ষণে যেন স্নান করিয়ে দিয়ে তাঁকে অবগত করালেন অন্তর্গচ্ছিত প্রীতিকথা।

বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন,—দেখতে পেলেন—গগন-প্রলম্বী সূর্য্য যেন তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইছেন তিমিরমন্দিরে ফিরে-যাবার অনুমতি।

* (১) কী দেখলেন আমার ভুজঙ্গতা ? (সর্পস্বভাব, লাম্পট্য)
(২) কামেতেই বর্ত্তমান আমার ভুজঙ্গতা।
(৩) কোন্ রমণীকে আমার ভুজবন্ধনে বদ্ধ দেখেছেন ?

বিসর্জ্জিত হ'ল রাজলোক। সভা ভঙ্গ ক'রে কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন চক্রবর্ত্তী—হর্ষদেব।
সভা হতে নির্গত হয়ে এলেন বাণ।

অবসন্ন দিনখানির গায়ের উপর তখন ছড়িয়ে পড়েছিল—মার্জ্জিত পিত্তলের মত উজ্জ্বলকোমল একখানি আভা; অস্তাচলের চূড়ায় কিরীটের মত সুন্দর দেখতে হ'ল আকাশ-বৈরাগী সূর্য্যকে; আহা, তাঁর উদাসী কিরণ,—নিচুল-মঞ্জরীর বরণ-ধরা সেই কিরণ!
মণিতার নগরের প্রান্ত দিয়ে অজিরবতী নদীর তীর ধ'রে চলতে লাগালেন বাণ। দেখতে পেলেন—

গ্রামান্তের ভূতপূর্ব্ব অরণ্য-ব্রজগুলিতে শান্তচিত্তে ব'সে রয়েছে রোমন্থমন্থর কুরঙ্গের দল।

শুনতে পেলেন—

তরঙ্গিণীর এপারে ওপারে বিরহব্যাকুল চক্রবাকমিথুনের করুণ কূজন।

পথের ধারে ধারে পুরবাসীদের জলসিক্ত গৃহারামের গন্ধ নিতে নিতে চলতে লাগলেন বাণ।

দিনের শেষে গোষ্ঠে ফিরে এল ধেনু, দুধ-ঝরা তাদের স্তন, ছুটে গিয়ে দুধ টানতে লাগল বাছুরগুলি, আর বাস-বিটপে জটলা করে সারাদিনের খবর শোনাতে লাগল বাচাট চটকের চক্রবাল।

অজিরবতীর তীরে দাঁড়িয়ে, সূর্য্যাস্ত দেখলেন বাণ;—

যেন অস্ত-ধরাধর থেকে নেমে আসছে একখানি গৈরিক-ধাতু-ধোওয়া-বর্ণমান নদীস্রোত; এবং তারই প্রবাহে প্লাবিত হয়ে সিন্দূরিত-মহিমায় যেন ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে একখানি অপরূপ তরণী,—সন্ধ্যা-সমুদ্রের বুকের উপর সাবিত্রী সেই তরণী।

সূর্য্যাস্ত থেকে চোখ ফিরিয়ে বাণ দেখতে পেলেন,—

কমণ্ডলুজলে হস্তচরণ প্রক্ষালন ক'রে চৈত্যপ্রণাম করল একদল পারাশরি; একদল যাযজূক—হাতে তাঁদের পবিত্র যজ্ঞপাত্র, চারিদিকে

ছড়ানো রয়েছে শ্যামল দূর্ব্বাদল,—বষট্‌কার করতে করতে উত্তেজা অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন হবিঃ।

নদীর তীর ধ'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন বাণ।

নীড়গুলিতে তখন ভিড় ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে দ্রোণকাকের দল; উপবনের গাছে গাছে কাপেয়-বিকল কপিদের বাহার; জীর্ণ তরুকোটরের কুটী থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে রাত্রির পেচক। মুনিজনেরা সন্ধ্যাবন্দনার সময় যে অর্ঘ্য দান করেছিলেন তার সলিলবিন্দুর অজস্রতার মতই ছায়া-পথটিকে বন্ধুর ক'রে ফুটে উঠল নক্ষত্রের পুঞ্জিত আশা।

ক্রমে অম্বরের রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করতে করতে আবির্ভূত হলেন কিশোর-তনু অন্ধকার,—শর্ব্বরী-শবরীর সীমন্তে যেন নীলফুলের মুকুট। সে কি গ্রাস করতে চায় সান্ধ্য জ্যোতির অবশেষ?

নগরের পথে পথে চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল দীপলেখা,—তারা যেন অস্তরবির কিরণের কোণ,—তর্জ্জন করতে বেরিয়ে এসেছে তিমিরকে।

নদীতীর ছেড়ে নগরের মধ্যে প্রবেশ করলেন বাণ।

"দ্বার বন্ধ হ'ল"—এই কথাটিকে ঘোষণা ক'রেই যেন ঘড়ঘড় শব্দে বন্ধ হয়ে গেল গোপুরমের দুখানি বিরাট কবাট। ঘরে ঘরে তখন শিশুদের ঘুম-পাড়ানোর আয়োজন চলেছে; চোখের পাতা এলিয়ে দিয়ে শিশুরা সাধছে নিদ্রা, আর বৃদ্ধারা তাদের পাশে ব'সে ব'কে যাচ্ছেন ঘুমপাড়ানি গল্প;—বুড়ো মোষের মত, কালির মত কালো, আসছে রাত্তির—ভূতপ্রেত উঠছে জেগে—ভীষণ ভীষণ হাই তুলতে তুলতে তারা আসছে, আসছে রাত্তিরের অন্ধকার—।

নিজের নিবাসস্থানের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলেন বাণ।

শ্রীমান্ মকরকেতন—সমস্ত সংসারের বুদ্ধিকে যিনি হরণ ক'রে নেন—তিনি তখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ করছেন পুষ্পশর, নৈশ অন্ধকারে ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর ভ্রমর-গুণের টঙ্কার।

নগরের গণিকারা শম্ভলীদের কথা মেনে আরম্ভ করেছে ভূষণ-পরা, দেহখানিকে সাজানো ; তাদের জঘনে জঘনে বেজে উঠছে মেখলা-জালের জল্পনা।

নগরের নির্জন পথগুলি দিয়ে প্রিয়সঙ্কেতে দ্রুত চ'লে যাচ্ছে অভিসারিকারা—শ্রীমদন তাদের সহায়।

দীঘিতে দীঘিতে ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে হংসীদের কলধ্বনি ; মঞ্জুমঞ্জীর-শিঞ্জিতে লজ্জায় জড়িত তাদের কণ্ঠ।

বিরহীদের হৃদয়গুলিকে গলিয়ে দিচ্ছে নিদ্রালসগুরু সারসদের ক্রেঙ্কার।

বাণ যখন প্রবেশ করলেন নিজের আবাসকক্ষে, তখন নগরের সর্ব্বত্র প্রদীপ উঠেছে জ্ব'লে—ভাবী প্রভাতের যেন বীজাঙ্কুরের কল্পনা।

কক্ষের বিজনতায় কথা ক'য়ে উঠল তাঁর মন—

"হর্ষদেব দেখছি অতি-দক্ষিণ। বুঝতে পারলুম আমার কুমারবয়সের পঙ্ককথা তাঁকে ক্রুদ্ধ করেছে, কিন্তু তাঁর মনখানিকে দেখতে পেলুম আমার উপর যেন স্নিগ্ধ। যদি আমি সত্যই তার চোখের রেণু হতুম, তা হ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে দর্শনের প্রসাদ দিতেন না। আমি যাতে বিমোহন হই, সেইটিই বোধ করি ওঁর বাসনা। অনেক সময় সেবকদের বিনয় শেখান প্রভুরা—কথা না ব'লে, শুধু দৃষ্টি ক'রে উপযুক্ত একখানি অভ্যর্থনা।

আমাকেও ধিক্। নিজের দোষ দেখেও দেখছি না, আর কেবল চিন্তা ক'রে মরছি,—আমাকে আদর করা হয় নি, আমি অনাদৃত। অমন গুণশালী রাজাকেও ভাবছি অন্যরকম, দেখছি অন্যরকম। যাক্, তেমন তেমন ক'রে চলব, যেমন যেমন দেখব ব্যবস্থা, অবস্থা। সময়ে আমাকে জানতে পারবেন।"

এইরূপ চিন্তা ক'রে তার পরের দিন সম্রাট-কটক থেকে বেরিয়ে পড়লেন বাণ। সুহৃদের বান্ধবদের ভবনে ভবনে কাটাতে লাগলেন ততদিন, যতদিন না পৃথিবী-পতি হর্ষদেব স্বয়ং বুঝতে পারলেন বাণের স্বভাব এবং প্রসন্ন হয়ে তাঁকে করলেন আহ্বান। তার পরে পুনর্ব্বার বাণ প্রবেশ করলেন নরেন্দ্র-ভবনে।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই পরমপ্রীতিভরে হর্ষদেব উন্নীত করলেন বাণকে—সেই শিখরে,—যেখানে অধিষ্ঠান ক'রে আছে নরেন্দ্রের প্রসাদজন্মা সম্মান, বিশ্বাস, ঐশ্বর্য্য, নর্ম্মপরিহাস এবং প্রতিপত্তি।

ইতি শ্রীবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে
রাজদর্শনং নাম দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসঃ ॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

প্রজার পুণ্যেই সুজাত হয় রাজাদের সুসময় ;—
বর্ষাকালের মত তাতে থাকে স্নেহপ্রীতির বর্ষণ, এবং অন্নসত্রের দাক্ষিণ্যে
হয় ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধার্জ্জন। ১।

কার মানসকে না কুতূহলী ক'রে তোলে—মহাত্মাদের চরিতকথা-শ্রবণ,
সাধুদের উপকার-করণ, লক্ষ্মী-দর্শন এবং আকাশমার্গে গমন ? ২।

তারপরে একদা সেই সময় এল, যখন—

বিরল হয় মেঘদল—আকাশে,
আতঙ্কিত হয় চাতক,
কংকং ক'রে ডেকে ওঠে কাদম্ব,
বিপদে প'ড়ে যায় দাত্বরী,
খর্ব্ব হয় ময়ূরদের গর্ব্ব।

এই সময়টিকে বলে শরৎকালের সূচনা।

তখন অতিথি হয়ে ফিরে আসে হংস-পথিক-সার্থবাহ,
চমকাতে থাকে আকাশ—যেন শান-দেওয়া তলোয়ার,
ঝক্‌ঝকে সূর্য্য, ফুটফুটে চাঁদ, জ্বল্‌জ্বলে তরুণ তারা।

তখন গ'লে যায় ইন্দ্রের শরাসন,
লুপ্ত হয় বিদ্যুতের দাম,
বাধা ঘটে বিষ্ণুর নিদ্রায়,
জলে রঙ ধ'রে—দ্রুতবৈদূর্য্যের,
কুয়াসার মত ঘুরে বেড়ায়—লঘুমেঘ,
—কাজ থাকে না ইন্দ্রের।

সেই সময়ে যখন—

শারদাভিযানের পূর্ব্বে নীরাজিত* হয় তুরঙ্গ,
উদ্দাম হয়ে ওঠে হস্তী,
দর্পে স্ফীত হয় বৃষযূথ,

সেই সময়ে বাণ রাজার নিকটে নিলেন বিদায়।

বন্ধুদের দেখবার আবার বাসনা হয়েছে তাঁর।

ব্রাহ্মণাধিবাসের পথে তখন—

মুদে গেছে নীপের সৌন্দর্য্য,
কুটজে আর ফুল নেই,
মুকুল নেই কন্দলে ;

---

* সমরগমনার্থং কৃতশান্তিকর্ম্মাণো বাজিনঃ।

তার বদলে—

কমলে জেগেছে কোমলতা,
মধু ঝরছে ইন্দীবরে,
কহ্লারে লেগেছে আহ্লাদ।

ভারি মিঠে লাগতে লাগল সেই ঘরে-ফেরার পথ;—

শেফালি-শীতল রাত, গন্ধ উঠছে দোলনচাঁপার,
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে কুমুদফুলের শুভ্র সুরভি,
সপ্তচ্ছদের রেণুতে রেণুতে ধূসর হয়ে গেছে সমীরণ,
অকালসন্ধ্যার সৃষ্টি ক'রে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটে রয়েছে বাঁধুলিফুলের ঐশ্বর্য্য।

ব্রাহ্মণাধিবাসে যখন এসে পৌঁছলেন বাণ,—তখন—

গ্রামের পথে কর্দ্দম নেই,
নদীর তীরে তীরে বালুর চরে চরে নতুন পাতা গজিয়েছে,
একটু কালো হয়ে এসেছে পরিণত শ্যামাকধানের রঙ,
রেণু ধরেছে প্রিয়ঙ্গুর মঞ্জরীতে,
কঠোর হয়ে এসেছে শশার ছাল,—আর
দোধারি শরবন ফুটন্ত ফুলে হাসছে।

প্রভূত রাজসম্মান পেয়ে ফিরেছে আমাদের বাণ—তাই পরিতুষ্ট হয়ে বাণের জ্ঞাতিবর্গেরা প্রশংসা করতে করতে এগিয়ে এলেন। সে এক স্তব-ভরা সমাদর। কাউকে বাণ অভিবাদন জানালেন, কেউ আবার বাণকে করল অভিবাদন। কেউ এসে চুম্বন করলেন বাণের মস্তক, বাণ আবার কারোর আঘ্রাণ করলেন শিরঃ।
কেউ দিলেন কোল, কাউকে ইনি দিলেন কোল;
আশীর্ব্বাদের অনুগ্রহ বহন ক'রে কাউকে করলেন আশীর্ব্বাদ।
বহুদিন পরে অনেক বন্ধুবান্ধবদের মাঝখানে বাণের যেন আনন্দ আর ধরে না।
বাণের এই অতর্কিত শুভাগমনে হৃত-চিত্ত হ'ল পরিজন,—হর্ষে।
তারা তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিল।

গুরুজনেরা সমাসীন হ'লে বাণ একখানি আসনেতে বসলেন। মিষ্ট লাগতে লাগল, যখন সকলে মিলে তাঁর অর্চ্চনা-সংস্কার করলে। ম্রীয়মাণ মনখানি নিয়ে ঘুরে ঘুরে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আশা করি, এতদিন তোমরা সুখে ছিলে। কেমন তো? কোন বাধা ঘটে নি তো যজ্ঞক্রিয়ায়? যথাবিহিত ক্রিয়ার পরে তুষ্ট হতেন তো ব্রাহ্মণচক্র? আশা করি, ভগবান্ অগ্নিদেব গ্রহণ করেছেন যথাশাস্ত্র মন্ত্রোচ্চার-ক্ষিপ্ত হবিঃ। নিয়মিত অধ্যয়ন করত তো বটুরা? প্রতিদিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তো বেদাভ্যাস? যজ্ঞবিদ্যাকর্ম্মে তোমাদের মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে নি তো? ব্যাকরণ অধ্যয়নের সময় ব্যাখ্যানমণ্ডল বসত তো? এ ওকে হারিয়ে দিচ্ছে, ও একে জিতে নিচ্ছে, স্পর্দ্ধিত সমালোচনের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হ'ত তো তোমাদের অধ্যাপনা? বিফলে যেত না তো দিনগুলি? আর সেই সব কাজ ভুলিয়ে দেওয়া প্রমাণ-গোষ্ঠী? আর মীমাংসা? ঐ একটি বিদ্যা, যার অতিরস অন্য শাস্ত্রের রসকে লঘু ক'রে দেয়। আশা করি, নতুন নতুন কথার, নতুন নতুন ভাষার মধু ঝরিয়ে তোমাদের মধ্যে আগেকার মতই চলত কাব্যালাপ।"

তাঁরা তখন বললেন—

"আমাদের তো চিরদিনই অল্পেই তুষ্টি। বিদ্যাবিনোদের সন্নিধানে আমরা সর্ব্বদা বাড়ছি, সহায় আমাদের একমাত্র বৈতানবহ্নি। আমাদের অভাব তো কিছুই নেই। আর সুখের অভাব কোথায়, যখন শেষনাগের দীর্ঘদেহের মত বিশাল বাহু নিয়ে পৃথিবী রক্ষা করছেন পৃথ্বীপতি দেব-হর্ষ। সত্যিই, সব দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে সত্যিই আমরা সুখী; এবং বিশেষ ক'রে আজকে; সুখী, কারণ তুমি ত্যাগ করেছ আলস্য; পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছেছ, এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসেছ বেত্রাসনে। এখানকার সকলেই যথাশক্তি, যথাবিভব, ব্রাহ্মণের যথাকর্ত্তব্য যথাকালে সম্পন্ন করছেন।"

ইত্যাদি-প্রকার কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে আলাপ গড়িয়ে চলল হর্ষদেবে, হর্ষদেবের স্কন্ধাবারে, ছেলেবেলাকার ক্রীড়ামধুর দিনগুলির স্মরণে, পূর্ব্বপুরুষদের অতীত কাহিনীতে।

বিনোদিত হয়ে জ্ঞাতি-স্বজন-বান্ধবদের মধ্যে অনেকক্ষণ কেটে গেল বাণের ; তারপরে গাত্রোত্থান ক'রে সমাধা করলেন মাধ্যাহ্নিক কৃত্য।

ভোজন শেষ হ'লে তাঁকে আবার ঘিরে বসল জ্ঞাতিকুটুম্বেরা।

যখন সকলে সমবেত হয়েছেন তখন সেখানে উপস্থিত হলেন—ময়ূরের অপাঙ্গের মত পাণ্ডুবর্ণ পৌণ্ড্রদেশীয় দুখানি রেশমের অধোবাস আর উত্তরবাস প'রে, বন্দিত তীর্থমৃত্তিকার গোরোচনায় স্নানান্তিক তিলক রচনা ক'রে, আমলক-তৈলে চিক্কণ তাঁর মৌলি, ছোট্ট চূড়ায় পুষ্পগুচ্ছের নিবিড় চুম্বন, শলাকা দিয়ে অঞ্জন-টানা লোচনের সৌন্দর্য্য,—আমাদের পুস্তকবাচক "সুদৃষ্টি।"

আহার সমাধা ক'রে তিনি এসেছেন। ঘন ঘন তাম্বূল-চর্ব্বণে অধরখানিকে নির্ম্মল লালিত্যে রাঙিয়ে নিয়ে, বিনীত আর্য্যবেশে অদূরবর্ত্তী আসন্দীতে ব'সে পড়লেন। সম্মুখে রক্ষিত ছিল শরশলাকার একখানি যন্ত্রক। ধীরে ধীরে সূত্র-মুক্ত ক'রে পুস্তকখানি সেই যন্ত্রকের উপর রাখলেন।

> যদিও সুতোটি সরালেন, তবু মনে হ'ল নখের কিরণের মৃদু মৃণালসূত্র দিয়ে পুস্তকখানিকে আবার যেন জড়ালেন।

বাঁশী হাতে নিয়ে তাঁর ঠিক পিছনে এসে বসলেন "মধুকর" আর "পারাবত" ; দিতে লাগলেন স্থানক তাল। প্রভাতে যতখানি পাঠ হয়েছে, তার বিরাম-জ্ঞাপক একটি চিহ্নপত্র ছিল পুস্তকের মধ্যে। সেইটিকে সরিয়ে ফেলে সুদৃষ্টি কতকগুলি-পাতা-ধরে—এমন একটি কপাটিকা তুলে নিয়ে গান গেয়ে পাঠ করতে লাগলেন বায়ুপুরাণ।

> দন্তকান্তি দিয়ে যেন ধুইয়ে দিলেন মসীমলিন অক্ষরগুলি ; সমুচ্চারণের শুভ্র কুসুম ছড়িয়ে দিয়ে অর্চ্চনা করলেন গ্রন্থটিকে, এবং শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করলেন গমকের মাধুর্য্যে।
>
> সরস্বতীর নূপুরধ্বনির মত, সেই গমক নেচে উঠল তাঁর মুখে।

গান গেয়ে পাঠ ক'রে চলেছেন সুদৃষ্টি এবং মুগ্ধ হয়ে শুনছে শ্রোতাদের সৌভাগ্যবান শ্রবণগুলি, এমন সময় অনতিদূরে গীতধ্বনিকে অনুবর্ত্তন ক'রে

চারণ সূচীবাণ তার মধুরস্বরে পাঠ ক'রে উঠল আর্য্যা-ছন্দে-গড়া শ্লিষ্ট-উপমা-দেওয়া দুটি শ্লোক—

> "তদপি মুনিগীতমতিপৃথু তদপি জগদ্ব্যাপি পাবনং তদপি
> হর্ষচরিতাদভিন্নং প্রতিভাতি হি মে পুরাণমিদম্ ॥ ১ ॥
> বংশানুগমবিবাদি স্ফুটকরণং ভরতমার্গভজনগুরু
> শ্রীকণ্ঠকবিনির্য্যাতং গীতমিদং হর্ষরাজ্যমিব ॥ ২ ॥*

সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাণের চার জন জাঠতুতো ভাই ।—

গণপতি, অধিপতি, তারাপতি, এবং শ্যামল,—তাঁদের নাম ।—

ব্রহ্মার যেন মুখপদ্ম, বেদাভ্যাস-পবিত্রিত-মূর্ত্তি, ব্যাকরণে ছিল তাঁদের ন্যায়বিৎ দক্ষতা ।—

> (জয়াদিত্য এবং বামনের) কাশিকাবৃত্তি এবং (ভর্ত্তৃহরির) বাক্যপদীয় তাঁরা গ্রহণ করছিলেন প্রসন্নতার সঙ্গে ;
> কঠিন পদ-সিদ্ধির সময় আশ্রয় নিতেন জিনেন্দ্রের ন্যাসে ;
> পাণিনির সহাধ্যায়ী, বর্ষপুত্র ব্যাড়ির "সংগ্রহ"-গ্রন্থের অভ্যাস তাঁরা নিত্য করতেন ;
> শব্দসিদ্ধির শুদ্ধি এবং সাধুতায় তাঁরা লাভ করেছিলেন অসামান্য ব্যুৎপত্তি ।

পুরাণ, ইতিহাস এবং রাজর্ষিচরিতে যাঁরা অভিজ্ঞ, মহাভারতের মাধুর্য্যে নিত্য ভাবিত হয়ে থাকত যাঁদের আত্মা, মহাকবি, মহাবিদ্বান,—বয়সে, বাক্যে, যশে, তপে, সভায়, মহত্ত্বে, শরীরে এবং হোমে যাঁরা ছিলেন সর্ব্বপ্রথম,—তাঁরা (বোধ হয় পূর্ব্ব থেকেই তাঁদের পরামর্শ হয়ে গিয়েছিল)—সূচীবাণের আর্য্যাপাঠ শুনেই, কী যেন কি বলতে চাইছেন—কপোলোদরে এমন একটি ভাবের মৃদুহাস্য-ধবলিত তরঙ্গ তুলে, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগলেন ।

* মুনির গান এই পুরাণ অতিবিপুল, জগদ্ব্যাপী এবং পাবন । কিন্তু আমাদের কাছে হর্ষচরিত থেকে অভিন্ন ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে ।

এই সঙ্গীত—বেণুধ্বনির সাহচর্য্যে, শোভনকণ্ঠনিঃসৃত হয়ে, ভরতমার্গের অনুসরণ ক'রে, অবিবাদী স্বরগ্রামের করণগুলিকে পরিস্ফুট ক'রে ধ্বনিত হচ্ছে ;

এই সঙ্গীতের তুলনা দেওয়া চলে হর্ষরাজ্যের সঙ্গে ;- যে রাজ্য শ্রীকণ্ঠনামা জনপদ থেকে বিনির্য্যাত, যে রাজ্যে অবিবাদী চলেছে বংশক্রম, যে রাজ্যে ধর্ম্মকরণ অপ্রতিহত, এবং যে রাজ্য ভরতরাজের নির্দ্দিষ্ট মার্গ ভজনা ক'রে গরীয়ান হয়ে রয়েছে ।

তাঁদের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠ তিনি ছিলেন বাণের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সঙ্কেত পেয়ে সেই কমল-দীর্ঘ-লোচন শ্যামল প্রণয়ভরে বললে,—

"তাত বাণ, দ্বিজরাজ চন্দ্র গুরুপত্নীকে গ্রহণ করেছিলেন। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে পুরুরবা আত্মসাৎ করেছিলেন ব্রাহ্মণের ধন,—ফল হয়েছিল প্রাণপ্রিয় পুত্র আয়ুঃর মৃত্যু। পরস্ত্রী-কামী নহুস—তিনি তো হলেন একটি মহাভুজঙ্গ। যযাতির পতন হয়েছিল ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ ক'রে। স্ত্রীময় হয়েছিলেন রাজা সুদ্যুম্ন। নিজের ছেলে 'জন্তু'কে হত্যা করার নির্ঘৃণতায় সোমক প্রখ্যাত। মার্গণব্যসনী মান্ধাতাকে শেষ পর্য্যন্ত পুত্র-পৌত্রদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছিল রসাতলে। মেখলকন্যকার উপর তপস্যাকালেও কুৎসিত ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি পুরুকুৎস। ভুজঙ্গলোক পরিগ্রহ ক'রেও কুবলয়াশ্ব ছেড়ে দেন নি অশ্বতরেব কন্যাকে। প্রথমপুরুষক পৃথু, তিনি পৃথিবীকে পরিভূত করেছিলেন। কৃকলাস হওয়ার দরুণ নৃগের সময়ে ঘটেছিল বর্ণসঙ্কর। সৌদাস ক্ষিতিকে রক্ষা করেন নি, পর্য্যাকুলিত ক'রে তুলেছিলেন। অবশ অক্ষ-হৃদয় নলকে অভিভূত করেছিলেন কলি। মিত্রদুহিতা তপতীকে দর্শন ক'রে সম্বরণ সম্বৃত করতে পারেন নি নিজেকে। দশরথের এত উন্মাদ হয়েছিল স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, যে তিনি মারা যান। কার্ত্তবীর্য্যের নিধন হয়, কী পীড়নই না তিনি করেছিলেন গোব্রাহ্মণকে! বহুসুবর্ণক-যজ্ঞ অনুষ্ঠান ক'রেও মরুত্ত বৃহস্পতির নিকট থেকে সম্মান পান নি। অতিব্যসনবশতঃ শান্তনু বাহিনী-(গঙ্গা ও সেনা)-বিযুক্ত হয়ে একাকী অরণ্যে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। মদনরসাবিষ্ট পাণ্ডু বনের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছিলেন,—মৎস্যের মত। আশঙ্কায় ভিন্নহৃদয় হয়ে যুধিষ্ঠিরও একদা কুরুক্ষেত্রে সত্যকে দিয়েছিলেন বিসর্জ্জন। কিন্তু দেখতে তো পাই না অকলঙ্ক কোন রাজা,—দেবদেব সপ্তদ্বীপাধিপতি শ্রীহর্ষ ব্যতীত!

এঁর সম্বন্ধে লোকমুখে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনতে পাই। যেমন:—বলজিৎ ইন্দ্রের মত ইনি নাকি কৃতপক্ষ হয়ে নিশ্চল ক'রে দিয়েছিলেন চলন্ত ক্ষিতিভৃৎদের; শেষরাজাদের উপর ক্ষমার গৌরব প্রদান করেছিলেন প্রজাপতির মত; এই পুরুষোত্তম একদা সিন্ধুরাজকে মন্থন ক'রে আত্মীয়া করে নিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে; এই বলীই নাকি একদিন ভুভৃৎদের বেষ্টনী থেকে মোচন ক'রে মুক্তি দিয়েছিলেন মহানাগকে। এই দেবতাই অভিষিক্ত করেছিলেন কুমারকে (কুমাররাজ)। এঁর অনেক কাহিনীই কানে এসেছে আমাদের। এক আঘাতেই নাকি শত্রু নিপাত ক'রে শক্তি দেখিয়েছিলেন এই আমাদের

প্রভু। নরসিংহের মত এর বিক্রম, স্বহস্তে ফেঁড়ে দিয়েছিলেন শত্রুকে। দুর্গম তুষারশৈলপ্রদেশ থেকে এই পরমেশ্বরের কাছে আসে—কর। এই লোকনাথই দিকে দিকে পরিকল্পনা করেছেন লোকপালদের; নিখিলভুবনের ঐশ্বর্য্যকোষ বিভাগ ক'রে দিয়েছেন অগ্রজন্মাদের মধ্যে। এই সব থেকেই আমরা দেখতে পাই সত্যযুগের সমারম্ভ।

সুতরাং পূর্ব্বপুরুষবংশানুক্রমিক এই মহাপুরুষের, সার্থকনামা পুণ্যঘন এই মহাপুরুষের, চরিতনামা শুনতে ইচ্ছা হওয়া আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। আমাদের এই বাসনাটিরও বয়স হয়েছে অনেক। যারা ক্ষুল্লক, নীরসনিষ্ঠুর, তাদের মনখানিকেও আকর্ষণ করে মহৎদের গুণ—লোহাকে যেমন টেনে আনে অয়স্কান্তমণি; তাদের কথা আর কি বলব—যারা স্বভাবসরস, যারা স্বভাবমৃদু। দ্বিতীয় মহাভারতের মত এই চরিতকথা শুনতে কার না জাগে কুতূহল? হর্ষচরিত আমাদের বলুন। আমাদের এই ভার্গব-বংশ, শুচিমান রাজর্ষি-চরিত-শ্রবণ ক'রে শুচিতর হোক্।"

এই ব'লে শ্যামল স্তব্ধ হলেন।

হেসে হেসে বাণ তখন বললেন—

"আর্য্য, আপনার বলাটি যুক্তিসঙ্গত হ'ল না। আপনারা যা চাইছেন কার্য্যতঃ তা গ'ড়ে তোলা আমি অসম্ভব ব'লে মনে করি। স্বার্থতৃষ্ণা সম্ভব ও অসম্ভবের সীমানা নির্দ্দেশ করতে পারে না। আপনারা ভালবেসে ফেলেছেন, আপনাদের মুগ্ধ করেছে প্রিয়জনের কথা-শোনবার একটা উদ্দাম আগ্রহ। এই সব ক্ষেত্রে আমার মনে হয় মহৎ ব্যক্তিদেরও মননশক্তি হারিয়ে ফেলে বিবেক। দেখুন কোথায় এই পরমাণুপরিমাণ বটু-হৃদয়, আর কোথায় সেই ব্রহ্মাস্তম্ভব্যাপী দেবচরিত্র! পরিমিত বর্ণবৃত্তি জোড়া দিয়ে, বা কতকগুলো শব্দের যোজনা ক'রে আমি কেমন ক'রে উদ্ভাসিত ক'রে তুলব চরিত্রগুণের অসংখ্যতা? সর্ব্বজ্ঞেরও ইনি অবিষয়, বাচস্পতিরও ইনি অগোচর, সরস্বতীরও ইনি অতিভার। আমাদের মত ক্ষীণ ক্ষমতাবান্ লোকের কথা ছেড়ে দিন। একশ পুরুষ ধ'রে বললেও পূর্ণ বর্ণনা করা যাবে না এই চরিতকথা। যদি আংশিক বা খানিকটা শুনে আপনাদের কুতূহল মেটে, তা হ'লে আমি প্রস্তুত আছি—সেজেগুজে। কতকগুলো অক্ষরের কণা নিয়ে খেলা করতে করতে হাল্কা হয়ে গেছে

আমার জিহ্বা। যোগ্যতর আর কোন্ কাজেই বা লাগবে সে? শ্রোতা হবেন আপনারা, বর্ণিত হবে হর্ষচরিত, আর কি চাই?

আজ কিন্তু প্রবীণ হয়ে এসেছে দিন। সমন্তপঞ্চকের শোণিত-সায়রে ভগবান্ পরশুরামের মত কপিলজটার ভাস্বরতা নিয়ে সন্ধ্যারাগের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন সূর্য্য। আজ আর নয়, আগামী কাল আমি হব নিবেদয়িতা।"

সকলে ব'লে উঠলেন, "আচ্ছা তাই।" বিলম্ব না ক'রে বাণও গাত্রোত্থান করলেন এবং সন্ধ্যাবন্দনা সাঙ্গ করতে চ'লে গেলেন শোণনদের তীরে।

ধীরে ধীরে দিনখানি মুদে এল। ছড়িয়ে পড়ল মধুমদপল্লবিত মালবরমণীর গণ্ডের মত কোমল একখানি রৌদ্র। কমলিনীদের সঙ্গে মিলন হয়েছিল—তাই বোধ হয় অত লোহিতবরণ দেখতে হ'ল তমোলেহী অস্ত-সূর্য্যকে। রবিরথের ঘোড়ার খুরচিহ্নটিকে অনুসরণ ক'রে যমের মহিষের মত আকাশে ছুটে এল অন্ধকার।

ক্রমে ছোট্ট ছোট্ট কুটীরের ছাদে, অস্তরৌদ্রের রক্তখণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল গৃহতাপসদের বল্কল। অগ্নিহোত্রের প্রতিঘর থেকে কল্কিরাজের কলঙ্ক হরণ ক'রে নিয়েই যেন আকাশে উঠতে লাগল ধূম।

নিয়ম পালন ক'রে মৌনব্রত নিলেন যজমানেরা। গৃহকার্য্য থেকে অবকাশ পেয়ে এদিকে ওদিকে বেড়াতে লাগলেন পত্নীরা। দুগ্ধ দোহন হতে লাগল হোম-ধেনুদের,—তাদের সামনে রয়েছে সবুজ শ্যামাকধানের আঁটি।

আহুতি পড়তে লাগল বৈতানবহ্নিতে।

পবিত্র বেত্রাসনে সমাসীন হয়ে জপ করতে লাগল জটাধারী বটুরা, অঙ্গে তাদের কৃষ্ণাজিনের জটিলতা। ব্রহ্মাসনে ব'সে ধ্যান করতে লাগলেন যোগীরা; করতালে ধ্বনি তুলে দৌড়তে লাগল শিষ্যেরা। অলস বৃদ্ধ শ্রোত্রিয়েরা,—সান্ধ্য-শিক্ষা দিতে লাগলেন; আর যত সব অপগণ্ড, বিলাসী আর অল্পবুদ্ধি শিষ্যসমাজ ভুল করতে করতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উচ্চারণ করতে লাগল গ্রন্থের দণ্ডকগুলো।

সম্পূর্ণ হ'ল সন্ধ্যা। আকাশে তখন নক্ষত্রের ভীড়।

নিজের ভবনে ফিরে এসে স্নিগ্ধ বন্ধুজনের মধ্যে গোষ্ঠীতে ব'সে রইলেন বাণ। আনন্দের ভিতর দিয়ে রাত্রির প্রথম যাম অতিবাহিত হয়ে গেলে শয়ন করতে চ'লে গেলেন গণপতির ভবনে; সেখানে পরিকল্পিত হয়েছিল শয়নীয়।

অন্য সকলেরা কোন ক্রমে রাত কাটাল আগ্রহ এবং কুতূহলের মধ্য দিয়ে। চোখ বন্ধ, কিন্তু ঘুম নেই চোখে;—নিদ্রাহীন কমলবন যেমন ক'রে অপেক্ষা ক'রে থাকে সূর্য্যোদয়ের।

রজনীর চতুর্থযামে চারণ সূচীবাণ জেগে উঠে গান করতে লাগল দুটি স্রগ্ধরা শ্লোক—

> "পশ্চাদাঙ্ঘ্রিং প্রসার্য্য ত্রিকণতিবিততং দ্রাঘয়িত্বাঙ্গমুচ্চৈ—
> রাসজ্যাভুগ্নকণ্ঠো মুখমুরসি সটা ধূলিধূম্রা বিধূয়
> ঘাস-গ্রাসাভিলাষাদনবরতচলৎপ্রোথতুণ্ডস্তুরঙ্গো
> মন্দং শব্দায়মানো বিলিখতি শয়নাদুত্থিতঃ ক্ষ্মাং খুরেণ ॥ ১ ॥*
> কুর্ব্বন্নাভুগ্নপৃষ্ঠো মুখনিকটকটিঃ কন্ধরামাতিরশ্চীং
> লোলেনাহন্যমানং তুহিনকণমুচা চঞ্চতা কেসরেণ
> নিদ্রাকণ্ডূকষায়ং কষতি নিবিড়িতশ্রোত্রশুক্তিতুরঙ্গ—
> স্ত্বঙ্গৎপক্ষ্মাগ্রলগ্নপ্রতনুবসুকণং কোণমক্ষ্ণঃ খুরেণ ॥ ২ ॥†

গান শুনে ঘুম ভেঙে গেল বাণের।

প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে উপাসনা করলেন ভগবতী সন্ধ্যার।

তারপরে হ'ল সূর্য্যোদয়।

তাম্বূল গ্রহণ ক'রে সেইখানেই ব'সে রইলেন।

জ্ঞাতিবর্গ ধীরে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ঘিরে বসলেন।

বাণও পূর্ব্বদিনের প্রস্তাবমত তাঁদের সামনে উদ্ঘাটিত করতে লাগলেন— হর্ষচরিত-নামা।

* ঘুম ভেঙে গেছে তুরঙ্গের। পিছন দিকে একখানি পা প্রসারিত ক'রে দিয়ে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে, ছড়িয়ে, লম্বা ক'রে দিয়েছে তার দীর্ঘ দেহ; ঘাড় বাঁকিয়ে বুকের কাছে মুখ এনে ধূলিধূম্র স্কন্ধরোমগুলিকে কাঁপাতে কাঁপাতে ঘাসের গ্রাসের অভিলাষে অনবরত স্ফারিত করছে তার নাসা। ফর্‌র্ ফর্‌র্ শব্দ করতে করতে খুর দিয়ে খুঁড়ছে মাটি। ঘুম ভেঙে গেছে তুরঙ্গের। ১।

† সঙ্কুচিত করেছে শ্রোত্রশুক্তি; পিঠখানিকে বাঁকিয়ে মুখের কাছে নিয়ে এসেছে কটি; কন্ধরটিকে তেরছা ক'রে চঞ্চল খুর দিয়ে নয়নের নিদ্রাকণ্ডূকষায় কোণটিকে ঘষছে। খুরের চারদিকে নেমেছে শিশির-ভেজা লোমের ঝুরি আর চোখের পাতার ডগায় লেগে আছে কুট্টির কণা।

ঘুম ভেঙে গেছে তুরঙ্গের। ২।

শ্রূয়তাম্—

"শ্রীকণ্ঠ" নামে একটি দেশের কথা বোধ হয় আপনারা শুনেছেন।

ধরায়-নেমে-আসা যেন পুণ্যবানদের ইন্দ্রালয়।

সত্যযুগের মত সেখানকার ব্যবস্থা। সেখানে সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় নি বর্ণব্যবহার-স্থিতি।

এত স্থলপদ্মের গাছ জন্মায় এই শ্রীকণ্ঠদেশে যে, যখন লাঙলের ফলা দিয়ে উলটিয়ে দেওয়া হয় জমি, তখন উড়ন্ত মধুকরেরা যেন গুঞ্জনস্বরে প্রচার করতে থাকে এর সরস উর্ব্বরতা।

এখানকার একটি বিশেষত্ব এর বাট-কাটা পুণ্ড্র আখের ক্ষেত; কি ঘন, কি অজস্র! এত মিঠে আখ! মনে হয় মেঘেরা ক্ষীরোদসাগরের দুধ খেয়ে জল ঢেলে দিয়ে গেছেন ক্ষেতগুলিতে।

যে দিকেই চেয়ে দেখ, সেই দিকেই দেখতে পাবে সীমান্তগুলিতে সঙ্কট সৃষ্টি ক'রে হাজারে হাজারে জেগে রয়েছে ধানঝাড়াই খইলান। প্রতি খইলানে শস্যের শিশুপাহাড়।

ক্ষেতে ক্ষেতে জীরকের জটিলতা, ঘটি-বাঁধা ঘির্ণি ঘুরিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে ক্ষেতে ক্ষেতে জলসেচন করছে চাষীরা।

শালিধান্যের উর্ব্বরা ঋদ্ধি অলঙ্কার পরিয়ে রেখেছে দেশটিকে। কী গমই না ফলেছে—আকাড়া জমিতেও। আর তার মাঝে মাঝে পাক ধরেছে সোনালি মুগ আর রাজমাষার ছোবা।

বনে বনে কী নরম ঘাস,—শিশির দিয়ে যেন কাটা যায়! সেই ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তৃপ্তবপু গোধন,—এ বন থেকে ও বনে। গলায় তাদের ঘণ্টা বাঁধা,—বাজছে; তাদের পিছনে পিছনে উড়ছে পোকা খেতে খেতে চড়াই পাখীর সমাজ; মোষের পিঠে চ'ড়ে গান গাইতে গাইতে রাখাল বালকেরা চরিয়ে যাচ্ছে নধর গরুগুলোকে, তাদের দুধ ক্ষীরের মত মিষ্টি। শিবের ষাঁড় ক্ষীরোদ-সাগরকে পান ক'রে বোধ হয় আমাশার ভয়ে লক্ষ লক্ষ এই সব গরুদের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন সাগরের ক্ষীর।

দেশের যেখানেই যাও, সেখানেই দেখতে পাবে হাজার হাজার কৃষ্ণশারের ঝাঁক। কী সুন্দর তাদের গাত্রচর্ম্ম!—হোমের ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে ইন্দ্র যেন ঝরিয়ে দিয়েছেন তাঁর সহস্রলোচন!

সেখানকার প্রদেশগুলি কেতকীফুলের রেণুতে রেণুতে শুভ্র,—যেন শিব-প্রমথের ভস্মধূসর শিবপুরীর প্রবেশ-পথ। গ্রামের কণ্ঠে উপকণ্ঠে ক্ষেত্রপৃষ্ঠগুলি শাক আর কন্দলে শ্যামলিত। পদে পদে উদ্যান।

সেখানে কোথাও মাতুলুঙ্গীর পাতা কচ্‌লে রস বার করছে ছেলে-বুড়োরা সকলে;

কোথাও শিশু উটগুলো দলে দলে দ্রাক্ষাবনের দিকে চলেছে, দ্রাক্ষালতার মাঝে মাঝে পীলুপাতার বাহার;

হেথায় হোথায় জাফ্রানের ক্ষেত, ফুলের তোড়ার মত তাদের কেশরের সন্নহ;

কোথাও আবার টাটকা আঙুরের রস খেয়ে দ্রাক্ষাকুঞ্জের তলায় সুখে নিদ্রা যাচ্ছে পথিকেরা। আহা, সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলি! তারা যেন বনদেবীদের অমৃতের-সত্র।

আবার কোনও কোনও উদ্যানে দেখা গেল দাড়িমগাছের বন; ঝক্‌ঝক্ করছে বড় বড় দাড়িমফল, তাদের দানায় লেগেছে শুকচঞ্চুর রক্তরাগ; লোভে লোভে দলে দলে বাঁদরেরা এসে জুটেছে, আর দাড়িম-ফুলগুলোর রঙ মিশে যাচ্ছে বাঁদরদের গালগুলোর রঙের সঙ্গে।

উপবনে উপবনে সুন্দরিত সেই দেশ।

সেই সব উপবনে এসে নারিকেল-রসের মদ্য খেয়ে যায় বনরক্ষকেরা, পিণ্ডখর্জ্জুর লুট ক'রে নেয় পথিকেরা, গোলাঙ্গুলগুলো ধীরে ধীরে এসে চাটতে থাকে মোদো-গন্ধ পিণ্ডীরস; আর চকোরদের চঞ্চুতে জর্জ্জরিত হয়ে যায় অরুকগাছের ফল। সেই দেশের অরণ্যরন্ধ্রে দেখতে পাওয়া যায় অনেক বনসায়র। তার তীরের চারদিক ঘিরে উঁচু উঁচু অর্জ্জুনগাছের সারি। সেখানে পথিকেরা এসে শরণ নেয়, আর পালে পালে গরুরা নেমে কলুষিত করে জল।

এত দেশ দেখেছি, কিন্তু এত উট আর ভেড়া দেখি নি কোথাও। সেখানে দেখেছি বায়ুহরিণদের মত স্বচ্ছন্দচারিণী বড়বাদের পাল; সারা দেশ খচিত হয়ে

রয়েছে ; তাদের পেটের ভিতর যে বাচ্ছাগুলি রয়েছে তাদের মধ্যে গতিরাগ আনবার উদ্দেশ্যেই যেন তারা নাসা তুলে ঝড়গুলোকে শুষে নিচ্ছে, আর মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে সারা অঙ্গে রক্তিমা মাখছে জাফ্রাণের ; বোধ হয় তাদের উদ্দেশ্য—রবিরথের সাত-ঘোড়ার মন-ভোলানো।

এই শ্রীকণ্ঠে জনসমাজ সঙ্গীতগত-মুরজরবমত্ত ময়ূরের মত বৈভবে মুখরিত, গৃহস্থ-সমাজ আতিথ্যধর্ম্মে বিখ্যাত, আর মহৎ-সমাজ কস্তুরীচর্ম্মাচ্ছাদিত হিমালয়ের পদমূলের মত স্থির।

দাক্ষিণাত্য, গার্হপত্য এবং আহবনীয় অগ্নির ধূমাশ্রুতে ক্ষালিত হয়েই এখানে যেন ক্ষীণ হয়ে যেত অশুভঙ্করী দৃষ্টি। পচ্যমান যজ্ঞীয় ইষ্টকের অগ্নিতে দগ্ধ হয়েই যেন অদৃশ্য হয়ে যেত দুষ্কৃতি। যূপদারুবিদারী কুঠারের আঘাতেই যেন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত অধর্ম্ম। যজ্ঞাগ্নিধূমের মেঘধারার জলেই ধৌত হয়ে যেন নষ্ট হয়ে যেত বর্ণসঙ্কর।

কলিরাজের স্থান ছিল না এখানে ;—ব্রাহ্মণদের যে গাভী-দান করা হ'ত, সেই সব সহস্র সহস্র গাভীর শৃঙ্গে খণ্ড্যমান হয়েই তিনি কি পালিয়েছিলেন ?

বিপদ বিদীর্ণ হ'ত এখানে ;—মন্দিরের পাথর-কাটা বাটালির আঘাতে। মহাদান-বিধানের সোরগোলে আক্রান্ত হয়েই যেন দৌড় মারত উপদ্রবগুলো। ব্যাধিরা বিলীন হ'ত ;—তারা তাপ সহ্য করতে পারত না, সহস্র সহস্র যজ্ঞীয় মহানসের।

বৃষবিবাহে এত বেজে উঠত পটহ যে ত্রাসিত হয়ে এখানে পদধারণ করতে পারত না অপমৃত্যু।

যেখানে চারিদিকে উঠছে ব্রহ্মধ্বনি সেখানে কেমন ক'রে আসবে "ইতি" রোগ ? যেখানে ধর্ম্মের অধিকার সেখানে নির্বীর্য্য হয় দুর্দ্দৈব। এই হেন শ্রীকণ্ঠরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্থাণ্বীশ্বর নামে এক জনপদবিশেষ।

স্থাণ্বীশ্বর—

ভুবনের যৌবনারম্ভ ; রামা-অভিরাম আরাম-কানন সেখানে, কুসুম, গন্ধ, সৌন্দর্য্য সেখানে !

যেন ধর্ম্মের অন্তপুর-মন্দির, কুঙ্কুম-গোরী সহস্র সহস্র মহিষীতে সুন্দরিত ;

যেন সুখরাজ্যের একাংশ,—পবনান্দোলিত চমরীর বালব্যজনে শুভ্রায়িত তার প্রান্ত ;

ঊর্দ্ধশিখ হোমানল-সহস্রকে দেখে মনে হ'ত—দশদিগন্ত-জ্বলা মশাল,
আর সঙ্গে সঙ্গে স্থান্বীশ্বরে জাগত সত্যযুগের শিবির-সন্নিবেশের কল্পনা।
এ যেন ব্রহ্মলোকের প্রথম সৃষ্টির স্বপ্ন ;—পদ্মাসনে ব'সে ব্রহ্মর্ষি যেন ধ্যান করছেন,—অকল্যাণকে দূর ক'রে দিয়ে এনে দিচ্ছেন শান্তি।
কলধ্বনিমুখর শত শত মহাবাহিনী-সঙ্কুল এটি যেন উত্তরকুরুর প্রতিস্পর্দ্ধী।
প্রজাদের উপর অত্যাচার বা পীড়ন ছিল না এখানে।
সুধা-ধবল গৃহশ্রেণী—চন্দ্রলোকের প্রতিনিধি।
মিথ্যা বলা হবে না, যদি একে তুলনা করি কুবের-রাজধানী অলকার সঙ্গে,—আহা, মধুমত্ত-যক্ষ-বধূদের মতই অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী এখানকার ললনারা ভূষণ-শিঞ্জিতে পূর্ণিত করতেন ভুবন।

এই স্থান্বীশ্বরকে—

মুনিরা বলতেন তপোবন,
রূপজীবিকারা বলত কামায়তন,
লাসকদের নিকটে এটি সঙ্গীতশালা,
শক্রদের কাছে যমনগর।
অর্থীদের চোখে চিন্তামণির ভূমি,
শস্ত্রোপজীবীদের চোখে—বীরক্ষেত্র,
বিদ্যার্থীরা একে বলত গুরুকুল,
গায়নদের এটি—গন্ধর্ব্বনগর।

যাঁরা বিজ্ঞানচর্চ্চা করেন তাঁদের জিজ্ঞাসা ক'রো—তাঁরা বলবেন,—স্থান্বীশ্বর বিশ্বকর্ম্মার মন্দির। আবার যাঁরা বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসান—তাঁরা বলবেন,—স্থান্বীশ্বর লাভের জায়গীর।
চারণদের কাছে এটি একটি পাশা-খেলার ছক্,
শরণাগতদের কাছে—বজ্রে-গড়া পিঞ্জর,

সাধুদের—এটি সাধুসমাগম।

এর উল্লেখ কর পণ্ডিতদের কাছে, তাঁরা হেসে বলবেন—"এটি বিটগোষ্ঠী",

পথিকদের শুধোও, তারা বলবে—"এটি সুফলের পরিণাম",

যারা বাতিক তারা চমকে বলবে—"ব'লো না, ওটা একটা অসুরদের গর্ত্ত",

আবার যাঁরা শমী তাঁদের উক্তি হবে—"স্থাম্বীশ্বর ? সে তো শাক্যমুনির আশ্রম" ;

কামীদের উক্তি—স্থাম্বীশ্বর, অপ্সরাদের দেশ,

চারণদের নিবেদন—স্থাম্বীশ্বর, মহোৎসব সমাজ,

ব্রাহ্মণদের ভাষণ—স্থাম্বীশ্বর, বসুধারা।

সেখানকার প্রমদারা বিরোধাভাস-অলঙ্কারের যেন সজ্জিত উদাহরণ ঃ—

মাতঙ্গগামিনী হ'লেও তারা শীলবতী,

গৌরী হ'লেও তারা উমা নয়,

শ্যামা হ'লেও পদ্মরাগিণী,

চন্দ্রকান্তমণির মত কঠিনতনু, কিন্তু অঙ্গগুলি যেন শিরীষফুলের মত কোমল,

পৃথুজঘন-শ্রীকা হ'লেও দরিদ্রমধ্যা,

তাদের মধ্যে লবণভাব থাকলেও মৌখিক ভাষায় ঝরত মাধুরী।

সেখানে প্রমদাদের নয়নগুলি মালার কাজ করত আননে ; ভার বোধ হ'ত নীলপদ্মের মাল্য।

প্রিয় কথাই যেখানে কানের দুল, কুণ্ডল কি সেখানে আড়ম্বর নয় ?

আলোকের জন্ম দিত রমণীদের কপোল ;—নিশায় মণিদীপ জ্বালানো ছিল সখের।

নিঃশ্বাসগন্ধে ছুটে এসে মধুকরেরা রচনা করত রমণীয় গুণ্ঠন,—কুলবধূদের জালিকা ছিল—আচার।

বাণীই ছিল মধুর বীণা, তন্ত্রীতাড়না মাত্র; শাস্ত্র-দর্শন।

হাসির শুভ্রতাই যেখানে অতিসুরভি পটবাস, সেখানে নিরর্থক নয় কি কর্পূরের ধূলি ?

অধরের কান্তিই যেখানে অঙ্গরাগের প্রসন্নতা, সেখানে নিগুর্ণ নয় কি লাবণ্যকলঙ্ক কুঙ্কুমপঙ্ক ?

পরিহাসপ্রহারে বাহুগুলিই কাজ করত কোমল বেত্রলতার, দরকারই হ'ত না মৃণালের।

যৌবনের স্বেদবিন্দু স্তনতটে নিয়ে আসত অলঙ্কারের মনোহারিতা, হারগুলো ছিল ভার।

শ্রোণীই ছিল অনুরাগীদের বিশাল স্ফটিক-বেদীতল, মণিহর্ম্ম্যে তাঁরা, যেতেন শুধু বিশ্রামের জন্য।

পদ্মলোভী ভ্রমর যেখানে মুখর পদাভরণ, ইন্দ্রনীলমণির নূপুর তো সেখানে নিস্ফল।

নূপুররবাহুত ভবনহংসেরাই তাদের সান্ধ্যভ্রমণের সহায়, সাথীরা তো ঐশ্বর্যের স্ফূর্ত্তি।

স্থান্বীশ্বরের রাজা ছিলেন 'পুষ্পভূতি'।
সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষের মত তিনি ধারণ করতেন সর্ব্ববর্ণধর ধনু
কল্যাণ, লক্ষ্মী এবং মর্য্যাদায়—
তিনি আকর্ষিতা প্রকৃতির রূপ ;
সেই তন্মাত্র দিয়ে গঠিত ছিলেন তিনি।
তাঁর বাক্যে বিরাজ করতেন বৃহস্পতি,
বক্ষে— পৃথরাজ,
মানসে— বিশালনৃপ,
তপস্যায়— জনকরাজ,
তেজে— সুযাত্র,
মন্ত্রণায়— সুমন্ত্র।
সভায় তিনি ছিলেন বুধ,
যশে— অর্জ্জুন,
ধনুকে— ভীষ্ম,
শরীরে— নিষধ,
সমরে— শত্রুঘ্ন,
প্রজাকর্ম্মে—দক্ষরাজ।
আদিরাজাদের তেজঃপুঞ্জ দিয়েই যেন নিৰ্ম্মিত হয়েছিলেন রাজা পুষ্পভূতি।

পৃথুরাজ একদা গাভীরূপ দান করেছিলেন পৃথিবীকে ; সেই জন্যই যেন স্পর্দ্ধিত-ঈর্ষ্যায় রাজা পুষ্পভূতি মহীকে রূপ দিলেন মহিষীর।

অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, বড় মানুষদের মন নিজের রুচি অনুসারেই পথ কেটে চলে, তাদের মনের প্রকৃতিই হয় স্বৈরিণী। রাজা পুষ্পভূতিই তার প্রমাণ।—

কেউ তাঁকে উপদেশ দেয় নি, তবু শিশুকাল থেকেই অন্য দেবতায় বিমুখ হয়ে গেল তাঁর মন ;—মন ছুটে চলল নিতান্ত-ভক্তির বিল্ব-চন্দন নিয়ে ভূতভাবন ভবচ্ছেত্তা ভগবান্ শঙ্করে! বৃষভধ্বজকে পূজার নিবেদন না ক'রে তিনি আহার করতেন না স্বপ্নেও। তাঁর ত্রিভুবনে অস্তিত্ব ছিল না অন্য দেবতার, একমাত্র রাজমান ছিলেন শঙ্কর—

যিনি অ-জাত, অজর, অমরগুরু, অসুরপুর-রিপু,
যিনি অপরিমিত গণপতি, যিনি হিমাচলনন্দিনীর স্বামী,
যাঁর চরণকমলে মুগ্ধ হয়ে লুণ্ঠিত হয় বিশ্বনিখিলের প্রণাম।

প্রভুকেই অনুসরণ করে অনুজীবিদেরও প্রকৃতি। তাই স্থান্বীশ্বরের ঘরে ঘরে চলত খণ্ডপরশুর পূজা।

এই গৌরবময় পুণ্যদেশে
বাতাস বইত—
বিল্ববৃক্ষ থেকে বহন ক'রে নিয়ে পল্লবের মাল্য,
দিকে দিকে আকীর্ণ ক'রে দিয়ে স্নান-দুগ্ধের শীকর,
হোমের আলবাল থেকে অঙ্গে মেখে নিয়ে বহল-গুগ্‌গুলের সুরভি।

পুরবাসীরা, চরণসেবকেরা, মন্ত্রীদের দল, এমন কি করদরাজ্যের মহাসামন্তেরা যখন ভেট পাঠাতেন রাজ-শ্রীচরণে তখন সেগুলির মধ্যে শিবপূজার সমুচিত উপকরণই থাকত অধিক।

সন্ধ্যাপূজার বৃষ আসত—
মহাপ্রমাণ, কৈলাসশিখরের মত শুভ্র, শৃঙ্গকোটি সোনার পত্রলতা দিয়ে বাঁধানো,
আসত সৌবর্ণ স্নানকলস, অর্দ্ধভাজন, ধূপপাত্র,
আসত পুষ্পের উত্তরীয়,

আসত মণিযষ্টি প্রদীপ, ব্রহ্মসূত্র,
আসত মহামূল্য মাণিক্যখচিত মুখকোষ।
পুষ্পভূতির মন ভ'রে উঠত আনন্দে।
রাজার অভিলাষের অনুবর্ত্তন করতেন অন্তঃপুরচারিণী রাজবধূরাও।
পূজার জন্য তাঁরা
তণ্ডুল কুটতে দ্বিধা করতেন না,
লোহিততর করতেন নিজেদের করকিসলয়—দেবগৃহের উপলেপনে,
ফুলের মালা গাঁথতে ব্যস্ত হয়ে উঠত সমস্ত পরিবার।

এমন সময় একদা পরম-মাহেশ্বর পুষ্পভূতির কানে পৌঁছল মহাশৈব ভৈরবাচার্য্যের নাম।
শুনলেন— তিনি দ্বিতীয় কপর্দী, সাক্ষাৎ দক্ষযজ্ঞ-মথনকারী ধূর্জ্জটি,
শুনলেন— দাক্ষিণাত্যে তাঁর জন্ম,—অসংখ্য শিষ্যের মত অন্তহীন জ্ঞানের গৌরবে তিনি ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন মানুষের জগৎ।
যাদের সম্বাদি হয় স্বভাব—তাদের হৃদয়, না দেখা হ'লেও, একে অন্যকে টানে।
ভৈরবাচার্য্যের নাম-শ্রবণের পর থেকেই সেই জন্যে রাজার হৃদয় আবদ্ধ হয়ে গেল ভক্তিসূত্রে, দূরগত আচার্য্যপাদের সঙ্গে।
সর্ব্বদাই মনে হ'ত, তাঁর দর্শন পেলে ভাল হয়।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; অস্তাচলকে চুম্বন করেছে সাবিত্রী দ্যুতি; অন্তঃপুরে রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল প্রতিহারী। নিবেদন করলে—
"দেব, দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন জনৈক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। তিনি আপনাকে বলতে বললেন ভৈরবাচার্য্যের আদেশমত তিনি মহারাজের নিকট এসেছেন।"
শ্রবণমাত্রেই রাজা সাদরে বললেন, "কোথায় তিনি? এখানেই নিয়ে এস তাঁকে।"
রাজার সম্মুখে প্রতিহারী প্রবেশ করাল মস্করীকে অচিরে।
প্রাংশুদেহ, আজানুলম্বিত বাহু;

ভৈক্ষ-ক্ষাম হ'লেও স্থূলাস্থি ব'লে মস্করীর অবয়বগুলি পুষ্ঠ দেখাচ্ছিল। মাথাটি বেশ বড়; উন্নত কপাল, কিন্তু বলিভঙ্গে বন্ধুর; ক্ষুদ্র দুটি গণ্ডকূপ,—নির্মাংস। গোল গোল চোখ, মধুবিন্দুর মত পিঙ্গল। নাকটি কিছু বাঁকা; একটি কান কর্ণপাশের ভারে বেশ ঝুলে পড়েছে; দন্তপংক্তি অলাবুবীজের মত বড় বড় এবং উন্নত; ঠোঁটের কাছে একটু ঘোটক-ঘোটক ভাব, লম্বা চিবুকে বিস্তৃতির আভাস; অংসটিকে অবলম্বন ক'রে আছে বৈকক্ষকের রচনার মত কাষায়বরণ যোগপট্টক; খণ্ডীকৃত বাসনার মত ধাতুরসে রাঙানো একখানি শতছিন্ন উত্তরীয় বক্ষের মাঝখানে গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা।

কাঁধের উপর যে যোগভারকটি ছিল সেটিকে মস্করী বাম করে ধারণ ক'রে ছিল; সেই যোগভারকটি নিশ্চলমূল রোমরজ্জু দিয়ে দৃঢ় ক'রে বাঁধা; কৌপীনসনাথশিখর যোগভারকটির মধ্যে রক্ষিত ছিল বাঁশের ছালের তৈরি মাটিছাঁকা একটি চালুনী, খেজুরপাতার পেটির গর্ভে একটি ছোট্ট ভিক্ষা-কপাল, তিনখানি দারু-ফলকের মধ্যে ত্রিকোণ ত্রিযষ্টিনিবিষ্ট কমণ্ডলু, স্থূল সুতা দিয়ে বাঁধা পুস্তিকার সঞ্চয়। বাইরে ঝুলছিল এক জোড়া পাদুকা। মস্করীর দক্ষিণ হস্তে একখানি বেত্রাসন।

মস্করী নিকটে এলে অনুগ্রহ দেখিয়ে ক্ষিতিপতি তাঁকে বসতে বললেন, পরে প্রশ্ন করলেন, "ভৈরবাচার্য্য এখন কোথায়?"

নরপতির সাদর জিজ্ঞাসায় হৃষ্ট হয়ে পরিব্রাজক উত্তর দিলেন, "ভৈরবাচার্য্য নগরের উপকণ্ঠে সরস্বতী নদীর তটকাননে শূন্যায়তনে বিরাজ করছেন।" আরও জানালেন, "ভগবান ভৈরবাচার্য্য আশীর্বাণীর মাধুরীতে অর্চ্চনা করেছেন মহাভাগকে।" এই ব'লে যোগভারক মুক্ত ক'রে মহারাজের সম্মুখে রেখে দিলেন ভৈরবাচার্য্য-প্রেরিত রত্নখচিত আলোকিত-অন্তঃপুর পাঁচটি রাজত পুণ্ডরীক।

মহারাজ বিপদে পড়লেন।

ভৈরবাচার্য্য তাঁর প্রিয়জন। সহজ নয়, প্রত্যাখান করা প্রণয়। দাক্ষিণ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে,—গ্রহণ করা উচিত; আবার গ্রহণ করলে লঘুতা প্রকাশ পায়,—সুতরাং দোলায়মান চিত্ত নিয়ে কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। অবশেষে অতিসৌজন্যের পরতন্ত্র হয়ে মহারাজ গ্রহণ করলেন

উপহার। বললেন, "সর্ব্বফল-দাত্রী শৈবী ভক্তিই মনোরথ-দুর্লভ ফল ফলিয়ে দেয়। তা না হ'লে আমাদের মত মানুষের উপর কেন প্রীতির নির্ঝর ঝরাবেন ভুবনগুরু ভগবান্ ভৈরবাচার্য্য? আশা করি, আগামীকাল তাঁর সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময় হবে।"

এই ব'লে বিদায় দিলেন মস্করীকে।

ভৈরবাচার্য্যের সামীপ্যের ইঙ্গিত তাঁর হৃদয়টিকে যেন জড়িয়ে দিয়ে গেল সূক্ষ্ম আনন্দের স্বর্ণ জালিকায়।

পরের দিন প্রভাতেই অশ্বারোহণ ক'রে আচার্য্যদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন মহারাজ। আড়ম্বর নেই।

কেবল মাথার উপর দুলে উঠছে শ্বেত দুটি চামর,
রৌদ্রবারণ করছে শুভ্র একটি ছত্র,
সঙ্গে কয়েকটি রাজার কুমার।

চাঁদ যেন বেরিয়ে পড়লেন সূর্য্যকে দেখতে।

আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হতেই মহারাজ দেখতে পেলেন জনৈক শিষ্য তাঁদের দিকেই আসছেন।

মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আচার্য্যদেব কোথায় আছেন?"

"জীর্ণমাতৃগৃহের উত্তরে বিল্ববাটিকায় তিনি বিরাজ করছেন।"

কথা শুনে সেই দিকে চ'লে গেলেন এবং অশ্ব থেকে অবতরণ ক'রে প্রবেশ করলেন বিল্ববাটিকায়।

ভৈরবাচার্য্য তখন অগণিত কার্পটিকবৃন্দের মধ্যে ভস্মরেখাবলয়িত হরিৎ গোময়লিপ্ত ক্ষিতিবিস্তীর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাসীন ছিলেন, মহীয়ান্। প্রাতঃকালেই সমাপ্ত হয়ে গেছে তাঁর স্নান। সাঙ্গ হয়ে গেছে অষ্টপুষ্পিকার অর্ঘ্যদান, অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে অগ্নিকার্য্য।

অঙ্গে ছিল একখানি কৃষ্ণকম্বলের প্রাবরণ; অসুরবিবরে যদি প্রবেশ করতে হয়, এই আশঙ্কায়, আচার্য্যদেব যেন অভ্যাস ক'রে নিচ্ছিলেন পাতালের অন্ধকারাবাস।

উন্মেষশালী বিদ্যুৎকপিলবর্ণ আত্মতেজে তিনি যেন লেপন ক'রে দিচ্ছিলেন শিষ্যলোক ;—আহা, সেই তেজ,—সে তেজ যেন মহামাংস-বিক্রয়ক্রীত মনঃশিলার পঙ্ক।

মাথার কয়েকগাছি চুলে পাক ধরেছে।

বয়স পঞ্চান্ন পার ;

ঊর্দ্ধবদ্ধ শিখাপাশের একদিকে জট পাকিয়ে ছিল রুদ্রাক্ষ আর শঙ্খের ছোট-ছোট গুটি ; মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত দেখা দিয়েছে, ক্ষীণ হয়ে আসছে ললাট-শেষের কেশগুলি। কর্ণের শষ্কুলী-প্রদেশ লোমশ। ললাট বিরাট। আধখানা মাথার চারদিকে বারম্বার পোড়ানো হচ্ছিল গুগ্‌গুল, উঠছিল উগ্র সুরভি ; এবং কপালের তিরশ্চীন ভস্মপুণ্ড্রকগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দগ্ধ-গুগ্‌গুলের তাপ কপালাস্থি ভেদ ক'রে ফুটে উঠেছে। ললাটের সহজ বলিভঙ্গে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে ভ্রূমধ্যের কূর্চভাগ।

চোখের কণীনিকা কাঁচ-কাচর,

অপাঙ্গ রক্তবর্ণ, নয়ন-মধ্যটি শুভ্রবরণ,—ইন্দ্রধনু ব'লে মনে হচ্ছিল দীর্ঘ লোচনের অংশু-প্রতান। আর সেই নয়ন থেকে দিকে দিকে যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল শ্বেত-পীত-লোহিত পতাকাবলী-বিচিত্র শিব-বলির সম্ভার।

তাঁর নাসা ছিল গরুড় পক্ষীর চঞ্চুকোটির মত কুব্জ।

ঠোঁটের পাশ দুটি কপোলতল বিদীর্ণ করেছিল ; গণ্ড দুটিকে দেখাচ্ছিল সংক্ষিপ্ত। তাঁর উন্নত দন্তের সুন্দর দিক্‌শুভ্রায়তী শোভা! ভৈরবাচার্য্যের হৃদয়ের মধ্যে নিত্যবাস করেন যে হরমৌলী চন্দ্র—তাঁরই জ্যোৎস্না যেন ধরা দিয়েছে দশনজ্যোতিতে।

একটু নেমে এসেছিল ওষ্ঠতট,—বুঝি জিহ্বাগ্র-স্থিত সমগ্র শৈব-সংহিতার অতিভারে।

কানের পাতায় দুলছিল স্ফটিকের দুটি কুণ্ডল ;—যেন শুক্রাচার্য্য এবং বৃহস্পতি শ্রদ্ধাভরে শিখতে এসেছেন সুরাসুরের বিজয়-বিদ্যাসিদ্ধি।

মহারাজ পুষ্পভূতির মনে হ'ল, তিনি যেন নয়নসম্মুখে আবির্ভূত দেখতে পেলেন ভূতভাবন ভগবান বিরূপাক্ষকে।

এ তো ভৈরবাচার্য্য নয়! এ যেন-

ধর্ম্মের ধাম, শীলের শালা,
তথ্যের তীর্থ, ক্ষমার ক্ষেত্র,
কল্যাণের কোশ, শালীনতার শালেয়,
পাবিত্র্যের পত্তন, স্থিতির স্থান।

মহারাজের সমাদর ও প্রণয়ী মন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে লাগল ভৈরবাচার্য্যকে।

তাঁর বামপ্রকোষ্ঠে ছিল নানান ওষধি ও মন্ত্রসূত্রের পংক্তি-বন্ধন; একখানি লৌহবলয়, এবং ভক্তির ভূষণসম একটি খণ্ড-শঙ্খ;—দক্ষযজ্ঞের পুষণের যে দণ্ডটিকে ভেঙে দিয়েছিলেন ভগবান বীরভদ্র সেই দণ্ডেরই যেন শঙ্খকল্পনা। দক্ষিণ করে ঘোরাচ্ছিলেন রুদ্রাক্ষের মাল্য;—অখিল রসকূপের রস তোলবার যেন ঘটীযন্ত্রমালা। বক্ষের উপরে দুলছিল ঈষৎপিঙ্গল শ্মশ্রু-অন্তর্গত রজোরাশির সম্মার্জ্জনী; বক্ষের মধ্যদেশ নিবিড় কৃষ্ণলোমে আবৃত,—যেন ধ্যানলব্ধ জ্যোতিতে দগ্ধ হয়ে গেছে তাঁর হৃদয়দেশ। প্রশিথিল বলির বলয়-পরা তাঁর তুন্দ।

শুভ্র ক্ষৌমবাসে উপচীয়মান স্ফিঙ্মাংসপিণ্ড ও কৌপীনটিকে আবৃত ক'রে দৃঢ়-পর্য্যঙ্ক-বন্ধ আসনে তিনি আসীন ছিলেন। চরণযুগলে তামরসের তারুণ্য! নখময়ূখে নির্ম্মলতা!

চরণসমীপে স্থাপিত ছিল—ধৌত পাদুকা;—যেন ভাগীরথী-তীর্থযাত্রার পরিচয় পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছে হংসমিথুন। এবং পার্শ্বে রক্ষিত ছিল বৈণব বিশাখিকাদণ্ড-দণ্ডের মাথায়, বাঁকানো এক ফালি লৌহকণ্টক;—সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধির বিঘ্ন-বিনায়ক গণেশের যেন ত্রাসাঙ্কুশ।

অল্পভাষীরা বেশী হাসে না কিন্তু তিনি হাসছিলেন; কুমার ব্রহ্মচারী হ'লে হবে কি, তিনি গৃহস্থের মত সকলের উপকারে ব্রত ছিলেন।

অতিতপস্বী তবুও মহামনস্বী,
কৃশক্রোধী অথচ আদরে অকৃশ।

তিনি যেন একখানি অদীন প্রকৃতিপ্রসন্ন মহানগর,

কল্পতরু-পল্লব-সুকুমার মেরু;
পশুপতি-চরণরেণু-পবিত্রিত-মৌলী কৈলাস,
মাহেশ্বর-গণানুগম্য শিবলোক,
পুণ্যতীর্থশুচি জাহ্নবীর প্রবাহ।

মহারাজ পুষ্পভূতি দেখতে পেলেন,—
ধৈর্য্যের একখানি আধার, করুণার একখানি খনি, কৌতুকের একখানি নিকেতন, রমণীয়তার একটি আরাম। দেখতে পেলেন প্রসাদের প্রাসাদ, গৌরবের আগার, সৌজন্যের সমাজ।
মহারাজ দেখতে পেলেন ভৈরবাচার্য্যকে।

দূর থেকে রাজাকে দেখে ভৈরবাচার্য্যও চঞ্চল হয়ে উঠলেন,
চাঁদকে দেখে যেমন চঞ্চল হয় সমুদ্র।
প্রথমেই শিষ্যেরা উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন আচার্য্যদেবও গাত্রোত্থান ক'রে রাজার দিকে এগিয়ে গেলেন।
শ্রীফলের উপহার দিয়ে জাহ্নবীধারার মত গম্ভীরধ্বনি বাণীতে উচ্চারণ করলেন স্বস্তিশব্দ।

নরপতিরও প্রীতিবিস্তার্য্যমাণ দু-নয়নের শুভ্রতা অজস্র পুণ্ডরীকবনের সৃষ্টি ক'রে প্রত্যর্পণ করল উপহার।
দূর থেকে অবনত হয়ে অভিনব প্রণাম করলেন মহারাজ।
ললাটপট্ট-পর্য্যন্ত দুলে উঠল শিখামণি; মহেশ্বরের প্রসন্নতার মত তৃতীয় নয়নের কল্পনা-রচনা ক'রে উচ্ছল হ'ল শিখামণির ঊর্দ্ধগামী কিরণ; এবং ভূমিতলে আবর্জ্জিত হয়ে পড়ল কর্ণ-খসা দুটি পল্লব। শিবসেবায় উন্মূলিত শিথিল পাপ-কণার মত সেই কর্ণপল্লব থেকে উড়ে পালাল মধুকর।

"এস, এইখানে ব'স"—এই ব'লে আচার্য্যও আত্মীয় শার্দ্দূল-চর্ম্মখানি দেখিয়ে দিলেন।
প্রশ্রয়ের সৌভাগ্যলাভ ক'রে রাজা তখন বললেন—

"ভগবন্, অন্য নৃপদের স্খলনের কথা চিন্তা ক'রে আমাকে খল ভাববেন না। গুরুদেব যে আমার উপর এইরকম আচরণ করছেন—এর জন্য নিশ্চয়ই দায়ী আমার দুষ্টা লক্ষ্মীর শীলাপরাধ কিম্বা রাজঐশ্বর্য্যের দৌরাত্ম্য। এই উপচারের আমি নিজেকে আধার ব'লে বিবেচনা করি না। যন্ত্রণা দেবেন না আমাকে। দূরে থাকলেও আমি আপনার মনোরথ-শিষ্য। গুরুর আসনখানিও গুরুর মতই

মাননীয়, তাকে লঙ্ঘন করা আমার উচিত নয়। আপনারা সকলে এইখানে বসুন।"

এই কথা ব'লে পরিজনেরা যে বসনখানি নিয়ে এসেছিল সেইখানি বিস্তারিত ক'রে তারই উপর ব'সে পড়লেন মহারাজ। ভৈরবাচার্য্যও মহারাজের বাক্যে প্রীত হয়ে রাজার কথামতই পূর্ব্ববৎ উপবেশন করলেন ব্যাঘ্রাজিনে।

পরিজন ও শিষ্যজনেরা সরাজক সমাসীন হ'লে প্রথা-মত ফুলফলের অর্ঘ্য দেওয়া হ'ল সকলকে।

কথাবার্ত্তায় অগ্রসর হয়ে যেতে লাগল সময়।

নৃপমাধুর্য্যে হৃতান্তঃকরণ হয়ে অবশেষে ভৈরবাচার্য্য,—সাক্ষাৎ শিবভক্তির মত দশনদীধিতিতে চন্দ্রিকার বিমলতা প্রস্ফুরিত করতে করতে বললেন—

"তাত, তোমার অতিনম্রতার ভাষা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে তোমার অন্তর্নিলীন গুণ-গৌরব। নিখিল বৈভবের তুমি অধিকারী। বৈভবের অনুরূপ তোমার প্রতিপত্তি। জন্ম থেকেই আমি নিঃস্ব; কিন্তু কাঙাল নই ধনের। ধনৈশ্বর্য্যকে আমি মনে করি জ্বলন্ত আগুনের মত,—যার জ্বলন্ত ইন্ধন হচ্ছে নিখিলের দোষ-কলঙ্ক। তার কাছে অবিক্রীত রয়েছে আমার এই কুৎসিত শরীর। ভিক্ষার চাল শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে আমার প্রাণটিকে। আমি পেয়েছি, অনেক কষ্ট ক'রে বিদ্যার কয়েকটি অক্ষর। ভগবান শিবভট্টারকের পদ-সেবার অনুগ্রহে পুণ্যের কয়েকটি কণিকা আমার ঘাটে এসে ঠেকেছে। আমার মধ্যে যদি কিছু গ্রহণযোগ্য থাকে, নিও। রসিকদের গুণগ্রাহী মন সরু-সুতোয়-গাঁথা ফুলের মতন। আর সজ্জনদের কথা হচ্ছে বিদ্বৎসম্মত সাধু-শব্দের মত,—শ্রূয়মাণ হ'লেই, সুধীর হৃদয়ের কাছে ব'য়ে নিয়ে আসে যশের সৌরভ। কুতূহলের বিবরের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল আমার মন, এমন সময়, হে রাজন্, তোমার মঙ্গলময় গুণগ্রামের শুভ্রতা ফেন-ধবল স্রোতের মত আমাকে এখানে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে।"

রাজা প্রত্যুত্তরে বললেন—

"জানি, রাজাদের আকর্ষণ থাকে শরীরাদি ঐশ্বর্য্যের উপর; আবার তাঁরাই হন সাধুদের প্রণয়ী; আপনার দর্শনেই আমার উপার্জ্জন হয়ে গেল অপরিমিত

কুশল। আমাকে দেখবার জন্যে আমার রাজত্বে যে আপনি এসেছেন সেই আগমনেই—আপনি আমার গুরু,—আমাকে উন্নীত করেছেন স্পৃহণীয় পদে।"
ইত্যাদি বিবিধ কথায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত ক'রে ভৈরবাচার্য্যের নিকট বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন রাজা পুষ্পভূতি।

তারপর একদিন ভৈরবাচার্য্য দেখতে এলেন রাজাকে। তাঁর কাছে সান্তঃপুর সপরিজন স-কোষ এবং নিজ-সত্ত্বাকে নিবেদন ক'রে দিলেন রাজা। মৃদু হাস্যে সম্বর্দ্ধিত ক'রে ভৈরবাচার্য্য তখন বললেন, "তাত, কোথায় বৈভব, আর কোথায় এক অরণ্যলালিত আচার্য্য! মনস্বিতা!—লতার মত;—মুদ্রার তাপে ম্লান হয়ে যায়। খদ্যোতের মত সামান্য দীপ্তি উপতাপ দেয় না। তোমাদের মত মানুষই হচ্ছে সম্ভূতির পাত্র।"
ইত্যাদি উপদেশবাণীতে কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে বিদায় নিলেন ভৈরবাচার্য্য।

প্রথম দিনে রাজা পুষ্পভূতির কাছে যে পরিব্রাট্ এসেছিল, সেই পরিব্রাট্ কিন্তু ক্রমাগত পাঁচটি পাঁচটি ক'রে রাজত পুণ্ডরীক প্রতিদিন উপহার দিত রাজাকে। একদা কিন্তু সে এল, শ্বেতকর্পটের নীচে, কিছু-একটি ঢেকে। রাজার সম্মুখে উপবেশন ক'রে বললে, "মহাভাগ, ভগবান আচার্য্যদেব আপনাকে বলেছেন, 'আমার একটি ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে, তার নাম পাতালস্বামী। এক ব্রহ্মরাক্ষসের হাত থেকে সে হরণ করেছে এই মহান্ অসি,—এর নাম 'অট্টহাস'। এটি তোমারই ভুজের যোগ্য। গ্রহণ কর।' এই ব'লে পরিব্রাট্ কর্পটের গোপনতা থেকে মুক্ত ক'রে রাজার সামনে রেখে দিল—শরৎগগনের পুঞ্জীভূত মহিমার মত নীল একটি কৃপাণ।
সেই কৃপাণ—

> স্তম্ভিতজল যেন কালিন্দীর প্রবাহ; নন্দক-তরবারির জিগীষায় যেন কৃপাণরূপ ধারণ করেছে কৃষ্ণকোপিত কালিয়নাগ; হিংসার যেন আস্তভরা হাস্য।

কৃপাণটিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল রাজ-চক্ষু;—

> কালকূটের নীলবিষ দিয়ে কি এই প্রাণহরণ কৃপাণ নির্ম্মিত?

কৃতান্তকোপাগ্নিতপ্ত অয়স দিয়ে কি ঘটিত ?

এত তীক্ষ্ণ, যে পবনস্পর্শে ক্রোধে যেন কণ্‌কণ্‌ ক'রে বাজছে।

সভার মণিকুট্টিমে প্রতিবিম্ব পড়েছিল কৃপাণের, মনে হ'ল, নিজেকেও যেন সে দুভাগ ক'রে কাটছে। করাল ধারায় কাঁপছে কিরণ,—যেন শত্রুর মাথায় চুল। তরল বিদ্যুতের মত দীপ্তি বারম্বার জর্জ্জরিত করতে লাগল রৌদ্রকে।

এ কৃপাণ যে-সে কৃপাণ নয়;

এ যেন—কালরাত্রির কটাক্ষ, কালের কর্ণোৎপল, ক্রৌর্য্যের ওঙ্কার, অহঙ্কারের অলঙ্কার।

এ যেন,—মৃত্যুর অপত্য, দর্পের দেহ, সাহসের সুসহায়, লক্ষ্মীর ঘরে-আসার এবং কীর্ত্তির বাইরে-যাওয়ার পথ!

রাজা পুষ্পভূতি অনেকক্ষণ ধ'রে অট্টহাস কৃপাণটিকে দেখলেন। প্রীতিভরে কৃপাণটিকে হাতে নিয়ে প্রতিমা-নিভ সেই অস্ত্রটিকে আলিঙ্গন করলেন। তারপরে আদেশ দিলেন "ভগবান ভৈরবাচার্য্যকে বলবেন—পরদ্রব্যগ্রহণ করতে অবজ্ঞা-দুর্বিদগ্ধ আমার মন, কিন্তু আপনি যখন এটিকে পাঠিয়েছেন তখন বচন-ব্যতিক্রম ব্যভিচার আচরণ করতে অশক্ত হ'ল আমার মন।"

পরিব্রাট্‌ সন্তুষ্টচিত্তে "আপনার কল্যাণ হোক। আমি এখন বিদায়-প্রার্থী।"—এই ব'লে প্রস্থান করল।

এবং বীররসানুরাগী নৃপতি,—কৃপাণটিকে হাতে ধ'রে মনে করতে লাগলেন—করতলগ্রাহ্যা হয়েছে মেদিনী।

কিছু দিন অতীত হয়ে গেছে। একদা ভৈরবাচার্য্য উপস্থিত হলেন রাজার একান্তে। সোপগ্রহ বললেন—

"তাত, ভব্যদের প্রকৃতি হচ্ছে,—স্বার্থ-বিষয়ে অলস এবং পরোপকার-বিষয়ে দক্ষ। তোমার মত মানুষের কাছে প্রার্থীদর্শন,—মহোৎসব; প্রণয়,—আরাধনা; এবং অর্থগ্রহণ—অন্যের উপকার করা মাত্র। তোমার মত ক্ষমায়-ভরা মানুষের উপর দিয়েই বিশ্ব-মনের রথ চ'লে যায়। সেই জন্যেই তোমার কাছে আমার এই বলা। শোন। মহাশ্মশানে ব'সে 'মহাকালহৃদয়'-মহামন্ত্রের এক কোটি

জপ আমি করেছি; কৃষ্ণমাল্য, কৃষ্ণবস্ত্রানুলেপনের শাস্ত্রসম্মত চর্চ্চা ক'রে আরাধনা করেছি ভগবান ধূর্জ্জটির। আমার সিদ্ধির অবসান হবে বেতাল-সাধনায়। সহায় না থাকলে সে সিদ্ধি দুষ্প্রাপ্য। এই কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার। ঐ যে মস্করী যে তোমার নিকটে রাজত পুণ্ডরীকের উপহার নিয়ে আসত—তার নাম 'টীটিভ'—আমার বাল্যবন্ধু, সে একজন সহায়াস্ত্র। দ্বিতীয়ের নাম 'পাতালস্বামী'। তৃতীয়টি আমার শিষ্য, 'কর্ণতাল' তার নাম, সে দ্রাবিড়ী। যদি ভাল বিবেচনা কর, তা হ'লে আশা করি তোমার ঐ গৃহীতাট্টহাস দীর্ঘবাহু একদা নিশায় দিঙ্মুখের অর্গল হয়ে আমার সাধনার সিদ্ধ-সহায় হবে।"

আচার্য্যের কথা শুনে রাজার মনে হ'ল, তিনি যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন, উপকার করবার একটা অবকাশ পেয়ে গেলেন। প্রসন্নচিত্তে বললেন, "ভগবন্, আপনি যে আমাকে শিষ্যজনসামান্য নির্দ্দেশ দিয়ে গ্রহণ করেছেন, এতে আমি নিজেকে বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করছি।"

নরেন্দ্রের ব্যাহৃতি শুনে ভৈরবাচার্য্যের আনন্দ আর ধরে না।

সঙ্কেত জ্ঞাপন ক'রে শেষে বললেন, "আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রিতে অমুক সময়ে অমুক মহাশ্মশানের সমীপভাজি শূন্যায়তনে শস্ত্রদ্বিতীয় হয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রো।"

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটি দিন।

মহাকালের দ্বারে অতিথি হয়ে এল কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-তিথি। নিয়ম পালন ক'রে রইলেন শৈবমন্ত্রে-দীক্ষিত ক্ষিতিপতি। অধিবাস-সংস্কার সম্পন্ন ক'রে গন্ধধূপমাল্য দিয়ে পূজা করলেন খড়্গ অট্টহাসের।

ক্রমে পরিণত হয়ে এল দিন।

কী যেন এক কর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্যে, কে যেন এক রক্তের অর্ঘ্যবিধান ক'রে লোহিতায়মান ক'রে দিয়ে গেল দিক্‌গুলিকে, এবং সূর্য্যের দীর্ঘ কিরণগুলিকে দেখাল রুধিরবলি-লম্পট বেতালদের যেন লোল-জিহ্বা।

গাছের ছায়াগুলি ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল প্রেতিনীদের মত,
পাতালবাসী দানবদের বিঘ্নবিপত্তির মত উঠতে লাগল অন্ধকারের চাপ,
এবং রৌদ্র-কর্ম্ম দেখবার লোভে আকাশে সমবেত হ'ল নাক্ষত্রিক জনতা।

ক্রমে বিগাঢ় হ'ল শর্ব্বরী, এল সুপ্তজন-নিঃশব্দ নিশীথ।
রাজা পুষ্পভূতি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। অন্তঃপুর-পরিজনদের বঞ্চনা ক'রে, বাম-করে অট্টহাসের ঝক্‌ঝকে মুষ্টি, দক্ষিণ-করে বিকোষ খড়্গ, নগর থেকে একাকী বাহির হয়ে গেলেন ক্ষিতিপতি। পাছে তাঁকে কেউ দেখে ফেলে,—এই ভয়ে তাঁর সমস্ত দেহটিকে যেন গুণ্ঠিত ক'রে রইল খড়্গের নীল দীপ্তির নীলাংশুক; এবং তাঁর পিছনে পিছনে চললেন, অনাদিষ্টা হ'লেও রাজলক্ষ্মী। রাজার পিঠের দিকে ঐ যে দেখা যাচ্ছে সৌরভলগ্ন মধুকরের বেণী—ওরা কি মূর্ত্তিমতী সিদ্ধির কেশাকর্ষণের চিত্রণ?

পথ ধ'রে একাকী চলতে লাগলেন রাজা শূন্যায়তনের দিকে।

পৌঁছে দেখলেন, তিনজন মাল্যধারী পুরুষ তাঁর দিকে আসছে। কি ভয়ঙ্কর বিকট তাদের সজ্জা! তারা যেন সৌপ্তিকপর্ব্বের অশ্বত্থামা, কৃপ এবং কৃতবর্ম্মা। মন্ত্রশিখাবন্ধ বিরচন ক'রে তাদের কুসুমশেখরে সঞ্চরণ করছিল গুঞ্জনমুখর ষট্‌চরণ, এবং উষ্ণীষপরা ললাটের ঠিক মাঝখানটিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল মহামুদ্রাবন্ধের মত স্বস্তিকাগ্রন্থি।

তাদের প্রত্যেকের এক কানে বিমল দন্তপত্র, অন্য কানে রত্নকুণ্ডল। একদিককার কপোলের উপর শুভ্র হয়ে পড়েছিল দন্তপত্রের প্রভা,—দেখে মনে হচ্ছিল, রাক্ষস-বিনাশের জন্য শার্বর অন্ধকারটিকে পান ক'রে ফেলেছে ওদের মুখ; আর অন্যদিককার কপোলের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল রত্নকুণ্ডলের অতিস্বচ্ছ পীতপ্রভা—যেন মন্ত্রশোধিত গোরোচনার অনুলেপন। তাদের হাতে শাণিত খড়্গের উল্লাস।—খড়্গের ধারাজলে প্রতিবিম্ব পড়েছিল নিজেদের আকৃতির;—দেখে মনে হচ্ছিল, নরবলির উপহার দেওয়া হয়েছে খড়্গদের। তিনটি দিক তিনজনকে প্রহরা দিতে হবে—এই উদ্দেশ্যেই যেন তাদের তিনখানি খড়্গ নীলপ্রভার রেখা টেনে ত্রিধা সীমন্তিত ক'রে দিয়েছিল ত্রিযামাকে। অর্দ্ধচন্দ্র এবং রাজত বুদ্‌বুদবিন্দু-অঙ্কিত চামড়ার ঢাল হাতে নিয়ে, নিবিড় নিষ্প্রাবণি কাঞ্চনের শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা, কুক্ষিতে অসিধেনু—যখন টীটিভ কর্ণতাল এবং পাতালস্বামী রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল—তখন মনে হ'ল, যেন নবসৃষ্টি লাভ করেছে নক্ষত্র-চন্দ্র-খচিত নিশা।

রাজা হুঙ্কার দিলেন, "কে, কে তোমরা ?"
তিনজনে তখন উত্তরে জানিয়ে দিল নিজেদের নাম।
সকলে মিলে তখন সাধন-ভূমির দিকে অগ্রসর হলেন।

বলিদীপের আলোকে জর্জ্জরিতা সেই সাধনভূমি,
গুগ্‌গুল ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্না সেই সাধনভূমি,
চারিদিকে-ছড়ানো রক্ষা-সর্ষপের মন্ত্রে অর্দ্ধদগ্ধ-অন্ধকার, পলায়মানা নিশার মত সেই সাধনভূমি,
শব্দহীনা গম্ভীরা ভীষণা সেই সাধনভূমি !

সেই সাধনভূমিতে,—যেখানে উপকল্পিত হয়েছিল সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ, সেখানে রাজা দেখতে পেলেন, কুমুদরেণুর মত শুভ্র ভস্মের রেখা দিয়ে সীমান্ত আঁকা এক বৃহৎ মণ্ডলের মধ্যস্থলে,

পৃথুমণ্ডল-মধ্যমণি শরৎ-সূর্য্যের মত,
মথ্যমান ক্ষীরোদ-সমুদ্রের আবর্ত্তবর্ত্তী-মন্দর পাহাড়ের মত,
বিরাজ করছেন ভগবান্ শ্রীভৈরবাচার্য্য।

আসন নিয়েছেন উত্তান-শয়ন এক শবের বক্ষে; শবের দেহে রক্তচন্দনের অনুলেপন, শবের কণ্ঠে রক্তমাল্যের বিরচন, শবের অঙ্গে রক্তাম্বর ও আভরণ, এবং মুখকুহরে জ্বলদ্‌জ্বালা বহ্নি।
সেই অগ্নিতে ভৈরবাচার্য্য আরম্ভ করেছেন অগ্নিকার্য্য। তাঁর উষ্ণীষখানি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ তাঁর অঙ্গরাগ, হস্তসূত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণ তাঁর অঙ্গবাস।
অগ্নিতে তিনি আহুতি দিচ্ছিলেন কৃষ্ণতিলের। কৃষ্ণতিলের আহুতি প্রদান দেখে রাজার মনে হ'ল যেন বিদ্যাধরত্ব লাভ করবার তৃষ্ণায় মনুষ্য-জন্মের কারণ, অবিদ্যার কলুষিত পরমাণুগুলোকে স্থিরহস্তে ক্ষয় ক'রে দিচ্ছেন ভৈরবাচার্য্য।
আহুতিদানের সময়ে তাঁর হাত থেকে ঠিকরে পড়ছিল নখরের দীপ্তি;—সেই দীপ্তি যেন ধুয়ে দিতে চায় অগ্নির অঙ্গ থেকে প্রেতের মুখস্পর্শ-দোষ।
ধূমলোহিত তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তাহুতি ঢালছিল অগ্নিতে; তাঁর পুণ্যভাস্বর মুখ জপ ক'রে চলেছিল; আধখোলা অধরের ভিতরকার শুভ্র দশনের সে কি সুন্দর শিখর—; মূর্ত্তমন্ত্রের যেন অক্ষরপংক্তি।

হোমের শ্রমেতে তাঁর সমস্ত শরীর ব্যেপে যে ঘর্ম্মবিন্দু জেগেছিল, সেই ঘর্ম্মের বিন্দুতে বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছিল আসন্ন-প্রদীপের বিম্ব ; মনে হচ্ছিল ভৈরবাচার্য্যের সমস্ত শরীর যেন সহস্র সিদ্ধ-শিখায় জ্বলছে।
ব্রহ্মসূত্রধারী ভৈরবাচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হয়ে রাজা নিবেদন করলেন নমস্কার।
এল অভিনন্দন, এল কর্ম্মব্যবস্থা।

পাতালস্বামী অঙ্গীকার করলেন ইন্দ্র-দৈবত পূর্ব্বদিক,
কর্ণতাল—কৌবেরী উত্তর,
টীটিভ—বরুণদৈবত পশ্চিম,
এবং রাজা অলঙ্কৃত করলেন ত্রিশঙ্কু-নক্ষত্র-লাঞ্ছিত দক্ষিণ

এইপ্রকারে অবস্থান ক'রে রয়েছেন দিক্‌পালকেরা এবং বিস্রব্ধচিত্তে ভৈরব-কর্ম্মসাধন ক'রে চলেছেন ভৈরবাচার্য্য, শান্ত হয়ে গেছে নিষ্ফল-প্রযত্ন প্রত্যূহকারী কৌণপদের কোলাহল, অর্দ্ধরাত্রি,
এমন সময়,

মণ্ডলের অনতিদূর উত্তরে অকস্মাৎ দীর্ণ হয়ে গেল ভূমিতল ;—
প্রকট হ'ল বিরাট এক বিবর, প্রলয়-মহাবরাহের দ্রংষ্ট্রা দিয়ে যেন খনিত।
সেই বিবরের মধ্য থেকে সহসা আবির্ভূত হ'ল দিগ্বারণোৎক্ষিপ্ত
আলান-লৌহ-স্তম্ভের মত এক কুবলয়শ্যামল পুরুষ।—
বিকল হয়ে গেল যেন জীবলোকের ইন্দ্রিয়।
এ যেন পাতাল ভেদ ক'রে বলি-দানবের উত্থান।
এ যেন পৃথিবীর গর্ভ চিরে নরকাসুরের নিষ্ক্রমণ।

কী অদ্ভুত এই আবির্ভাব!
মালতী-কুঁড়ির মালা মাথায় প'রে, কুটিলকুন্তলের নীলকান্তির নিবিড়তা নিয়ে, যখন সে এসে দাঁড়াল,—তখন মনে হ'ল শিখরে শিখরে রত্নপ্রদীপজ্বলা একটা ইন্দ্রনীলমণির প্রাসাদ হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বুঝি উঠল।

স্বভাবরক্ত দুটো চোখ। গলায় খেলছে গদ্গদ্ ধ্বনি ;—যেন টলটল করছে যৌবনের মদ। কোমরবন্ধ থেকে মাটি ছুঁয়ে লুটোচ্ছে ব্যায়ামফালী—শুভ্র পটান্ত—মহাসর্প শেষনাগের যেন কল্পনা। কেতকীর গর্ভপত্রের মত পাণ্ডুর চণ্ডাতকের উপর অতিকৃশ তার কুক্ষি। দিঙ্নাগের কুম্ভের মত বিরাট স্কন্ধকূট। মুঠোর মধ্যে মাটি নিয়ে পাকাতে পাকাতে সে এল।

সর্ব্বাঙ্গে ঘনচন্দনের অব্যবস্থা-স্থাসক এঁকে, শরতের শুভ্র মেঘের ভ্রান্তি জাগিয়ে, ছবির মত সে এল।

কী স্থির স্থূল তার উরু !

সে এল—পৃথিবী পাছে ভেঙে যায় এই ভয়ে যেন পদভঙ্গে নিমন্ত্রণ ক'রে মন্থরতা,

সে এসে দাঁড়াল—দর্পের বাহনে চড়িয়ে নির্ভর-গর্ব্ব-বিরাট পাহাড়ের মত একখানি শরীর।

বক্ষ-দ্বিগুণিত বাম বাহুতে, এবং দক্ষিণ জঙ্ঘাকাণ্ডে, বারম্বার তাল-ঠোকার টঙ্কার তুলে, সাধনভূমিতে বিঘ্নের ঝঞ্ঝা জাগিয়ে,—সে এসে দাঁড়াল।

কী তার হাস্য, কী ভয়ঙ্কর তার নৃসিংহগর্জ্জনের মত বাক্যহুঙ্কার !

বললে ঃ—

"ওরে, বিদ্যাধরী-শ্রদ্ধাকামুক, এত তোর বিদ্যার গর্ব্ব হয়েছে ! সহায় লাভ ক'রে এত বেড়ে গেছে তোর মত্ততা যে, আমার মত একজন লোককে বলি-অর্ঘ্য না দিয়েই, ওরে মূঢ়, ওরে বালিশ, তুই সিদ্ধি লাভ করতে চাস ! কোথা থেকে এল তোর এই বিকার-ধরা বুদ্ধি ? এখনও কি জানিস না, তোর কানে কি এখনও পোঁছয় নি যে, এই রাজ্যের নাম আমা থেকেই। শ্রীকণ্ঠজনপদের ক্ষেত্রাধিপতি আমি, শ্রীকণ্ঠ নাগ যার নাম। জানিস না কি যে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গগনে গমনের শক্তি থাকে না গ্রহগণের। ঐ অনাথতপস্বী ঐ ভূতনাথটাকেও, ওরে শৈবাধম, তুই উপকরণ ক'রে নিয়েছিস তোর ব্রতের। সহ্য কর্, এবার তবে সহ্য কর্, তোর ঐ দুষ্ট-নরনাথকে নিয়ে, তোর দুর্ণয়ের ফল।"

বাক্য শেষ হতে না হতেই টীটিভ, কর্ণতাল আর পাতালস্বামী আক্রমণ করল শ্রীকণ্ঠনাগকে।

পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল নিষ্ঠুর প্রকোষ্ঠপ্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে তারা ঢাল, বর্ম্ম এবং কৃপাণ নিয়ে লুটিয়ে প'ড়েছে মাটিতে।

এ রকম কটূনিন্দা রাজা পুষ্পভূতি পূর্ব্বে কখনও শোনেন নি। শস্ত্রহীন এমন আঘাত পূর্ব্বে কখনও ভোগ করেন নি। তাঁর সমস্ত শরীর অঞ্চিত হয়ে গেল ক্রোধের স্বেদবিন্দুতে, যেমন রক্ত জ'মে যায় সমরপীত অসির ধারাজলে। সহস্র সহস্র শরশল্যের মত রোমাঞ্চগুলিকে মুক্ত ক'রে দিয়ে লঘু হয়ে তিনি আস্ফালন করলেন,—যুদ্ধার্থ।

নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব-লাগা অট্টহাস শুভ্রদন্তের স্পষ্টতা দেখিয়ে হেসে উঠল অবজ্ঞায়। কটিবন্ধনীতে বিভ্রান্ত হয়ে, রাজ-নখের কিরণগুলি যেন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিল নাগদমন মন্ত্রবন্ধ। অবজ্ঞার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন নরনাথ।

> "ওরে কাকোদর কাক, রাজহংস যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে লজ্জা হয় না তোর বলি-অর্ঘ্য যাচ্ঞা করতে? থামা তোর পরুষ ভাষা। বীর্য্য বাস করে বাহুতে, বাক্যে নয়। গ্রহণ কর্ অস্ত্র। নিরস্ত্রকে অস্ত্রপ্রহার করতে শেখে নি আমার বাহু।"

উদ্ধততর হ'ল নাগের অনাদর। বললে:—

"আয় তবে, শস্ত্র নিষ্প্রয়োজন। এই দুটো মুঠোর মধ্যে পিষে তোর দর্পকে আমি গুঁড়িয়ে চূর ক'রে দেব।"

মল্লবীর ঠুকতে লাগল তাল।

নরপতিও দূরে রেখে দিলেন চর্ম্মফলক এবং অসি অট্টহাস। শোভা পায় না নিরস্ত্রের উপর সশস্ত্র অভিযান। অধোরুকের উপর কোমর বাঁধলেন বাহুযুদ্ধের জন্যে।

আরম্ভ হ'ল মল্লযুদ্ধ।

> উঠতে লাগল দয়াহীন আস্ফোটনের টঙ্কার;
> দীর্ঘবাহুর রক্ত-শীকরে সিক্ত হ'ল মেদিনী, শিলাস্তম্ভের মত বাহুদণ্ডের আঘাত-নির্ঘোষে শব্দময় হ'ল ভুবন।
> যুদ্ধ হ'ল অনেকক্ষণ।
> শেষে নাগকে ভূতলে পতিত করলেন ভূপতি। গ্রহণ করলেন মুষ্টির মধ্যে কেশ।

শিরচ্ছেদনের উদ্দেশ্যে উল্লসিত হ'ল অট্টহাস।

এমন সময় পুষ্পভূতি দেখতে পেলেন, শ্রীকণ্ঠনাগের বৈকক্ষকমাল্যের মধ্যে চক্‌চক্‌ করছে যজ্ঞীয় উপবীত।

শস্ত্রশাতন সংহৃত ক'রে বললেন—

"দুর্বিনীত, এই উপবীত-বীজ আছে ব'লে নির্ভয়ে নির্ব্বাহ ক'রে চলেছ সহস্র অবিনয়? যাও।"

ঘৃণায় নাগকে পরিত্যাগ করলেন নরনাথ।

এমন সময় কোথাও কিছু নেই, আকাশ ভ'রে হ'ল অতিগাঢ় জ্যোৎস্নার একটি আকস্মিক প্রচার। কোথা থেকে যেন হঠাৎ ভেসে এল এক অতিমিষ্ট গন্ধ, পরিমূঢ় ক'রে দিল ঘ্রাণেন্দ্রিয়, যেন ঐ ফুটে উঠল লক্ষে লক্ষে শরৎকালের কমলবন। তটস্থ হলেন নরনাথ।

ধ্বনি শুনতে পেলেন নূপুরের। কে যেন আসছে, দ্রুত-চরণে আসছে। ধ্বনিটিকে অনুসরণ ক'রে ছুটে গেল রাজার দৃষ্টি।

খড়্গ অট্টহাস্যের মধ্যে রাজা দেখতে পেলেন এক রমণীর রমণীয় আবির্ভাব। নীল জলধরের মধ্যে যেন বিদ্যুতের বিচ্ছুরণ।

কী তাঁর প্রভা!

করপুটে একটি ফুটন্ত রক্তপদ্ম,—এ কি নৈশপদ্ম!

চরণের কোমল অঙ্গুলি থেকে উৎসারিত হচ্ছিল লালিকার সূক্ষ্ম জালিকা; যেন তিনি সমুদ্রের তীর থেকে চরণে জড়িয়ে টেনে আনছিলেন বাল-বিদ্রুমলতার বন।

গুল্‌ফটিকে আবৃত করেছিল নূপুরের রণিত শোভা। বরাঙ্গ ঘিরে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তুলছিল একখানি অতিস্বচ্ছ অংশুক; অনেক-ফুল অনেক-পাখী-আঁকা সেই দেহখানি অংশুকের; দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি পার হয়ে এসেছেন সাগর-সলিল।

সমুদ্র থেকে জন্ম, তাই যেন ভালবেসে ত্রিবলিচ্ছলে তাঁর কটিটিকে জড়িয়ে ধরেছিল ত্রিপথগা ভাগীরথীর ধারা।

অতি উন্নত তাঁর স্তনমণ্ডল,

বক্ষে শরত্তারাগণতার হার,

একটি কর্ণে জ্যোৎস্নাক্ষরা আধো-চাঁদ মণি-ফুল, অন্যটিতে অশোকের কিশলয়, যেন কৌস্তুভমণির কিরণের তোড়া।

সীমন্ত থেকে পদতল চর্চ্চিত, জ্যোৎস্নাশুভ্র চন্দনে।

ধরণীতল চুম্বন করছিল কণ্ঠের পুষ্পমাল্য-সঞ্চয়। ললাটফলকে মাতঙ্গমদময় তিলক।

মৃণালকোমল তাঁর অবয়ব ;—কমলযোনিত্বের যেন অনক্ষর নিবেদন।

সেই রমণীয় দীপ্তির সম্মুখে উচ্চকিত না হয়ে রাজা প্রশ্ন করলেন—

"ভদ্রে, আপনি কে ? আমার নেত্রপথে হঠাৎ এ কোন আবির্ভাব ?"

স্ত্রীজনবিরুদ্ধ একখানি গরব, রাজাকে যেন অভিভূত ক'রে উত্তর দিল—

"হে বীর, আমাকে জেনো,

জেনো, নারায়ণ-হৃদয়লীলাবিহার-হরিণী ব'লে,
পৃথুভগীরথাদি রাজবংশের পতাকা ব'লে,
বীরদের ভুজজয়স্তম্ভের বিলাস-শালভঞ্জিকা ব'লে

আমি রণরুধিরতরঙ্গিণীর রাজহংসী,

আমি শুভ্ররাজছত্রের ময়ূরী,

আমি অস্ত্রারণ্যের বিলাস-সিংহিনী,
খড়্গ-ধারাজলের পদ্মিনী,

আমি শ্রী।

তোমার শৌর্য্যরসে আমি আকৃষ্ট হয়ে এসেছি বর চাও। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে।"

বীরদের মধ্যে কিন্তু দেখা যায়—পরোপকার বিষয়ে পুনরুক্তিদোষশূন্যতা। রাজা তাই তাঁকে প্রণাম ক'রে স্বার্থবিমুখ বর চাইলেন—ভৈরবাচার্য্যের সিদ্ধি। প্রীততর হ'ল লক্ষ্মীর হৃদয়। নয়নের বিস্তীর্ণ মহিমাটি যেন ক্ষীরোদসাগরের শুভ্র জলতল। বরদান করলেন—"তথাস্তু"। অতঃপর আবার জাগল বাণী—

"হে বীর, তোমার প্রাণ আছে, শিবভট্টারকের প্রতি অসাধারণ তোমার ভক্তি। সূর্য্য এবং চন্দ্রমার মত, তুমি হবে পৃথিবীতে অবিচ্ছিন্ন মহান্ তৃতীয় রাজবংশের কর্ত্তা। সেই বংশ প্রতিদিন লাভ করবে উপচীতি। শুচিতায়, সৌভাগ্যে, সত্যে, ত্যাগে এবং ধৈর্য্যে প্রসিদ্ধ হবে, সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বংশ। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করবে হরিশ্চন্দ্রের মত সর্ব্বদ্বীপের ভোক্তা, ত্রিভুবনজয়ের বাসনা নিয়ে দ্বিতীয় মান্ধাতার মত চক্রবর্ত্তী মহারাজ হর্ষদেব। আমার এই হাতখানি পদ্ম পরিত্যাগ ক'রে একদা গ্রহণ করবে তাঁর চামর।"

আশীর্ব্বাদ সম্পূর্ণ হতেই তিরোহিতা হলেন শ্রী।

বাণীপ্রীতি লাভ ক'রে সুখী হলেন রাজা পুষ্পভূতি।

ভৈরবাচার্য্যও নিজের সাধনপুণ্যে এবং লক্ষ্মীদেবীর তথাস্তুবাক্যের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ বিদ্যাধরত্ব লাভ করলেন। হলেন—কুন্তলী, কিরীটি, কুণ্ডলী, হারী, কেয়ূরী, মেখলী, মুদ্গরী এবং খড়্গী।

তিনি বললেন—

"রাজন্, বেশীদূর পর্য্যন্ত ধায় না, ফল্গুচেতস্ অলসদের মনোরথ। কিন্তু সজ্জনের উপকৃতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে না তোমার এই দক্ষিণার প্রসার। এ কেবল তোমাতেই সম্ভব। যারা লঘুচিত্ত তারা সম্পদের একটি কণিকা লাভ ক'রে তুলাদণ্ডের মত উল্লসিত হয়ে ওঠে। তোমার গুণগুলি উপকরণ ক'রে নিয়েছে আমার মুগ্ধ নির্লজ্জ হৃদয়কে, আমার ঘটেছে আত্মলাভ। তোমার স্মৃতিপথে আমি চিরদিন থাকতে চাই; বল, কি এমন সামান্য কাজ আমি তোমার হয়ে করি?"

যারা ধীর তাদের হৃদয়ের রত্নদ্বার ভেদ ক'রে কখনও প্রবেশ করতে পারে না উপকার-ফিরে-পাওয়ার প্রবৃত্তি।

রাজা তাই বললেন—

"আপনার সিদ্ধিতেই আমার সমস্ত পাওয়ার সমাপ্তি হয়ে গেছে। হে মান্য, যথাসমীহিত স্থানে আপনি গমন করুন।"

রাজার কথা শুনে প্রস্থানমানসে উঠে দাঁড়ালেন ভৈরবাচার্য্য। টীটিভাদিকে আলিঙ্গন করলেন সুদৃঢ়। শিশিরভরা কুবলয়বনের মত অশ্রুমান চক্ষু দিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে পুনর্বার রাজাকে বললেন—

"তাত, যদি বলি 'আমি আসি'—সে বলা তোমাদের প্রতি আমার স্নেহের সমতুল্য হবে না ;
যদি বলি, 'এই প্রাণ তোমাদের'—সেটি হবে পুনরুক্তি।
'আমার এই ঘৃণ্য শরীরটাকে গ্রহণ কর'—এ বলায় হবে ব্যতিরেকে অর্থ করা।
'তিল তিল ক'রে আমাকে কিনেছ'—এই যদি বলি, তা হ'লে যে উপকার পেয়েছি তার অনুরূপ কিছুই বলা হবে না।
'তোমরা আমার বান্ধব'—এ রকমের ভাষণের মাঝখানে থেকে যায় ব্যবধান।
'তোমাতেই মগ্ন আমার হৃদয়'—এটি অতিপ্রত্যক্ষ।
'এ তো সিদ্ধি নয়, এ যে বিরহ এনে দিয়েছে তোমার আমার মধ্যে'—এ কথাও অশ্রদ্ধেয়।
'নিষ্কারণ তোমার উপকার'—এটি অনুবাদ।
'তোমরা আমাকে মনে রেখো'—এই বলাতে থাকে আজ্ঞার আদেশ।
তাই আমি বলছি, তোমরা সকলে আমাকে স্থান দিও তোমাদের মনে,—এই স্বার্থনিষ্ঠুর লোকটিকে—যখন কৃতঘ্নদের বিষয় আলোচনা হবে, যখন উঠবে অসজ্জনদের প্রসঙ্গ।"

বাণীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গগনতলে উঠে পড়লেন সিদ্ধ ভৈরবাচার্য্য।
উত্থানবেগে ছিন্ন হয়ে গেল কণ্ঠের মাল্য ; উচ্ছলিত মুক্তাফলের আক্ষেপে আহত হ'ল নক্ষত্রের সমারোহ। গ্রহসঞ্চয়কে সীমন্তিত ক'রে ভৈরবাচার্য্য প্রয়াণ করলেন সিদ্ধজনোচিত ধামে।
শ্রীকণ্ঠ নাগ তখন নিবেদন করলে—

"রাজন্, আপনার পরাক্রম আমাকে ক্রয় করেছে। কী কাজে লাগব, আমাকে অনুগ্রহ ক'রে বলুন। আমাকে আপনি গ্রহণ করিয়েছেন বিনয়।"
রাজার অনুমোদন লাভ ক'রে শ্রীকণ্ঠ পুনর্বার প্রবেশ করল ভূ-বিবরে।

দীর্ঘ রাত্রি তখন অবসন্ন হয়ে এসেছে।

কমলিনীদের ঘুম ভাঙিয়ে,

নিঃশ্বাসে সুরভিত হয়ে,

ধীরে ধীরে বইতে সুরু হয়েছে তুষারলেশী আরণ্যসমীর,

—যামিনী-কামিনীর পরিণতিতে এখন তারা জড়দেহী।

কুমুদিনীদের নয়নে সে বহন ক'রে আনল নিদ্রা,

গন্ধপাগল ভ্রমরদের টানল কাছে, এবং

পরিহাসের হাস্য হেসে বনদেবীদের বুক থেকে সরিয়ে নিল অংশুক।

চক্রবাকমিথুনের বিরহসন্তাপ সহ্য করতে না পেরেই যেন পশ্চিমসমুদ্রে স্নানে নামলেন শর্বরী এবং সাক্ষাৎলক্ষ্মীকে দেখবার কুতূহলে দল মেলে মুখ তুলল পদ্মিনী।

মৃদু হাওয়ায় নেচে উঠল লতা,

কাননে কাননে পাখীরা উঠল জেগে,

পাতার দেহ থেকে পুষ্পবৃষ্টির মত ঝ'রে পড়তে লাগল

তুহিনের কণা, এবং

মুদ্রিত কুমুদের বাসরঘরে বন্দী হয়ে গুঞ্জন করতে লাগল ভ্রমরেরা ;—

আহা, সেই সংহত-গুঞ্জন, যেন পদ্মলক্ষ্মীর প্রবোধ-মঙ্গল শঙ্খধ্বনি।

দেখতে দেখতে আকাশে বইতে লাগল—

উজ্জিহান সূর্য্যাশ্বের প্রোথপবন ;

সেই পবনে, গগনের পশ্চিম কোণে, উৎসারিত হ'ল শর্বরী-লতার ফুল—পুঞ্জীভূত ঐ নক্ষত্রের দল। মন্দর-পাহাড়ের শিখরে আশ্রয় নিয়ে ধূসর হয়ে এল সপ্তর্ষিমণ্ডল,—অঙ্গে মেখে সমীরবিকম্পিত কল্পলতার পুষ্পপরাগ। এবং জ্যোতিঃসমুদ্রে গ'লে গ'লে চ্যুত হয়ে পড়তে লাগল ঐরাবতের অঙ্কুশের মত তারাময় মৃগশীর্ষ নক্ষত্র।

রাজা পুষ্পভূতি তখন বনবাপীতে স্নান করলেন। টীটিভ, কর্ণতাল এবং পাতাল-স্বামী ছিল তাঁর সঙ্গে। নাগযুদ্ধের মলিনতা ধৌত ক'রে শুচিপ্রবেশ করলেন নগরে।

অতঃপর কিছুদিন কেটে গেল। পরিব্রাট্ টীটিভ বারণ মানল না, চ'লে গেল অরণ্যে। কিন্তু রাজার সেবায় র'য়ে গেল পাতালস্বামী, ও কর্ণতাল; তারা শৌর্য্যানুরক্ত।

বৎসরের পর বৎসর যায়। পাতালস্বামী এবং কর্ণতাল ভোগ করে বাসনার অতিরিক্ত বৈভব।

শ্রেষ্ঠবীরদের মধ্যে তাদের খড়্গই উল্লসিত হয়ে উঠত বিজয়ে।
সমরের মুখে তারাই স্থান পেত প্রথম।
আলাপে এবং বিহারে, ও সমাদিষ্ট হ'লে, তারাই ব্যাখ্যান করত ভৈরবাচার্য্যের বিচিত্র চরিত এবং নিজেদের শৈশববৃত্তান্ত।

এই প্রকার কাল-যাপনের মধ্য দিয়ে তারা একদা রাজা পুষ্পভূতির সঙ্গে সঙ্গে সেইস্থানে এসে পৌঁছল—

যেখানে সীমানা হারায় জরা॥

ইতি শ্রীবাণভট্টকৃতে হর্ষচরিতে
রাজদর্শনং নাম তৃতীয় উচ্ছ্বাসঃ॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

যোগং স্বপ্নেঽপি নেচ্ছন্তি কুর্বতে না করগ্রহম্
মহান্তো নামমাত্রেণ ভবন্তি পতয়ো ভুবঃ ॥ ১
সকলমহীভৃৎকম্পকৃদুৎপন্নত এক এব নৃপবংশে
বিপুলেঽপি পৃথুপ্রতিমো দন্ত ইব গণাধিপস্য মুখে ॥ ২

[যাঁরা পৃথ্বীপতি, তাঁরা স্বপ্নেও কামনা করেন না—যোগ;
কর গ্রহণ করেন না,—কখনও বা কারোর;
একমাত্র নামের সৌকর্য্যেই তাঁরা মহীয়ান্ হন,
প্রয়োজন থাকে না অন্য গুণাবলীর। ১
বিপুল হ'লেও এই রাজবংশে পৃথুপ্রতিম একজনই জন্মগ্রহণ করেছিলেন গণাধিপের মুখে যেন একমাত্র দন্ত। নিখিল মহীভৃৎদের তিনি হৃৎকম্প। ২]

তারপর, সেই প্রসিদ্ধ নরপতি পুষ্পভূতির ঔরসে সমুদ্ভব হয় এক রাজবংশের

রাজবংশটি যেন একটি লক্ষ্মীপুরঃসর রত্ন-সঞ্চয়।

ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছায় সেখান থেকে স্বীকার করতেন অর্থ।

রাজাধিরাজ "প্রভাকরবর্দ্ধনে"র জন্ম হয় এই রাজবংশে। তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ নাম ছিল "প্রতাপশীল"।

তিনি ছিলেন হূণ-হরিণদের সিংহ। তাঁকে দেখে জ্বর আসত সিন্ধু-রাজের, ঘুম হারাত গুর্জ্জর; গন্ধহস্তীর মত গান্ধাররাজের তিনি ছিলেন কূট-পাকল জ্বর। তিনিই হরণ করেছিলেন লাটদের সমস্ত পটুতা, দস্যুর মত। কুঠারাঘাত করেছিলেন মালব-লক্ষ্মীর লতায়।

রাজ্যের অঙ্গসঙ্গী হচ্ছে ধন; কিন্তু প্রভাকরবর্দ্ধন তাকে পরিহার করতেন—স্নানের পরে গায়ের ময়লার মত।

তাঁকে লজ্জা দিত,—পরকীয় একখানা জীবনকে কোন রকমে ধারণ-ক'রে-থাকার প্রয়াস; তাঁর মনে হ'ত, এ যেন সংগ্রামের মুখে ভীরু শত্রুর দাঁতে-কুটি-নিয়ে-শরণ-নেওয়ার মত।

হাতের খড়্গে নিজের প্রতিবিম্ব পড়লে তাঁর দুঃখ হ'ত; মনে করতেন, এ আবার কে ভাগ বসাতে এসেছে শৌর্য্যে! কেমন বিসদৃশ ঠেকত শত্রুর সামনে ঐ ধনুকের নমতা। এতবড় মানী! সর্ব্বদা খুঁতখুঁত করত মন। শত্রুর বাণ-দিগ্ধ অন্তরের কারাগারে অবরুদ্ধ রাখতেন নিশ্চলা রাজলক্ষ্মীকে। তাঁর রাজত্বকালেই বসুধাকে বহুবিভক্ত ক'রে, সৈন্য চলাচলের জন্য, দিকে দিকে নির্ম্মিত হয় অগণিত পৃথু পথ। দণ্ডযাত্রার সুগমতার-উদ্দেশ্যে সমতল করা হয়েছিল কত যে তট, অবট, গিরিগহন,—মাটিতে শুইয়ে ফেলা হয়েছিল কত যে তরুতৃণগুল্ম বল্মীকের স্তূপ, তার ইয়ত্তা নেই।

যুদ্ধদোহদ কখনও মিটত না প্রভাকরবর্দ্ধনের। নিখিল শত্রুমণ্ডলীকে উৎসারিত ক'রেও আত্মীয় প্রতাপ তাঁকে নিরন্তর তপ্ত ক'রে রাখত, পরকীয়ের মত। প্রতিসামন্তেরা নিহত হ'লেও তাদের অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে প্রভাকরবর্দ্ধনের প্রতাপ যেন এক পঞ্চমহাভৌতিক মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে ঘুরে বেড়াত ;—

অন্তঃপুরিকাদের হৃদয়ে হৃদয়ে সে মূর্ত্তি যেন বহ্নিময়,
চোখের পাতায় পাতায় যেন জলময়,
দীর্ঘশ্বাসে যেন মরুৎময়,
অঙ্গে অঙ্গে যেন ক্ষমা-(পৃথ্বী)-ময়,
এবং আকাশময় যেন তাদের শূন্যতায় শূন্যতায়।

কী অদ্ভুত বিচিত্র ছিল তাঁর চিন্তার ধারা!
ভেট ব'লে তিনি মনে করতেন শত্রুর স্পর্দ্ধাকে,
বিগ্রহকে তিনি মনে করতেন অনুগ্রহ,
সংগ্রামের সূচনায় উপভোগ করতেন মহোৎসবের আনন্দ;
শত্রুদর্শন তো নয়, যেন নিধিদর্শন!
শত্রুর সংখ্যা বাড়লে তিনি মনে করতেন, যেন উদয় হয়েছে অভ্যুদয়যোগ;
সমরাহ্বান যেন বরদান, হঠ-আক্রমণ যেন সুলক্ষণ, এবং
শস্ত্রের প্রহারপতন যেন বসুধারার রসপ্রবাহ।

এই রাজার রাজত্বে—
এত যজ্ঞযূপের ছিল আয়োজন, যে মনে হ'ত, অঙ্কুরিত হয়েছেন সত্যযুগ;
দিকে দিকে এত ধূম উঠত যজ্ঞের, দেখে মনে হ'ত, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন কলিযুগ;
সুধাচূর্ণ দিয়ে শুভ্রায়িত হ'ত এত দেবালয়, যে মর্ত্ত্যে হ'ত, স্বর্গভ্রম;
দেবালয়ের শিখরে শিখরে উড়ত এত শুভ্রধ্বজ, যে মনে হ'ত, পল্লবিত হয়েছেন ধর্ম্ম;
এত বিরাট বিরাট সভামণ্ডপ, সত্র, প্রপা এবং প্রাগবংশমণ্ডপের সমারোহ ছিল রাজধানীর বাইরে, যে মনে হ'ত, প্রসূত হয়েছে সহস্র সহস্র গ্রাম;
উপকরণে উপকরণে উদ্ভাসিত ছিল এত সৌবর্ণ্য-বৈভব, যে মনে হ'ত, অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে গেছেন মেরু;
এবং এত অসংখ্য ছিল দ্বিজদীয়মান অর্ঘ-কলস, যে মনে হ'ত, ফল ধরেছে ভাগ্যসম্পৎ।

মহান্ ভূভৃৎকুলোদ্ভবা—
মহাদেবী "যশোবতী" ছিলেন প্রভাকরবর্দ্ধনের মহিষী।—তাঁর প্রাণের, প্রণয়ের, বিশ্রম্ভের, ধর্ম্মের এবং সুখের আধারভূমি।—যেন ঃ—

শমেরও শান্তি, বিনয়েরও বিনীতি, আভিজাত্যেরও অভিজাতি, সংযমেরও সংযতি, ধৈর্য্যেরও ধৃতি এবং বিভ্রমেরও বিভ্রান্তি।

তাঁর অগণিত গুণাবলীর কীর্ত্তন করতে কাতর হয়ে পড়ে লেখনী; তবুও বলা যায়,—তাঁর মধ্য দিয়ে যেন,—

বিলাসবাহুল্য দেখতে পেত গোত্রবৃদ্ধি,
স্ত্রীত্ব দেখতে পেত প্রায়শ্চিত্ত-শুদ্ধি,
মকরধ্বজ পেতেন আজ্ঞা-সিদ্ধি,
রূপগ্রহণ করতেন শান্তিবুদ্ধি, এবং
রতিদেবী কল্পনা করতেন সৌভাগ্যবৃদ্ধি।

মোহনতার এই পূর্ণতা, লাবণ্যের এই দৈবসম্পত্তি, অনুরাগের এই বংশোৎপত্তি, কান্তির এই বরপ্রাপ্তি,—এই মহাদেবী যশোবতীর মধুমাধুরীর মধ্য দিয়ে যৌবন যেন পেয়ে গিয়েছিলেন আয়তি এবং সৌন্দর্য্য যেন পৌঁছে গিয়েছিলেন সৃষ্টি-পথের সমাপ্তিতে।

এঁর ছিল শঙ্করের মত স্বামী এবং তাঁর কাছে ইনিও ছিলেন জন্মান্তরের সতী পার্ব্বতী। প্রজাপতির বুদ্ধির মত ইনি ছিলেন সর্ব্বজন-জননী। লৌক-চরিত্র-নির্ণয়ে এঁর ছিল অসামান্য সামুদ্রিক-তত্ত্বজ্ঞান এবং পুণ্যবৃত্তিতে সাক্ষাৎ স্মৃতিগুলি প্রাণ পেত তাঁর বাণীতে।

এঁর গতিচ্ছন্দ মানুষের মনে জাগাত মরালের আবর্ত্ত-বর্ত্তুল রেখা,

এঁর আলাপে ধ্বনিরূপ লাভ করত কোকিলের পঞ্চম,

এঁর পতিপ্রেমের কল্পনা আঁকা রইত চক্রবাকমিথুনের চিত্রে।

বিলাসে বিলাসে মদিরাময়ী,
অর্থের সঞ্চয়ে সঞ্চয়ে নিধিময়ী,
প্রসাদের বণ্টনে বণ্টনে বসুধারাময়ী,
কোষের সংগ্রহে সংগ্রহে কমলময়ী,

ফলদানের দাক্ষিণ্যে দাক্ষিণ্যে পুষ্পময়ী ছিলেন
আমাদের দেবী যশোবতী।

যাঁরা বন্দনা করেন, তাঁদের কাছে ইনি মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যা ;
যাঁরা উষ্মা-উদাসীন, তাঁদের কাছে ইনি চন্দ্রিকার আবির্ভাব ;
যাঁরা সকলকে হাতে ধ'রে আদর করেন, তাঁদের কাছে ইনি যেন হাতে ধরা একখানি দর্পণ ;
যাঁরা তৃষাক্লিশ, তাদের কাছে ইনি যেন অমৃতের নির্ঝরিণী ;
এবং ব্যাপ্তিতে পরামাত্ম-স্বরূপিণী।

অধীনদের কাছে যেন বৃষ্টির দয়া,
সখীদের কাছে যেন শান্তির দান, এবং
গুরুজনের কাছে যেন বেতসী লতা।

নারায়ণের বক্ষে লক্ষ্মীর মত, মহাদেবী যশোবতী বিলীন ছিলেন মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের আনুকূল্যে ;—

ধর্ম্মের হৃদয়-তুষ্টির মত,
বৈদগ্ধ্যের অনভ্র-বৃষ্টির মত,
প্রজাপতির সৌভাগ্যপরমাণু-সৃষ্টির মত।

মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন স্বভাবতঃই ছিলেন আদিত্যভক্ত। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্নান সমাপন ক'রে পরিধান করতেন শুভ্র দুকূল। তারপর শুভ্রকর্পটে শিখরপ্রদেশ আবৃত ক'রে প্রাঙ্মুখ হয়ে, জানু সঙ্কুচিত ক'রে উপবেশন করতেন ক্ষিতিতলে। পাশেই থাকত পবিত্র পদ্মরাগমণির পাত্রীর মধ্যে—নিজের হৃদয়ের মতই সূর্য্যানুরক্ত—রক্তকমলের স্তবক। তারই অর্ঘ্য রচনা ক'রে কুঙ্কুম-পঙ্কানুলিপ্ত মণ্ডলকের অভ্যন্তরে অর্পণ করতেন পূজা। অতি পবিত্র মনে, প্রত্যূষে মধ্যন্দিনে এবং দিনান্তে বারম্বার জপ করতেন জপনীয়,—অপত্যহেতুর অনুকূল—আদিত্য-হৃদয় মন্ত্র।

এই পৃথিবীতে দেখা যায় দেবতাদেরও মনগুলি প্রভাবান্বিত হয় ভক্তজনদের অনুরোধের শালীনতায়। তাই বোধ হয় সূর্য্যভক্ত মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের জীবনে এই রকমের একটি ঘটনার সমন্বয় হয়ে গেল।

তখন গ্রীষ্মকাল। মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন যদৃচ্ছায় জ্যোৎস্নার মত পঙ্খের-কাজ-করা শুভ্র একখানি হর্ম্ম্য-পৃষ্ঠে নিদ্রিত রয়েছেন। পাশেই আর একখানি শয়নীয়ে নিদ্রামগ্না দেবী যশোবতী।

প্রৌঢ়া ক্ষীণা হয়ে এসেছে শ্যামা রজনী। ভোর হয় হয়। ধীরে ধীরে ঝ'রে পড়ছে চন্দ্রের লাবণ্য, শান্ত হয়ে ঢ'লে আসছে তাঁর তেজ। কুমুদিনীর প্রমোদ-জন্মা শশাঙ্ক-স্বেদের মত গ'লে গ'লে প'ড়ে যাচ্ছে অতিশীতল শিশিরের কণা। আর ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে অন্তঃপুরের প্রদীপগুলোর ঘূর্ণ্যমান রূপ;—তারা, দপদপ ক'রে মাতালের মত দুলছে, ঘুমন্ত সীমন্তিনীদের মধুমাতাল নিঃশ্বাসের ছোঁয়াচ লেগে যেন তারা মাতাল হয়ে গেছে।

গভীর রাত্রি। মহারাজ গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। এত গভীর নিদ্রা, যে তিনি জানতে পারেন নি—

> কখন তাঁর চরণনখরের ছায়ায় নেমে এসেছে আকাশের তারকার দল, ধীরে ধীরে সংবাহন ক'রে দিচ্ছে চরণ;
>
> দিগঙ্গনারা কখন এসে আদরভরে ধ'রে রয়েছে বিশ্রাম-প্রসারিত তাঁর অঙ্গখানি;
>
> আনন-লক্ষ্মী মুখের পাশে ব'সে কখন থেকে তাঁকে বীজন ক'রে চলেছেন,—নিজের হাতের পদ্মপাপড়ির পাখার বাতাসখানি দিয়ে,
>
> সুরার মত সুরভিত তাঁর নিঃশ্বাসখানি দিয়ে।
>
> আর কখন অলক্ষিতে তাঁর অম্লান গালের উপর ব'সে পড়েছেন একখানি ছায়া-চাঁদ,—রতিকেলির কেশ-কোটি-কলম্বিত যেন শ্বেত-কুসুমের শেখর।

প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমজ্জিত রয়েছেন মহারাজ, এমন সময় সহসা "আর্য্যপুত্র, রক্ষা করুন রক্ষা করুন" ব'লে চীৎকার করতে করতে, উৎকম্পমান-অঙ্গযষ্টি দেবী যশোবতী তাঁর শয়নীয়ে উঠে বসলেন; ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ধ্বনিত হয়ে উঠল অলঙ্কার, যেন পরিজনদের ডাক দিতে লাগল সেই ভূষণরব।

মহাদেবীর মুখে "পরিত্রায়স্ব" ধ্বনি,—সমস্ত পৃথিবীতে এই এক অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার,—দুটি কান যেন দগ্ধ ক'রে দিল মহারাজের।

নিমেষের মধ্যে মহারাজকে ত্যাগ ক'রে গেল নিদ্রা।

শিথানের শিরোভাগে রাখা থাকত অচ্ছধার মুক্ত একখানি কৃপাণ। নিশাকে সীমন্তিত ক'রে, কোপ-কম্পমান দক্ষিণ করপল্লবে কর্ণোৎপলের মত সেটিকে তূর্ণ তুলে নিলেন মহারাজ। বামকরপল্লবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, অন্তরাল-ব্যবধায়ক আকাশের মত, তাঁর গাত্রের উত্তরীয়াংশুক। বিক্ষেপের বেগে হাত থেকে খ'সে ছুটে বেরিয়ে গেল,—দিকে দিকে যেন ভয়ের কারণটিকে খুঁজতে, দ্বিতীয় হৃদয়ের মত মণিবন্ধের ভ্রষ্ট কনকবলয়।

ত্বরিৎ-অবতরণ! বামচরণের তাড়নায় কম্পিত হ'ল প্রাসাদ; কণ্ঠ থেকে ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হার, যেন ছড়িয়ে পড়ল কৃপাণের খরধার লেগে জ্যোৎস্নার খণ্ড খণ্ড কণা।

নিদারুণ লোচনের ঔজ্জ্বল্যে যেন রোষরক্ত হয়ে গেল দিগন্ত।

"দেবি, ভয় ক'রো না, ভয় নেই" বলতে বলতে, বদ্ধান্ধকার ত্রিপতাক ভ্রূকুটি দিয়ে ত্রিযামাকে যেন বারম্বার ওলটপালট করতে করতে, বেগে শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে পড়লেন মহারাজ।

তাঁর চক্ষু যখন দেখতে পেল না কিছুই, তখন প্রভাকরবর্দ্ধন মহাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভয়ের কারণ।

রাতজাগা প্রতিহারিণীরা—যেন গৃহদেবতারা—ছুটে এল; সমীপেই যারা শয়ন ক'রে ছিল তারাও জেগে উঠে হুড়মুড়িয়ে ছুটে এল; শান্ত হ'ল হৃদয়ের উৎকম্পিত শঙ্কা।

মহাদেবী তখন বললেন—

"আর্য্যপুত্র, আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি। আমি জেনেছি।—

ভগবান সূর্য্যদেবের মণ্ডল থেকে নির্গত হয়ে এল দুটি ছোট্ট ছোট্ট কুমার—তেজের যেন পিণ্ড; তরুণ রৌদ্রে পূর্ণ হয়ে গেল দিক্‌ভাগ; বিদ্যুতের সুর বেজে গেল প্রাণীলোকের প্রাণে। তাদের দুজনেরই মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, বক্ষে কবচ, তারা অস্ত্রধারী। ইন্দ্রগোপকীটের মত রঙিন কুঙ্কুমে তারা স্নাত। মাথায় অঞ্জলি রচনা ক'রে তাদের প্রণাম করছে জগতের নিখিলতা। আর তাদের পিছনে পিছনে আসছে সুষুম্নারশ্মি থেকে বেরিয়ে-আসা চন্দ্রমূর্ত্তির মত একটি ছোট্ট মেয়ে। সন্তান-অনাদৃতা আমি তাদের দেখে কেঁদে উঠলুম। তখন সেই দুটো ছোট্ট ছোট্ট ছেলে অস্ত্র দিয়ে আমার নিম্নোদর দীর্ণ ক'রে প্রবেশ

করতে আরম্ভ করল। আর্য্যপুত্র, তারপরেই আমি জেগে উঠলুম। বোধ হয় চীৎকার ক'রে উঠেছি—আমার সমস্ত বুক এখনও কাঁপছে।"

ঠিক এমনি সময়ে, মহাদেবী যখন শেষ করেছেন স্বপ্ন-বৃত্তান্ত, রাজলক্ষ্মীর প্রথম আলাপের মত, তোরণের নিকটেই রণ্‌রণ্‌ ক'রে বেজে উঠল প্রভাত-শঙ্খ,—পর্য্যাপ্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল স্বপ্নের ফল। অমন্দ বেজে উঠল প্রাভাতিক দুন্দুভি, বিশ্বের সঙ্গে যেন পরিচয় করিয়ে দিল সৌভাগ্যের আগমনী। কণ্‌কণ্‌ ক'রে সানন্দে বেজে উঠল কোণাহত প্রত্যূষ-নান্দী। গম্ভীরকণ্ঠে দূর থেকে শোনা গেল প্রবোধ-মঙ্গল-পাঠকদের জয়-জীব-ধ্বনি। আর মহারাজের মন্দুরামন্দিরে, যেখানে সুপ্তোত্থিত প্রিয়তুরঙ্গের দল মধুর হ্রেষাধ্বনি ক'রে সামনে-রাখা যবের দানা এবং তুষার-শীতল জল পান ক'রে চলেছিল, সেখান থেকে ভেসে এল অপরবক্ত্র ছন্দে অশ্বপালের পাঠ—

"নিধিস্তরুবিকারেণ সন্মণিঃ স্ফুরতা ধাম্না
শুভাগমো নিমিত্তেন স্পষ্টমাখ্যায়তে লোকে ॥ ৩
অরুণ ইব পুরঃসরো রবিং পবন ইবাতিজবো জলাগমম্
শুভমশুভমথাপি বা নৃণাং কথয়তি পূর্ব্বনিদর্শনোদয়ঃ ॥ ৪*

অশ্বপালের পাঠ শুনে প্রীতির রণনে রণিত হয়ে উঠল মহারাজের অন্তঃকরণ। তিনি বললেন, "দেবি, আনন্দের মুহূর্ত্তটিকে বিষাদের গুণ্ঠন দিয়ে ঢেকো না। এতদিনে সমৃদ্ধ হ'ল গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ। পূর্ণ আমাদের মনোরথ। কুলদেবতারা তোমাকে পরিগ্রহণ করেছেন। তোমার উপর প্রসন্ন হয়ে এতদিনে বুঝি ভগবান অংশুমালী তোমার মধ্যে ঢেলে দিলেন অতিগুণবান তিনটি অপত্যলাভের আনন্দিত সূচনা।"

এই কথা ব'লে মহারাজ বিদায় নিলেন মহাদেবীর; অবতরণ করলেন হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ থেকে, সম্পন্ন করলেন যথাক্রিয়মাণ ক্রিয়া। যশোবতীও আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠলেন,—নিশ্চয়ই ফলবে মহারাজের মুখের ভাষা।

* গাছের নীচে গুপ্তধন যে পোঁতা রয়েছে, তরুবিকার দেখে তা বোঝা যায়; মণিটি যে ভাল, সেটি বোঝা যায় তার জলজৌলুষ দেখে; আর নিমিত্ত দেখে বোঝা যায় কল্যাণের সমাগম;—এই পৃথিবীতে এটি একটি স্পষ্ট প্রবাদ। অরুণের আবির্ভাব প্রচার ক'রে দেয় সূর্য্যের প্রকাশসংবাদ; অতিবেগ বাতাসে থাকে বৃষ্টিপতনের সঙ্কেত; তেমনি নিমিত্তের (নিদর্শন) পূর্ব্বোদয়ে থাকে শুভাশুভ ফলাফলের বাণী।

এর পর কেটে গেল মহাকালের কিছু অংশ।
দেবী যশোবতীর গর্ভে প্রথমে সম্ভূত হলেন রাজ্যবর্দ্ধন।
গর্ভস্থিত হ'লেও যেন তাঁর যশোরাশি পাণ্ডুতা এনে দিল জননীর অঙ্গ-পরিবেশে; যেন তাঁর গুণের গুরুভারে ক্লান্তা হয়ে গাত্র বহন করতে পারতেন না জননী।
সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্যের উপচয় অনুভব করতেন দেবী যশোবতী। লাবণীর অমৃতরসে এত তৃপ্ত হয়েছিলেন, যে যশোবতীর মুখে আর রুচত না সাধারণ আহার।

ধীরে ধীরে উপচীয়মান গর্ভভারে মন্থর হ'ল তাঁর তনু।
তাঁকে অধিকার করল আলস্য।

প্রতিদিন তাঁর বন্দনা করা চাই গুরুজনদের; তাঁদের বারণ মানতেন না, অথচ দৈহিক চেষ্টা অসহনীয়, সখীরা ধীরে ধীরে হাত ধ'রে তাঁকে নিয়ে যেত গুরুজনদের নিকটে। যেতে-যেতে যেতে পারতেন না,— বিশ্রাম করতেন আসন্ন স্তম্ভভিত্তিতে হেলান দিয়ে,—আহা, তখন তাঁকে দেখাত চারুশিল্পীর হাতে-কোঁদা যেন বিরাজ-শালের মূর্ত্তি।
পদ্মের মত দুখানি চরণ;—তুলে তুলে ঘুরে বেড়ানো—সে কি সহজ কথা! মনে হ'ত, যেন লক্ষ ভ্রমর তাঁর চরণপদ্মের উপর ভারী হয়ে ব'সে রয়েছে।
যদিই বা ধীরে ধীরে একটু চালাতে পারলেন চরণ, তখন মনে হ'ত, চরণের নখজ্যোতিগুলিকে মৃণাল ভেবে লোভী ভবনহংসেরা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।
মণি-সুন্দর ভিত্তিতে নিজের যে প্রতিমা ফলিত হয়ে পড়েছে, সখীর হাত ধরতে গিয়ে সেই প্রতিমার হাতের দিকেই নিজের পদ্মহাত-খানিকে বাড়িয়ে দিতেন; ভুলে যেতেন, হাতধরার জন্যে পাশেই রয়েছে হাজার সখী।
মাণিক্যস্তম্ভের ছটাগুলোকেও ধ'রে গাত্রোত্থানের চেষ্টা করতেন, ভাববার সময়ও পেতেন না তাঁর প্রিয় ভবনলতাদের।
সংসারের কোন একটি কাজ করা দূরে থাক্, আদেশ করবার ক্ষমতাতেও বাধা দিত আলস্য।

অচঞ্চল স্থাণু থাকত নূপুরভারখিন্ন চরণযুগ, মনে মনেও তিনি উৎসাহ পেতেন না—সৌধের উপরতলায় ওঠার। যে মানুষ নিজের অঙ্গখানিকে ধারণ করতে পারে না, সে কী ক'রে ভাববে ভূষণধারণের কথা! ক্রীড়াশৈলে আরোহণ ক'রে একটু খেলা যাক—এই কথাটুকুকেই ভাবতে তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠত, মুখ থেকে বেরত অস্ফুট মর্ম্মর।

কিন্তু অলস হ'লে হবে কি! গর্ভের গর্ব্ব ছিল। যখন দেবী যশোবতী তাঁর জানুর শিখরদেশে হাত রেখে জোর ক'রে উঠে পড়বার চেষ্টা করতেন, তখন গর্ব্বভরেই গর্ভ দিত বাধা। উঠতে পারতেন না। সারাদিন স্তনপৃষ্ঠে দৃষ্টি রেখে তিনি অধোমুখী হয়ে ব'সে থাকতেন; আহা, সেই অধো-নত পদ্মমুখখানিকে দেখে মনে হ'ত, যেন একটি নিবিড় ঔৎসুক্য গর্ভটিকে দেখবার লালসায় স্তনের মধ্য দিয়ে প্রবেশ ক'রে চলেছে হৃদয়ের পথে।

দেবী যশোবতীর অঙ্গে তখন কী অপূর্ব্ব শোভা! পরিবেশে তখন কী অনিভৃত সৌভাগ্য!

শরীর-মঞ্জুষায় যার তনয়,
হৃদয়-মঞ্জুষায় যার স্বামী,
তার কি অন্ত থাকে কান্তির!

এই রকম রাজকীয় আলস্যের মধ্য দিয়ে দশটি মাস তাঁর কেটে গেল; সখীদের কোল থেকে শরীরটিকে মুক্ত ক'রে শরীর-পরিচারিকাদের অঙ্কে রইল তাঁর শরীর এবং সপত্নীদের মূর্দ্ধায় রইল তাঁর পদযুগ।

তারপর জন্মগ্রহণ করলেন রাজ্যবর্দ্ধন,—
বজ্রের পরমাণু দিয়ে নির্ম্মিত তাঁর অঙ্গ—সমগ্র রাজন্যের পক্ষশাতনের উদ্দেশ্য।
ত্রিভুবনের ভার বহন করবার মত কঠিন স্কন্ধ নিয়ে তিনি জন্মালেন।
যেন শেষনাগের ফণামণ্ডলের উপাদানে তাঁর গঠনকল্পনা। দিগ্‌হস্তীদের মত তাঁর ভূভৃৎকম্পকারী অবয়ব।

কুমারের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রজারাও যেন লাভ করল নৃত্যময় এক নবজন্ম। এক মাস ধ'রে মহোৎসব হ'ল মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের রাজত্বে।

চৌদিকে সে কি অসংখ্য শঙ্খের স্বনন!

কি বিচিত্র পটু আরাব শত সহস্র প্রহতপটহে!

গম্ভীর ভেরীর নিনাদে নির্ভরে ভ'রে গেল ভুবন, আর অপূর্ব্বসুন্দর হয়ে দেখা দিল মর্ত্ত্যলোকের যৎকিঞ্চ, প্রমোদের মত্ততায়।

মাসব্যাপী এই মহোৎসব মহারাজের মনোরাজ্যে বিরাজ ক'রে গেল একখানি উজ্জ্বল দিনের মত।

তারপর দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হ'ল সময়ের আরও কিছু অংশ।

দুলে উঠল দোলনচাঁপা, মুকুল ধরল কদম্বের তরুতে তরুতে, এল শ্রাবণ মাস। রূঢ় পাতার শ্যামলতা নিয়ে অজস্র জেগে উঠল তোক্মতৃণ, স্তম্ভিত হ'ল তামরসের বাসর, নীরব হয়ে গেল মানসোৎক হংস। এল শ্রাবণ মাস; বিকসিত হ'ল চাতকদের চিত্ত।

তখন একদা, যেন একই সঙ্গে, সমকালে আবির্ভূত হলেন হর্ষ—দেবী যশোবতীর হৃদয়ে এবং গর্ভে। চক্রপাণি যেন জননীত্বে বরণ ক'রে নিলেন দেবকীকে। ধীরে ধীরে নিখিল প্রজাপুঞ্জের পুণ্যসঞ্চয়ের সমালিঙ্গনেই যেন পুনর্ব্বার পাণ্ডু হয়ে গেল দেবী যশোবতীর অঙ্গযষ্টি। গর্ভারম্ভে শ্যামায়মান হ'ল তাঁর চারু স্তনবৃন্ত,—মহারাজচক্রবর্ত্তী দুগ্ধ পান করবেন, এই নির্দ্দেশ পেয়েই মাতৃস্নেহ যেন শীলমোহর ক'রে দিয়ে গেল দুটি পয়োধর-কলসের মুখ।

ধীরচরণে যখন তিনি বিচরণ করতেন আলস্যে, এবং নির্ম্মলনীল মণিকুট্টিমের মধ্যে মগ্ন হয়ে যেত তাঁর চরণের ছায়া, তখন মনে হ'ত, পদপল্লব গ্রহণ করার ছলনায় যেন বসুন্ধরা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন অনাগত মহারাজের পূর্ব্ব-সেবা।

দিনের বেলায় যখন তিনি অঙ্গখানিকে এলিয়ে দিয়ে শয়ন ক'রে থাকতেন পালঙ্কে, আর তাঁর বিমল কপোলদরে প্রতিমা পড়ত পালঙ্কের চন্দ্রাতপে-আঁকা পত্রভঙ্গ-পুত্রিকার, তখন তাঁকে দেখাত ঠিক যেন লক্ষ্মী, অপেক্ষা করছেন প্রসবের পরিণতির।

দিনের শেষে যখন রাত্রি আসে, তখন দেবী যশোবতী ধীরে ধীরে যেতেন সৌধের শিখরাগ্রে, গর্ভের উন্মাথে স্তন-মণ্ডল থেকে খ'সে যেত অংশুক, আর

চাঁদের আলো পড়ত স্তনের শিখরে ; তখন মনে হ'ত, কে যেন শুভ্র-স্বরূপ একখানি রাজছত্র ধারণ ক'রে রয়েছে গর্ভের শিখরে। তারপর যখন ঘুমিয়ে পড়তেন বাসভবনে, তখন চিত্রভিত্তি থেকে বেরিয়ে এসে চামর-গ্রাহিণীরাও যেন তাঁকে সেবা করত চমরীচামরের হিন্দোলনে।

চারটি দিক্‌হস্তী এসে স্বপ্নের মধ্যেও তাঁকে স্নান করিতে যেত,—শুণ্ডধৃত কমলের সলিলে।

আবার যখন যশোবতী জেগে উঠতেন, তখন চন্দ্রশালিকার সালভঞ্জিকারা, একবার নয় অনেকবার, জন্ম দিত জয়ধ্বনির।

পরিজনদের ডাক দিলেই "আদেশ করুন, আদেশ"—এই রকমের একটি অশরীরী বাণী চতুর্দ্দিকে রণ্‌রণ্‌ ক'রে বেড়িয়ে বেড়াত।

হায় রে! মায়ের মন কী এক অসাধারণ উপাদান দিয়ে গড়া! গর্ভস্থ হ'লেও সন্তানের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ ক'রে চলে মায়ের মন ;—তাই বোধ হয়—

ক্রীড়ার সময়েও আজ্ঞাভঙ্গটিকে অসহ্য ব'লে বোধ হ'ত দেবী যশোবতীর ;
বারম্বার তাঁর বাসনা হ'ত চতুর্মহোদধির মিশ্রিত জলে স্নান করার ;
হৃদয় চাইত চতুঃসমুদ্রের বিপুল পুলিন-পরিসরে ঘুরে বেড়াতে ;
সমুদ্রবেলার বনলতার গৃহে গৃহে, ফাঁকে ফাঁকে ঘুরতে।

মণিদর্পণ কাছে রয়েছে, তবু নিজের মুখ দেখতে একান্ত ভালবাসতেন মুক্ত-খড়্গের ফলকে।

কেউ কি কখনও শুনেছেন বীণার ঝঙ্কার ভাল লাগে না মেয়েদের ?
তবে শুনুন,—যশোবতীর কর্ণ দুটি হৃষ্ট হ'ত ধনুকের টঙ্কারে।
পিঞ্জরের মধ্যে পক্ষী দেখে নয়—সিংহ দেখে তৃপ্ত হ'ত তাঁর নয়ন ;
গুরুজনদের প্রণাম করতে গিয়ে যেন প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে, শেষে কোন রকমে নত হ'ত তাঁর মস্তক।

এই রকম হয় মায়ের মন!—তার ভিতর দিয়ে যেন কথা কয় সন্তানের হৃদয়!

এ দিকে সখীদের আনন্দ আর ধরে না। তারা বড় বড় চোখ মেলে প্রতীক্ষা ক'রে থাকে আসন্ন প্রসব-সময়ের।

এল ব'লে,—

প্রচণ্ড এক মহোৎসব! সমারোহ!

তাই বোধ হয় তাদের নায়নিক শুভ্রতা অচূর্ণ-ধবলিত ক'রে দিত ভবনখানিকে, এবং রক্ষাবলির বিধান ক'রে চতুর্দ্দিকে বর্ষণ ক'রে দিত কুমুদ-কমল-কুবলয়ের পলাশ-মহিমা।

মুহূর্ত্তের জন্যও তারা পাশ ছাড়ত না যশোবতীর।

আস্তোচিত স্থানে নিষণ্ণ হয়ে মহারাণীর সেবা করতে লাগলেন রাজবৈদ্যেরা; তাঁরা যেন বিবিধ ওষধিধর পর্ব্বতদের কল্পনা। লক্ষ্মীদেবীর সহাগত, সমুদ্রের যেন খণ্ড খণ্ড হৃদয়,—প্রসিদ্ধ এবং প্রশস্ত রত্নরাজি বেঁধে দেওয়া হ'ল মহারাণীর গ্রীবাসূত্রের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।

দেখতে দেখতে উপস্থিত হ'ল জ্যৈষ্ঠ মাস। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। কৃত্তিকার নক্ষত্রমঞ্জরীতে ঢ'লে পড়েছেন চন্দ্র। অতীত হয়ে গেছে প্রদোষকাল, রজনীর শ্রীঅঙ্গে আবির্ভাব হচ্ছে যৌবনের। এমন সময় সহসা মহারাজের অন্তঃপুরে বিপুল কোলাহল উঠল মেয়েদের। এবং

সম্ভ্রমভরে সেখান থেকে বেরিয়ে এল যশোবতার স্নেহের পাত্রী ধাত্রী-নন্দিনী 'সুযাত্রা'।

দৌড়ে গিয়ে রাজার চরণ বন্দনা ক'রে সে বললে, "হে দেব, অতি সৌভাগ্যের বিষয়, জন্মগ্রহণ করেছেন দ্বিতীয় পুত্র।"

এই কথা বলতে বলতে গ্রহণ করল পূর্ণ-পাত্র।

এমন সময় সভায় প্রবেশ করলেন মহারাজের পরম-শ্রদ্ধেয় রাজগণক তারক।

অব্যর্থ হ'ত তাঁর গণনা।—তাঁর অতীন্দ্রিয়াদেশ প্রত্যক্ষ ফল দিয়েছে শত শতবার; তা বিলক্ষণ দেখা গেছে; জ্যোতির্ব্বিদ্যায় যাকে বলে সঙ্কলিতী, নিখিল গ্রন্থ-সংহিতায় যাকে বলে পারদৃশ্বা, গণকরাজত্বে সেই প্রকার পূজিত এবং সুহিত ছিলেন আমাদের ত্রিকালজ্ঞ রাজগণক তারক।

ভোজক-বংশে জন্মেছিলেন এই তারক! সেই বংশের উৎপত্তি হয় মগ এবং দ্বারকার ভোজকন্যাদের মিলন থেকে।

তিনি বললেন—

"হে দেব, শুনুন। ব্যতীপাতাদি সর্ব্বদোষাভিষঙ্গ-রহিত এমনি এক পুণ্যদিনে পুরাকালে জন্মলাভ করেছিলেন মান্ধাতা। সে দিনও এমনি এক সর্ব্বতুঙ্গ-স্থানে গ্রহাদির অধিষ্ঠান ছিল, লগ্ন ছিল তুল্য। তাঁর জন্মগ্রহণের পরে, এবং অদ্যকার কুমারের জন্মের পূর্ব্বে, চক্রবর্ত্তী-জনন এই প্রকার যোগে জগতে অপর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। অদ্য মহারাজের যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছেন আমাদের বিচারে তিনি হবেন চক্রবর্ত্তী-সপ্তকের অগ্রণী, চক্রবর্ত্তী-চিহ্ন-মহারত্নগুলির আধার, সপ্তসাগরের পালয়িতা, সপ্ততন্তু যজ্ঞসমূহের প্রবর্ত্তয়িতা, এবং সপ্তসপ্তি-সমপ্রভ।"

সমাপ্ত হয় নি তখনও রাজগণকের ভাষণ—এমন সময় অনাধ্মাত হ'লেও আপনা হতেই তার মধুর ধ্বনিতে বেজে উঠল অজস্র শঙ্খ।

অতাড়িত হ'লেও ক্ষুভিত সমুদ্রের জলধ্বনির মত ধীরে গুঞ্জন ক'রে উঠল অভিষেক-দুন্দুভি।—

অনাহত হ'লেও রণ্‌রণ্‌ ক'রে নিনাদ ক'রে উঠল সংখ্যাতীত মঙ্গল-তূর্য্য।

ঘুরে বেড়াতে লাগল তূর্য্যের প্রতিধ্বনি—যেন সর্ব্বভুবনের অভয়ঘোষণ পটহ।

মন্দুরায় মন্দুরায় একসঙ্গে হ্রেষাধ্বনি ক'রে উঠল তুরঙ্গের সঙ্ঘ;—কী আনন্দ তাদের স্কন্ধরোম নাড়বার ঘটায়! প্রশস্ত মুখের গ্রাসে হরিৎদূর্ব্বা আর পল্লব-গ্রহণের কী সগর্ব্ব আরাম! দূর থেকে শোনা যেতে লাগল শুঁড় দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে রাজহস্তীরা নাচছে; শ্রবণ-সুভগ কী তাদের গর্জ্জন গান!

যজ্ঞের মন্দিরে,—ইন্ধন নেই, অথচ জ্ব'লে উঠল বৈতান বহ্নি; প্রদক্ষিণ শিখা-কলাপে যেন প্রচার ক'রে দিল কল্যাণের আগমনী।

ভূমির তলদেশ ভেদ ক'রে উঠে আসতে লাগল সোনার-শিকল-দিয়ে-মুখ-বাঁধা ঘড়ায় ঘড়ায় মহানিধি। এবং মনে হতে লাগল দিক্‌পালেরা আনন্দের আতিশয্যে প্রহতমঙ্গলতূর্য্যের প্রতিধ্বনির ছলনায় দিলেন সৌভাগ্যবর্দ্ধন জয়ধ্বনি।

দেখতে দেখতে সেই মুহূর্ত্তে শুক্লবাস পরিধান ক'রে ব্রহ্মমুখ ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হলেন,—প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যেন সত্যযুগাশ্রয়ী প্রজাপতিদের শুভাগমন।

সাক্ষাৎ-ধর্ম্মের মত উপস্থিত হলেন পুরোহিতেরা; শান্তিজল ও ফল তাঁদের হস্তে।

সনাতন আচারপদ্ধতির মত দেখা দিলেন বান্ধব বৃদ্ধেরা। এতদিন যারা বন্ধন-দশায় কারাবাস ভোগ করছিল, হঠাৎ তারা মুক্তি পেয়ে গেল ;—কী তাদের চেহারা! মুখভরা লম্বিত শ্মশ্রুর কুশ্রীতা, শরীরগুলো কালি হয়ে গেছে, মালিন্য-পঙ্কে আর অজস্র কলঙ্কে ; ক্ষয়িষ্ণু কল্কির তারা যেন বান্ধব ;—হঠাৎ মুক্তি পেয়ে তারা আকুলি-বিকুলি হয়ে দৌড়তে লাগল।

আনন্দে লোকেরা লুঠ ক'রে শূন্য ক'রে দিয়ে গেল হাটবাজার। বিপণি-বীথিগুলোকে দেখে মনে হ'ল, অধর্ম্ম পালিয়েছে—আর প'ড়ে রয়েছে তার শূন্য শিবির।

চারিদিকে উন্মুখ বামন আর বধিরদের কোলাহল, অসংখ্য বালকদের কলকল,—নাচতে লেগে গেল বৃদ্ধ ধাত্রীরা।

দেখতে দেখতে আরম্ভ হয়ে গেল মহান্ পুত্রজন্মোৎসব—

কোথায় ভেসে চ'লে গেল রাজকুলের কঠোর বিধিনিষেধ!

ধিক্কৃত হ'ল খাড়া-পাহারার বাহার।

বেত্রিদের হাত থেকে লুঠ হয়ে গেল বেত্রদণ্ড।

অন্তঃপুরে ঢুকে যেতে লাগল পুরুষমানুষ। কিসের দোষ! সব সমান—প্রভু আর পরিজন, বৃদ্ধ আর বালক, শিষ্ট আর অশিষ্ট, সব সমান।

বোঝা দায় হ'ল, কে মাতাল আর কে নয়।

ভেদ রইল না, কুলযুবতী আর বারাঙ্গনাদের আলাপে ও বিলাসে।

উদ্দাম নৃত্য ক'রে উঠল রাজধানীর জনশ্রী।

তার পরের দিন। রাজকুলে নাচতে নাচতে আসতে আরম্ভ করল সামন্ত নরপতিদের সহস্র সহস্র অন্তঃপুর।—

নাচতে নাচতে চ'লে আসছে এক-একটি অন্তঃপুর ;

লক্ষ লক্ষ চরণ আঘাত করছে ভূমিতল, নৃত্যের ছন্দে,

রণ্‌রণ্ ক'রে বেজে উঠছে মণিনূপুর ঘন-আনন্দে।

এক-একটি অন্তঃপুর যেন এক-একটি স্ত্রীরাজ্য ; উজাড় হয়ে আসছে।

যেন এরা এক-একটি পদ্মরাগের খনি,—খুলে যাচ্ছে যার আবরণ ;

যেন নারায়ণের এক-একটি অবরোধন—প্রস্খলিত যার সম্ভার ;
যেন অপ্সরাদের এক-একটি কুল, নেমে এসেছে ধরণীতে।

আর সেই অন্তঃপুরের পিছনে পিছনে আসছে সহস্র সহস্র পরিজন।

তাদের মধ্যে একদলকে দেখা গেল, অনেকগুলি প্রকাণ্ড করণ্ডের মধ্যে বহন ক'রে নিয়ে আসছে স্নানীয় চূর্ণাবকীর্ণ শতশত পুষ্পমাল্য ; আর একদল নিয়ে আসছে শতশত পাত্রী,—স্ফটিকশিলার মত খণ্ড খণ্ড শুক্ল কর্পূরে পূর্ণিত ; আর একদল নিয়ে আসছে মণিখচিত বড় বড় পরাত—কুঙ্কুমের গন্ধাধিবাসে রক্তিম।

আবার একদলকে দেখা গেল, তারা ব'য়ে নিয়ে আসছে শতশত হস্তি-দন্তের পেটিকা ; তাদের উপরে পংক্তি ক'রে সাজানো রয়েছে চন্দনধবল পূগীফলের ফালি আর আম্র-তৈলে-জারানো তনুখদিরের কেশরজাল।

কত যে দল আসতে লাগল তার ঠিকানা নেই।

পাত্র-ভরা সিন্দুর আর সিন্দূর,
পাত্র-ভরা গন্ধচূর্ণ আর চূর্ণ,
শিশুলতিকা থেকে ঝোলানো পঞ্চাশৎ পানপত্রের এক-একটি গুচ্ছ,—
এমনধারা কত শত তাম্বূলগাছের শোভা।

ধীরে ধীরে রাজপুরীতে পাপড়ি মেলতে লাগল উৎসবের পদ্ম।
সে আমোদ ছড়িয়ে পড়ল মহারাজে, সামন্তরাজে, আর্য্যবৃদ্ধে, সচিবে, সর্ব্বত্র
কুসুমের রাশিতে রাশিতে পাহাড়ের আকার ধারণ করল সেই আমোদ,

সীধুর প্রপায় প্রপায় অজস্র ধারাগৃহের, এবং
পারিজাতকের গন্ধে গন্ধে ইন্দ্রের নন্দনবনের।

সে আমোদ যেন—

কর্পূরের রেণুতে রেণুতে স-নীহার,
পটহের ধ্বনিতে ধ্বনিতে সাট্টহাস,
মাণিক্যের কিরণে কিরণে স-পুলক,
প্রসাদের দানে প্রদানে স-পল্লব।

রাসকমণ্ডল রচনা ক'রে এত চলতে লাগল নৃত্য, যে—সেই আমোদখানিকে মনে হ'ল নৃত্যের ঘূর্ণি, ললাটে চন্দন এঁকে পাগড়ি বেঁধে নাচতে লেগে গেছে আনন্দ, সৃষ্টি ক'রে সন্তানরূপী প্রতিধ্বনি।

কোথাও দেখা গেল,—যে সব কুলপুত্রকেরা চিরন্তন শালীনতার আশ্রয়ে এতদিন অনুচিত ব'লে বিবেচনা করতেন নৃত্যকে,—তাঁরাও মহারাজের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ ক'রেই মেতে উঠেছেন লাস্যনৃত্যে ;

কোথাও দেখা গেল মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন মনে মনে মুচকি হাসতে হাসতে চ'লে যাচ্ছেন ;—আনন্দের দিনে অনেক কিছু উপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই ; অথচ না হেসেই বা থাকেন কেমন ক'রে, যখন দেখেন রাজার বল্লভদের নিয়ে টানাটানি করতে লেগেছে পানোন্মত্তা কতকগুলো ক্ষুদ্র দাসী। চলতে চলতে মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন হাসি চাপতে না পেরে নির্ভর আনন্দে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। রাজধানীর মধুমত্ত বারাঙ্গনাদের কণ্ঠে লগ্ন হয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধ আর্য্যসামন্তেরা উঠি-পড়ি ক'রে নাচছেন! এ সব দেখে কি হাসি চেপে রাখা যায়? একটুখানি এগিয়েই কী যে খেয়াল হ'ল তাঁর,—মহারাজ একখানি আঁখি-সংজ্ঞা ছাড়লেন ; অমনি, চোখ-ঠারার ভাষা বুঝে নিয়ে, তুষ্ট কতকগুলো দাসেরক গান গেয়ে উঠল ;—কোথায় কার কুঞ্জে কোন্ সচিব চুরি ক'রে রতিশাস্ত্রের নীতি পালন করেছেন! গীতের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল তারই সূচনা।

আবার কোথাও দেখা গেল মদোৎকট কুটহারিকার দল বৃদ্ধ জীর্ণ প্রব্রাজকদের জড়িয়ে ধ'রে আলিঙ্গন করছে, আর চীৎকার ক'রে হেসে পাগল হয়ে উঠছে জনতা। নিতান্ত স্পর্দ্ধায় অসামাল হয়ে বাবুই-চ্যাংড়ার দল আরম্ভ ক'রে দিয়েছে অবাচ্য-বচন-যুদ্ধ।

আবার কোথাও দেখা গেল রাজপুরীর অবলারা নাচতে-জানে-না এমন কতকগুলো অন্তঃপুর-পালদের ধ'রে জোর ক'রে নাচাচ্ছেন, আর দূরে দাঁড়িয়ে উচ্ছিষ্টান্নভোজী ভুজিষ্যারা হাঁ ক'রে অবাক্-মজায় দেখছে।

সহস্র সহস্র যুবা মেতে উঠল ক্রীড়ারসে।

গলায় দোলাল বকুলফুলের মালা ; কাম্বোজী ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে খেলতে লাগল ; উড়ে চলতে লাগল, যেমন উড়ন্ত লাফ কাটে তরল-তারা কৃষ্ণসার।

তাদের নির্দ্দয় চরণের খনিত্রে ফেটে যেতে লাগল পৃথ্বী। কোনক্রমে আমাদের এই ক্ষমাময়ী ধরণী সহ্য করতে লাগলেন তাদের ঐ তালে-তালে-পা-ফেলার অহঙ্কারের ব্যথা। এ ওর সঙ্গে, ও এর সঙ্গে,—খেলছে—আস্ফালনে মর্দ্দিত হচ্ছে অঙ্গ। ঐ দেখ, ছোট্ট ছোট্ট রাজকুমারদের মুক্তার নহরগুলো বুঝি ফেটে গেল!

দেখতে দেখতে সিন্দূরের রেণুকায় রাঙা হয়ে গেল ব্রহ্মাণ্ড-কপাল। সে কি সহজ লালিমা! হিরণ্যগর্ভের গর্ভশোণিতে যেন লাল হয়ে গেল দশটা দিক। আবার তারই মধ্যে আকাশে আকাশে মন্দাকিনীর সহস্র সহস্র সৈকতের চিত্র অঙ্কন ক'রে দিয়ে গেল গন্ধচূর্ণের অজস্র শুভ্রতা। ছড়িয়ে-পড়া পিষ্টাতকের পরাগে পরাগে হলুদ-বরণ হয়ে গেল আনন্দ-দিনের রৌদ্র। সেইটি দেখে মনে হ'ল— ভুবনখানি কাঁপছে,

বিশীর্ণ পিতামহ ব্রহ্মা,

ঝ'রে পড়ছে পদ্মের কিঞ্জল্ক থেকে রেণু,

আর যেন তারই আদর মাখছে এই নবীন দিন।

লোকেদের কী হর্ষ-হুল্লোড়! সম্মর্দ্দে পদস্খলন হচ্ছে, মালা-থেকে-খ'সে-যাওয়া মুক্তার দানায় দানায়।

আনন্দের বর্ণনার অন্ত নেই;—না ক'রেও পারি না।

দেখতে দেখতে নৃত্যে মেতে উঠল রাজধানীর পণ্যবিলাসিনীরা;

নৃত্যের ছন্দচাতুর্য্যে বিকীর্ণ হ'ল বিকার।

যাদের উপর ঢ'লে পড়ল তাদের বিলোল কটাক্ষের মহিমা, তারা যেন অমৃত-পীত হয়ে গেল,—অপাঙ্গ-শুক্তির তৃষ্ণায়। মরি মরি, তাদের তর্জ্জন-তরঙ্গিত তর্জ্জনীনখরের ছটা!—যেন লক্ষ লক্ষ হৃদয়-বিহঙ্গ-ধরার জাল!

অভিমানের অভিনয়ে অভিনয়ে

ভ্রূলতার বিভক্ত ভঙ্গিমা দিয়ে,

প্রণয়ের ভাষণে সম্ভাষণে,

তারা যেন তাড়া দিতে লাগল সকলকে;—

বর্ষণ করল সর্ব্বরস।

নাচতে নাচতে পণ্যবিলাসিনীরা এল ;—

মাল্য-মনোহর চূড়া,
কর্ণে পেলব পল্লব,
কপালে চন্দনের তিলক ;

বলয়-বাচাল বাহুলতিকার উচ্ছ্বাস দিয়ে যেন আলিঙ্গন করতে লাগল সূর্য্যকে। কী সুন্দর তাদের দেখতে,—

তারা যেন কাশ্মীর-কিশোরী ;—কুঙ্কুম দিয়ে মাজা তাদের দেহ,—তুরঙ্গীর মত নাচতে নাচতে এল।

নিতম্ববিম্বে বিলম্বিত হয়ে পড়েছিল বিপুল কুরণ্টক ফুলের রক্তিমা, দেখে মনে হ'ল—ভালবাসার আগুন জ্বলছে।

তাদের মুখমুদ্রা আচ্ছুরিত ছিল সিন্দূরের ছটায় ; আহা, সে মুদ্রা, সে ওষ্ঠাধর,—যেন অপ্রতিহতশাসন কন্দর্পের শাসন-শিলাপট্ট।

নাচতে নাচতে পণ্যবিলাসিনীরা এল।

এই পণ্যবিলাসিনীরা

দিবসে—কমলিনীর মত প্রফুল্লমুখী,
রাত্রে—কুমুদিনীর মত নিদ্রাহীনা।

তাদের ঘিরে আসতে লাগল শতশত নরেন্দ্র, সামন্ত, সচিব।

পণ্যবিলাসিনীরা নাচতে লাগল সেই রকমের নাচ,—

মেঘের গর্জ্জনে কণ্টকিত-তনু কেতকী যেমন ক'রে নাচে,—ফুলের রেণু ছড়িয়ে ছড়িয়ে ;
প্রীতি যেমন ক'রে নাচে, হৃদয়গুলিকে হরণ ক'রে নিয়ে,—গোপনে ;
গীতি যেমন ক'রে নাচে, অনুরাগের প্রদীপ জ্বালিয়ে,—স্বপনে ;
পুষ্টি যেমন ক'রে নাচে,—সৃষ্টি ক'রে আনন্দ।

আর সেই নাচের পিছনে পিছনে বাজতে লাগল বাদ্যযন্ত্র, সমের সঙ্গে সঙ্গে উঠল অনুত্তাল তানকের বাহার।

বাজতে লাগল মন্দ মন্দ যবাকৃতি মুরজ,
সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু বেণুর শিঞ্জান,
ঝল্লরী মন্দিরার ঝন্‌ঝনা ;

তড়্তড়্ ক'রে বেজে উঠল তন্ত্রী-পটহিক,
রিম্‌রিম্ ক'রে বেজে উঠল অলাবু-বীণের তরঙ্গ,
কন্‌খন্ ক'রে বেজে উঠল কাহল,—কাংস্য-কোশীর আঘাতে।

আর সেই তানককে অনুসরণ ক'রে পদে পদে উদ্বেলিত হয়ে উঠল অজস্র বিলাসিনীর ঝনঝনিত ভূষণের নিক্কণ,—সহৃদয় মানুষের মত; এবং কোকিল-সমান অজস্র বিটেদের কর্ণামৃত,—অশ্লীল রাসক-অভিনয়ের আখর-ভরা গান!

এ কি যে-সে নাচ!

এ সেই নৃত্য, যা—

মদ্যকেও মাতাল করে,
রঙীন ক'রে অনুরাগকে,
নন্দিত ক'রে আনন্দকে,
নৃত্যকেও নাচায়,
উৎসুক করে উৎসবকে।

আর এরা কি সাধারণ পণ্যবিলাসিনী!—আহা তা নয়, নয়। এদেরই প্রতীক সৃষ্টি ক'রে মুষ্টি-মুষ্টি কর্পূরের রেণু ছড়াতে ছড়াতে মানসিক রাজপথে রথ চালিয়ে ছুটে চ'লে যায় যৌবন;

এরাই হয়,—

সৌভাগ্যের শিশুক্রীড়া—বাচ্যবিবেকশূন্য—অবাচ্য-বিবেকশূন্য;

এরাই হয়—

তরুণ মহোৎসবের প্রতিহারিণী, উদ্দাম পুষ্পদাম দিয়ে আঘাত দেয় তরুণদের;

এরাই হয়—

কামরূপী চন্দনদ্রুমের চঞ্চল-পত্র-কুণ্ডলা নৃত্যপরা লতিকা;

এরাই হয়,—

শৃঙ্গার-সমুদ্রের ঘুঙ্‌ঘুর-ঘন ঢেউ।

আবার কোথাও দেখা গেল, রাজমহিষীরাও মত্ত হয়ে উঠেছেন নৃত্যবিলাসে। তাঁদের চতুর্দ্দিকে অন্তরাল রচনা ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেত্রবতীরা ;—বেত্র-বিত্রাসিত হয়ে স'রে পড়েছে জনতা,—আর রাজমহিষীরা নাচছেন। শুভ্র রাজছত্রের অরণ্যের ছায়ায় কী বিমোহন সেই নর্ত্তন! এ যেন কল্পতরুর তলদেশে বনদেবীদের বিচরণ।

নৃত্যের ভঙ্গীগুলিতে ফুটে উঠতে লাগল এক-একখানি চিত্র।—

মহিষীরা নাচছেন, আর স্কন্ধের উভয়-পালী থেকে লম্বমান হয়ে বাতাসে উড়ছে তাঁদের ওড়না। বাহুপাশ দিয়ে সেই উড়ন্ত ওড়নার দুটি প্রান্ত ধ'রে যখন তাঁরা সমতালে নাচতে লাগলেন, তখন মনে হ'ল, এ বুঝি—দোলনাহীন এক লীলা-দোলন নৃত্য।

হঠাৎ মনে হ'ল, মহিষীরা দল বেঁধে কোকনৃত্যে মত্ত হয়েছেন ; সোনার কেয়ূরের সূক্ষ্ম কাজগুলিতে বিঁধে গিয়ে দোফালি হয়ে ছিঁড়ে যেতে লাগল রেশমের উত্তরী, আর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগতির ছন্দে চিত্র আঁকা হয়ে গেল,—স্রোতের-উত্তরে-ভেসে-যাওয়া চক্রবাকীর এক সীমন্তিত তরঙ্গের কম্পমান চিত্র।

চামরিণীরা চামরের শুভ্রতা দিয়ে বীজন করছিল একদল মহিষীকে। নাচতে নাচতে হঠাৎ দেখা গেল, চামরের সটায় আটকে গেছে মহিষীদের স্বর্ণবরণ ত্রিকণ্টক কর্ণাভরণ। বিলোল কটাক্ষ তাঁরা হানলেন। ভেসে উঠল আকর্ষ-নৃত্যের ভঙ্গী। চিত্র!—সরসীতে নীলপদ্মের কাননখানিকে আকর্ষণ করল যেন রাজহংসের শুভ্রায়িত শ্রেণী!

যখন নৃত্যশীলা মহিষীদের চঞ্চল চরণ থেকে ঝ'রে পড়তে লাগল আল্‌তা-রঙীন স্বেদের কণিকা, এবং সিঞ্চন-মহিমায় অরুণ ক'রে দিল ভবনহংসদের শ্বেতিমা, তখন মনে হ'ল শরৎকালের একখানি কৌমুদী রজনী যেন নাচ আরম্ভ করেছে, আর সন্ধ্যারাগে রাঙা হয়ে উঠেছে শত সহস্র চাঁদ।

আবার এরই মধ্যে কঞ্চুকীদের সর্ব্বনেশে দুর্দ্দশা দেখে, কামবাগুরার মত হস্তপ্রসার-নৃত্যের মধ্যেও মহিষীদের ভুরু-কোঁচকানো হাসি আর থামে না। দেখ, কী ভয়ঙ্কর মুখ করেছে কঞ্চুকী! মুয়ে পড়েছে গো, মুয়ে পড়েছে—কোমর থেকে সোনার কাঞ্চী খুলে গেছে ;—অতগুলো কি একসঙ্গে চাপাতে হয় কঞ্চুকীর কণ্ঠে!

বর্ণনার অন্ত থাকে না যদি দিতে হয়, সেই আনন্দিত দিনখানির একখানি পূর্ণ বর্ণনা। এই ব'লেই শেষ করব—সেই দিনে

পৃথিবী রঙীন হয়ে উঠেছিল নৃত্যময় স্ত্রীরাজ্যের আল্‌তার আরুণ্যে,
মঙ্গল-কলস-ময় হয়েছিল মহোৎসব-স্তনমণ্ডলের উল্লাসে,
কৃষ্ণসার-ময় হয়েছিল বাসর—চঞ্চলচক্ষুর অংশুতে!

ভুজলতার বিক্ষেপে কে যেন জীবজনতার মণিবন্ধে পরিয়ে দিয়েছিল মৃণালের বলয়; বিলাস-হাসির বিকীরণে কে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দিয়েছিল কালের স্নায়ুতে; উৎক্ষিপ্ত হস্তকিসলয়ের দাক্ষিণ্যে কে যেন সৃষ্টিকে দান করেছিল পদ্ম-প্রসূনতা।

আহা, সে দিনের সেই রৌদ্র!—টিয়েপাখীর পুচ্ছের মত সেই রৌদ্র! তরুণী বিলাসিনীদের কর্ণপুরের শিরীষ-ফুলের তোড়ায় নবপান্নার মায়ায়-ভরা সেই রৌদ্র!

আহা, সে দিনের সেই আকাশ! নীল, ঘন নীল! সহস্র মোহিনীর, সহস্র কবরীর, সৌন্দর্য্য-সহোদর তমালপল্লবের মত নীল, ঘন নীল! আহা, সে দিনের সেই সূর্য্যের কিরণের লেখা! মাণিক্য, শুধু মাণিক্য, তার ইন্দ্রধনুর জ্যোতিতে—যেন চাষ-পাখীর পাখার লীলা! দেখে নিও! মায়া নয়! নূপুর প'রে নাচছে যেন দিক্‌ময়ূরী; তার প্রতিধ্বনি,—ঝঙ্কৃত আভরণের নিবেদন।

বিশেষ্যেরও বিশেষণ দিতে হয়—লঘুপুষ্ট!

যারা বৃদ্ধ তারাও নাচছিল—যেন উন্মাদিনী। যারা বর্ষবিপুল, তারাও নির্লজ্জ;—যেন ভূতে-পাওয়া। যারা পণ্ডিত তারাও বেভুল, যেন প্রমত্ত আত্মা। মুনিদের সঙ্ঘ, তারাও নৃত্যগ্রহ,—তাঁদেরও মন কাঁপল। যিনি নরপতি,—প্রজাদের পরম-নিদানী, তিনিও দান ক'রে দিলেন তাঁর সর্ব্বস্ব।

রাজ্যধনের সঞ্চয়! কুবেরের কোষ যেন লুট ক'রে নিল প্রজাদের পুণ্য আগ্রহ!

শেষ হয়ে গেল জন্ম-মহোৎসব, কিন্তু পদক্রমের বিরাম নেই কালের
দেখতে দেখতে বাড়তে লাগল শিশু-হর্ষ।

হর্ষের মাথায় যখন নিহিত হ'ল রক্ষাসর্ষপ, তখন সকলে নির্ব্বাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। এ কি রক্ষাসর্ষপ, না জ্বলন্ত প্রতাপের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ?
হর্ষের দেহে যখন অঙ্গরাগ করা হ'ল গোরোচনার পিঙ্গলতা দিয়ে, তখন স্মারচক্ষে সকলে দেখলে এক—সহজাত ক্ষাত্রতেজের স্বয়ম্ভু-প্রকাশ !

ঘুরঘুর ক'রে ট'লে ট'লে বাড়তে লাগল শিশু হর্ষ ; তার কণ্ঠের আধ আধ ভাষায়
যেন সত্যের ওঁকারের সঞ্চয়।
আর,—ছোট্ট গ্রীবাটিকে বেষ্টন ক'রে ঐ যে চিকিয়ে উঠছে সোনা-দিয়ে বাঁধানো বাঘনখের সারি,—
তারা যেন তাঁর হৃদয়মৃত্তিকায় দর্প-পুষ্পের অঙ্কুর।
কচি কচি মূঢ় হাসির কুসুমগুলি ধীরে ধীরে আকর্ষণ করতে লাগল,—বন্ধুদের মৌমাছির মত মন ;
আর,—দেখতে দেখতে জননীর পয়োধরের নিষেক পেয়ে শ্রীমুখে জন্ম নিতে এল বিলাসহাসির অঙ্কুরের মত ছোট্ট ছোট্ট দাঁত।

অন্তঃপুরের পুরন্ধ্রীরা তাঁকে পালন করতে লাগলেন
—যেন চারিত্র,
অমাত্যেরা রক্ষা করতে লাগলেন,
—যেন মন্ত্র,
শিশু কুলপুত্রেরা তাঁকে স্বীকার করতে লাগলেন
—যেন সৌজন্য,
এবং আত্মবংশীয়েরা সম্বর্ধন করতে লাগলেন
—যেন যশঃ।
রক্ষিপুরুষদের শস্ত্রপঞ্জরের মধ্যে এই নূতন সিংহশাবক হর্ষ,—যখন ধাত্রীর অঙ্গুলিধারণ ক'রে মাত্র পাঁচ কি ছয়ে পা দিয়েছেন এবং রাজ্যবর্দ্ধন অবতরণ করেছেন ষষ্ঠে, তখন দেবী যশোবতীর গর্ভে নেমে এলেন দেবী রাজ্যশ্রী।

প্রসবকাল পূর্ণ হ'ল।

যশোবতী প্রসব করলেন রাজ্যশ্রীকে,—

মেনা যেমন প্রসব করেছিলেন ভূভৃৎ-অভ্যর্থিতা গৌরীকে,

শচী যেমন,—সহস্রনেত্র-দর্শনযোগ্যা জয়ন্তীকে,

প্রতিপৎ যেমন—বিশ্বনয়নানন্দদায়িনী চন্দ্রলেখাকে।

রাঙা রাঙা গা, চোখের রাঙা রাঙা কোণা নিয়ে, সরসীতে উৎপলিনীর মত ফুটে উঠল রাজ্যশ্রী ;—বর্ষাদেবী যেন জন্ম দিয়ে গেলেন হংসমধুস্বরা শরৎকে।

মাতা যশোবতীর দুটি পুত্রের মত দুটি স্তনমণ্ডলের উপরে বিরাজ করতে লাগল রাজ্যশ্রী—

যেন একখানি একাবলী মুক্তাময়ী মালিকা।

দিন যায়। একদা—

দেবী যশোবতীর ভ্রাতা তাঁর আট বছরের পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজপ্রাসাদে।

পুত্রের নাম "ভণ্ডি"।

ভারি সুন্দর তাকে দেখতে।

তার মাথার কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো কাকপক্ষক আর শিখণ্ডবাঁধা কী সুন্দর চুল! মনে হ'ল, শ্রীমদন আবার বুঝি জন্ম নিয়ে এসেছেন আর তাঁর মাথায় লেগে রয়েছে খণ্ডপরশুর হুঙ্কার—অনলের ধূমলেখা। এক কানে ইন্দ্রনীলমণির কুণ্ডল এবং অন্য কানে মুক্তাফলের ত্রিকণ্টক। আভরণের প্রভা স্মৃতি জাগায় শ্যামল হরির আর শুভ্র হরের।

তার পীনপ্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত ছিল পুষ্পলোহ-মণির বলয় ; এবং কণ্ঠে সূত্র-গ্রথিত ছিল প্রবালের বঙ্কিম অঙ্কুর,

—যেন হিরণ্যকশিপুর সিংহ-নখ।

এই সুন্দর পুত্রটিকে, 'ভণ্ডি'কে—বীর্য্যক্রমের এই সিদ্ধদৃপ্ত শিশুবীজটিকে তুলে দেওয়া হ'ল রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের হাতে।

ভণ্ডি হ'ল কুমারদের অনুচর।

মহারাজেরও বড় ভাল লাগল ভঙ্গিকে। তার উপর তাঁর পুত্র-দৃষ্টি পড়ল—ত্রৈণায়নিক।

মধু এবং মাধবের মত আমাদের দুটি রাজকুমার মলয়মারুতের মত এই অনুচরটিকে লাভ ক'রে আনন্দে হ'ল আটাশখানা।

দেখতে দেখতে—
প্রজাদের আনন্দের সঙ্গে বাড়তে বাড়তে,
এই দুটি রাজকুমার পৌঁছে গেলেন জীর্ণ কৈশোরে,
যার চরমপ্রান্তে—
নেচে ওঠে যৌবন
প্রকোষ্ঠ হয় পৃথু
উরুস্তম্ভ স্থির
অর্গলসম বাহু
উরঃকবাট বিপুল, এবং
প্রাংশুশালের মত অভিরাম দেহোন্নতি।
তাঁরা হলেন জনগণের আশ্রয়-ক্ষম,
যেমন হয়—মহানগরের সন্নিবেশ।

অনাবিলমাধুর্য্যে প্রকাশ পেতে লাগলেন রাজ্যবর্দ্ধন এবং হর্ষবর্দ্ধন-
যেমন ক'রে প্রকাশ পায়, চন্দ্র এবং সূর্য্য,—
জ্যোৎস্নার যশঃ এবং রৌদ্রের প্রতাপ ছড়িয়ে;
যেমন ক'রে প্রকাশ পায়, অগ্নি এবং মরুৎ—
একীভূত তেজ এবং শৌর্য্যের অভিব্যক্তিতে;
যেমন ক'রে প্রকাশ পায়, হিমাচল এবং বিন্ধ্য—
বিপুল কায়বন্ধে এবং শিলাকাঠিন্যে।

তেজস্বীদের উদয় এবং অস্ত-সম্পাদনে তাঁরা সমর্থ হয়ে উঠলেন—পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিক্‌বিভাগের মত। বেলা-গলা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আঙিনায় তাদের অভিমান যেন আর ধরে না!

কী তাঁদের স্বাধীনতা, মুক্তির জ্ঞান!

তাঁরা ঘৃণা করতেন নিজেদের তেজ-দীনা ছায়াকে;

লজ্জিত হতেন পদনখ-লগ্ন স্বকীয় প্রতিবিম্বে;

দুঃখ অনুভব করতেন নিজেদের কেশকলাপের বিনতিতে।

দ্বিতীয় রাজছত্রের মত তাঁদের চূড়ার শিখরে ঐ যে মণি জ্বলছে

—সেটি ক্ষুণ্ণতা আনত তাঁদের একচ্ছত্রত্বের অভিমানে।

কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে আরতির সময় পূজারীদের কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হ'ত

"স্বামী"—শব্দ, তখন অসুখী হ'ত কর্ণ।

দূয়মান হ'ত হৃদয়,—দর্পণের মধ্যে আত্মীক প্রতিপুরুষের দর্শনে।

একদিন মন্দিরে পূজার সময় সন্ধ্যাঞ্জলি রচনা করছেন দুজনে,—কী যেন কি

মনে হ'ল—শূলের মত খাড়া হয়ে রইল শির,—নুইল না।

একদিন ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষায় ব্রতী ছিলেন দুজনে;—এমন সময় আকাশের

মেঘে মেঘে হ'ল ইন্দ্রধনুর লীলা,—মড়্‌মড় ক'রে উঠল দুজনের হৃদয়।

একদিন কতকগুলি ক্ষিতিপালের আলেখ্য-চিত্র তাঁদের কাছে এসে পৌছল;

আলেখ্য প্রণাম করে না,—তাই যেন জ্বলে গেল তাঁদের চরণ।

হঠাৎ একদিন মনে হ'ল—ভগবান সূর্য্যদেবের তেজশক্তি মণ্ডলের পরিমিতির মধ্যে সন্তুষ্ট! অমনি চিত্তে জাগল এক অবহুমানের ভাব।

অদ্ভুত এঁদের মন।—

যাঁরা সজ্জন, যাঁরা সাধু, তাঁদের জন্য মনের মণিকোঠায় রাখা থাকত অসেবিত-প্রসন্নতা, মধু ঝরত মুখে; যে রাজবংশ দুষ্ট এবং অবাধ্য, দূরস্থিত হ'লেও তাদের মলিন ক'রে দিত এঁদের উষ্মা।

প্রতিদিন শস্ত্রাভ্যাসের শ্যামিকায় কলঙ্কিত হ'ত এঁদের করতল,—নিখিল

নৃপসঙ্ঘের প্রতাপাগ্নির নির্ব্বাণ-ম্লান যেন করতল।

অস্ত্রশিক্ষার সময়ে এঁদের ধনুকের টঙ্কারটিকে মনে হ'ত—যেন উপভোগদীনা
দিক্‌বধূদের সুখসমুখ আলাপ।
এইরকম ক'রে বিকশিত হতে লাগল দুটি রাজকুমার।
পৃথিবীর সমগ্রতায় প্রকাশ পেতে লাগল দুটি শব্দসঞ্চয় "রাজ্যবর্দ্ধন, ঐ হর্ষবর্দ্ধন।"

একদা সমাপ্ত হয়ে গেছে মহারাজের আহার, অন্তঃপুরে রয়েছেন পিতৃদেব, এমন সময় আহূত হলেন দুই রাজকুমার।
পাশে বসিয়ে সস্নেহে পিতৃদেব তাঁদের বললেন,

"রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, তোমাদের ডেকেছি কিছু উপদেশ দেবার উদ্দেশ্যে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নূতন এক পরিচয়ের সঙ্কেত। তোমরা তো জানই রাজনীতির সর্ব্বপ্রথমে প্রধান হচ্ছে রাজ্যাঙ্গ ;—যেমন রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, ধনাগার, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং সেনা। কিন্তু আদেশ পালন করবার মত যোগ্য কর্ম্মবীর ভৃত্য অনেক কষ্টে পাওয়া যায়। সদ্ভর্ত্তা সুলভ, কিন্তু সদ্ভৃত্য দুর্লভ। পরমাণুদের সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে এই সব ক্ষুদ্র ভৃত্যদের ; সমবায়-সম্পর্কে যেমন অণুগুলি গ'ড়ে তোলে পার্থিব দ্রব্য, তেমনি ভৃত্যেরাও রাজার সঙ্গে মেলামেশার সুবিধা লাভ ক'রে এবং তাঁর ছন্দানুবর্ত্তী হয়ে গ'ড়ে তোলে নিজেদের পার্থিব ঐশ্বর্য্য।

এই সব নষ্ট কর্ম্মচারীদের হাতে প'ড়ে ধীরে ধীরে নাচতে থাকেন রাজারা পেখম-ধরা ময়ূরের মত। এই সব পল্লবিকেরা নিজেদের নীচ প্রকৃতিটিকে তাঁদের মধ্যে সংক্রামিত ক'রে দেয়—যেমন দর্পণে। এই সব লোভী শঠেদের দল তাঁদের মধ্যে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে দেয়—মিথ্যাদর্শন দিয়ে, অসদ্বুদ্ধি জাগিয়ে। যদি এদের উপর দৃষ্টি না রাখা যায়, তা হ'লে তারা নাচগান হাসিমস্করার আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে বিকারবায়ুগ্রস্ত ক'রে তোলে রাজাদের, পাগল ক'রে দেয়। যতই না কেন এদের মুখে রস ঢাল, চাতকদের মত এদের নিত্য লেগে থাকবে তৃষ্ণা। তোমাদের মানসসরোবরের ঝক্‌ঝকে বাসনাগুলোকে এরা বুঝে নেয়, যেমন ধূর্ত্ত জেলেরা বুঝতে পারে চক্‌চকে ফরফরে মাছদের।
এই সব আকাশ-ফাটানোর দল আকাশে যম-পট আঁকে, না-কে করে হ্যাঁ।
শেষ পর্য্যন্ত মেটে না এদের চাহিদা—হৃদয়ে শল্যের মত বিঁধে থাকে।

সেইজন্যেই আমি চিন্তান্বিত হয়ে, অবসানে, তোমাদের সাহচর্য্যের জন্যে কুমারগুপ্ত আর মাধবগুপ্তকে নির্দ্দেশ দিয়েছি। মনে রেখো, তারা আমার দুখানি বাহুর মত দেহের সামিল। মালবরাজার তারা দুটি পুত্র। ভাই ভাই। নম্র, শুচি, সাহসী, বিদ্বান, নিষ্কলঙ্ক। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ভয়—এই চার উপধায় তারা পরীক্ষিত। দেখ, এদের সঙ্গে তোমাদের ব্যবহার যেন সাধারণ পরিচজনদের মত না হয়।"

এই পর্য্যন্ত বলে মহারাজ আদেশ দিলেন প্রতীহারকে—"কুমারগুপ্ত, মাধবগুপ্তকে আহ্বান কর।"

দ্বারদেশে নিহিত হয়ে রইল রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের চারিটি নয়ন।

তাঁরা দেখতে পেলেন প্রতীহারের সঙ্গে ধীর-পদক্ষেপে প্রথমে কক্ষে প্রবেশ করলেন অষ্টাদশবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ কুমারগুপ্ত।

বেশি উঁচু তিনি নন, খর্ব্বও বলা চলে না। কী তাঁর পদান্যাসের গুরুত্ব! শতশতরাজচরণ-চঞ্চলা পৃথিবী কেমন যেন নিশ্চল হয়ে গেল!

দীর্ঘ ভুজযুগলের নিভৃতললিত বিক্ষেপের মাধুর্য্য ছড়িয়ে যখন তিনি প্রবেশ করলেন রাজকক্ষে, তখন মনে হ'ল—কে যেন সুদুস্তর যৌবনসমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে আসছে।

কটিদেশ ক্ষীণ।

বক্ষস্থল অতিবিপুল; যেন সেই বিস্তীর্ণ অবকাশে স্থান পেয়ে সুখী হয়ে গেছে স্বামি-সম্ভাবনার অপরিমিতি।

উরুদ্বয় মাংসমেদুর; লঙ্ঘনক্রীড়ার অবিশ্রান্ত অভ্যাসে স্ফীত ও কঠিন; এবং জানুগ্রন্থির ঔদ্ধত্যটিকে আহরণ ক'রে সেই উরুযুগ থেকে নির্গত হচ্ছিল ক্রমতনু জঙ্ঘাকাণ্ডের সৌন্দর্য্য।

কিণাঙ্কিত পীবর প্রকোষ্ঠ; প্রতাপাগ্নির শিখাপল্লবের মত সেখানে ফুটে উঠেছে বামবলয়ের মাণিক্যমরীচির মঞ্জরী-জাল।

সমুন্নত অংসতটের উপর কর্ণাভরণমণির স্বল্পারুণ আভা; ক্ষাত্রব্রত ধারণের উদ্দেশ্যে কুমারগুপ্ত কি স্কন্ধের উপর স্থাপন করেছেন রুরুমৃগের ঈষদারুণ চর্ম্ম?

চন্দ্রমার মত সুন্দর তাঁর মুখ; কেয়ূরের সূক্ষ্মপত্রাঙ্কিত পুত্রিকার প্রতিবিম্ব
পড়েছিল কপোলভিত্তিতে; ভ্রান্তি আসে;—চাঁদ বুঝি রোহিণীকে
বন্দী ক'রে রেখেছেন হৃদয়ে।
অধোমুখী নয়ন দুটিতে অচপল ভঙ্গি; লক্ষ্মীলাভের আশায় মুখ তুলে থাকে
যে পথের বনানী, সেই লোভী বনানীকে যেন বিনয় শেখাবার ইঙ্গিত
ছিল সেই ভঙ্গিতে।
স্বামি-অনুরাগের বর্ণোপমা জাগিয়ে চূড়ার শিখরে দুলছিল অরুণবরণ
অম্লাতকফুলের ঐশ্বর্য্য।
তিনি যেন একটি বিকশিতা নম্রতার বিগ্রহ;
সংযমের এবং তেজস্বিতার, শীলের এবং সৌভাগ্যের মূর্ত্তিগ্রহ প্রসাদ;
মুহূর্ত্তের দর্শনদানে জনতাকে যেন ক্রয় ক'রে নিয়ে, পরমুহূর্ত্তে বিক্রয় ক'রে দিতে
পারেন অনাবিল আনন্দের করপদ্মে।

কুমারগুপ্তের প্রবেশের পরেই তাঁরা দেখলেন প্রবেশ করছেন মাধবগুপ্ত।
বয়সে ছোট হ'লে হবে কি! অতিপ্রাংশু।
বর্ণের গৌরী উজ্জ্বলতা তাঁকে রূপান্তরিত করেছিল মনঃশিলার একটি
চলন্ত শৈলে।
যশের শিরশ্চুম্বনের মত মাথায় আহিত ছিল অগার্ব্বিত মালতীফুলের
শেখরমাল্য।
জোড়াভুরুর কী অপূর্ব্ব মহিমা! ভাষাহীন ভাষায় যেন চিহ্নিত ক'রে
দিচ্ছিল নিসর্গবিরোধী বিনয় এবং যৌবনের প্রাথমিক মিলন।
আর তাঁর বক্ষদেশ! হারদোলা তাঁর বক্ষদেশ! শ্বেতচন্দনের যেন আনন্দপীঠ!
যেন অনন্ত সামন্তদের সংক্রান্তি-শ্রান্তা লক্ষ্মীদেবীর চন্দ্রকান্তমণির
শিলাশয়ন!

অদ্ভুত মৃগয়াবিৎ ছিলেন এই মাধবগুপ্ত।
তাই বোধ হয় একদা এক শিকার-শেষে ভীত হয়ে তাঁকে উৎকোচ দিয়ে
গিয়েছিল

কুরঙ্গেরা — তাদের নয়ন-সৌন্দর্য্য,
বরাহেরা — তাদের নাসার খড়্গতা,
মহিষেরা — তাদের স্কন্ধপীঠ,
ব্যাঘ্রেরা — প্রকোষ্ঠবন্ধ,
কেশরীরা — পরাক্রম,
এবং মাতাল হস্তী — তার গতিরাগের ছন্দ।

প্রবেশ ক'রেই কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত দূর থেকেই ভূমিস্পর্শ পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করলেন মহারাজকে।

তারপরে ধীরে ধীরে সেই আসনে উপবেশন করলেন, যেটিকে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিল মহারাজের স্নিগ্ধদৃষ্টি।

ক্ষণকাল পরে আদেশ এল মহারাজের,—

"আজ থেকে তোমরা দুজনে কুমারদের অনুবর্ত্তন করবে।"

"মহারাজের আদেশ শিরোধৃত"—এই ব'লে দোলায়মান মৌলি দিয়ে মেদিনী স্পর্শ ক'রে ধীরে তাঁরা প্রণাম করলেন রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনকে। রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন তারপরে পিতৃদেবকে করলেন প্রণাম।

সেই দিন হ'ল সূত্রপাত; তারপর চিরদিনের তরে কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত মহারাজকুমারদের রাত্রিদিনের অঙ্গসহচর হয়ে রইলেন;—

যেমন হয় — দেহের দুখানি বাহু,
যেমন হয় — নিমেষ আর উন্মেষ,
যেমন হয় — উচ্ছ্বাস আর নিঃশ্বাস।

দেখতে দেখতে রাজ্যশ্রী বাড়তে লাগলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিচিতিও বাড়তে লাগল প্রতিদিন,—

নৃত্যগীতবাদিত্রাদির সঙ্গে,
সখীদের শিক্ষিতপটুত্বের সঙ্গে,
কলাবিদ্যার সার্ব্বজনীনতার সঙ্গে।

দেখতে দেখতে রাজ্যশ্রী পৌঁছে গেলেন যৌবনে—পরিমিত-দিবসের দাক্ষিণ্যেই।

তাঁর উপর দৃষ্টি পড়ল,—অনন্ত রাজাদের ;—
যেমন লক্ষ্যে দৃষ্টি পড়ে শরের।
দেশদেশান্তর থেকে দূত আসতে লাগল—
রাজ্যশ্রী হলেন তাদের নিবেদনের প্রার্থনা।

অন্তঃপুরের প্রাসাদের প্রসন্নতায় একদা বিশ্রাম করছিলেন মহারাজ—এমন সময় তিনি ক্ষুণ্ণবিস্ময়ে শুনতে পেলেন, বাহিরের একটি কক্ষে কোনও রাজপুরুষ আর্য্যাচ্ছন্দে রচিত—একখানি গান আপনমনে গেয়ে চলেছেন—

"বিবর্দ্ধমানা সুতা পিতাকে উদ্বেগ-মহাবর্ত্তে পাতিত করে ; যেমন বর্ষার পয়োধর-উন্নতির কালে, তটকে উদ্বেজিত করে নদী।"

স্বপ্রস্তাব-আগত এই গানখানিকে মহারাজ সম্পূর্ণ শুনলেন। অবসানে পরিজনদের উৎসারিত ক'রে পার্শ্বস্থিতা মহাদেবীকে বললেন—

"দেবি, দেখতে দেখতে আমাদের মেয়েটি—রাজ্যশ্রী—তরুণী হয়ে উঠল। তার গুণগুলির কথা হৃদয় থেকে নামাতে পারি না ; তেমনি নামাতে পারি না ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা।

মেয়ের যৌবনের সূত্রপাত ইন্ধন হয়ে ওঠে পিতার সন্তাপ-আগুনে।

কে যে সৃষ্টি করেছে এই ধর্ম্ম, এই আচার,—কে জানে ; কিন্তু আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না এই ধর্ম্ম। যাকে এতদিন ধ'রে কোলে কোলে লালন করলুম, যে এতদিন মিশিয়ে ছিল এই দেহে, যাকে একটু ভুল ক'রেও ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় না, হঠাৎ, তাকেই একদা এক গোধূলি-লগ্নে অপরিচয়ের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অসংস্তুত কোনও এক অনামা নিয়ে চ'লে যাবে ; আর এক-মুহূর্ত্তে সে হয়ে যাবে তার অতিনিকট আত্মীয়। একেই বলে সংসার আর সংসারের অঙ্কন-স্থান।

ভেদ আছে কি পুত্র আর কন্যার লালন-পালনে ? কিন্তু কন্যা জন্ম নিলেই দেখা যায় কষ্ট পাচ্ছে সাধারণ বাপ-মায়ের মন। বড় নির্ম্মম এই ব্যথার দাহ-শক্তি।

এইজন্যেই বোধ হয় সাধুপুরুষেরা কন্যার জন্মকালেই তর্পণ দেন চোখের জলের। এই দুঃখের ভয়েই বোধ হয়,—বোধ হয় এই নির্ম্মম সংসার-নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই; মুনিঋষিরা দারপরিগ্রহ করেন না, গৃহবসতি পরিত্যাগ করেন,

বরণ ক'রে নেন অরণ্যের শূন্যতা। সচেতন সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে কি সইতে দেখেছ—অপত্যদের এই পরিণাম, এই নিদারুণ বিরহ ?

বরপক্ষীয়দের কাছ থেকে একটি একটি ক'রে দূত এসে উপস্থিত হয়, আর মনের মধ্যে এসে প্রবেশ করে এক-একটি লজ্জাশীলা হতভাগিনী চিন্তা। কি করি! তবুও দেখেছি, লোকবৃত্তির অনুসরণ করা ছাড়া গৃহস্থদের গত্যন্তর নেই। পাত্রের লক্ষগুণ থাকলেও বুদ্ধিমান গৃহস্থেরা প্রথমেই দেখেন তার বংশ, অভিজনতা!

ধরণীধরদের মধ্যে, আশা করি, তুমি নাম শুনেছ মৌখরীবংশের। সে বংশ ধরণীধরদের মূর্দ্ধ্নায় যেন মহেশ্বরের পদন্যাস। নমস্য। সেই বংশের তিলক, অবন্তীবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র গৃহবর্ম্মা, রাজ্যশ্রীকে প্রার্থনা ক'রে দূত পাঠিয়েছে। গ্রহবর্ম্মার কথা আর কি বলব,—সে যেন পৃথিবীতে হঠাৎ-নেমে-আসা সূর্য্য, গ্রহপতি। তার পিতৃদেবের গুণগ্রামের সে পূর্ণ অধিকারী। দেবি, যদি আমার মতের সমর্থন করে তোমার মন, তা হ'লে আমার ইচ্ছা, গ্রহবর্ম্মার হাতে সঁপে দি আমার রাজ্যশ্রীকে।"

চোখে জল ভ'রে এল দেবী যশোবতীর ;
স্নেহকাতর মন মেয়ের বিবাহের কথা শুনে আরও কাতর হয়ে পড়ল। তিনি বললেন—

"আর্য্যপুত্র, মেয়েদের আমরা মা। তাদের শুধু লালন-পালন নিয়েই আমাদের বিধি-ব্যবস্থা। ধাত্রী-নির্ব্বিশেষ। কন্যা-সম্প্রদান-ব্যাপারে পিতাই হচ্ছেন সর্ব্বশেষ কথা। দেখ, ছেলের চেয়েও মেয়ের জন্যেই বেশী কেঁদে ওঠে মায়ের মন। কেন জানো? ওরা বড়ই কৃপার পাত্র। তাই এই পার্থক্য।

আর্য্যপুত্র, তুমি এইটুকু শুধু দেখো, রাজ্যশ্রী যেন সারা জীবন আমাদের দুঃখের কারণ না হয়ে থাকে।"

মহারাজের সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল। পুত্রদ্বয়কে নিকটে আহ্বান ক'রে সানন্দে জানিয়ে দিলেন দুহিতৃ-দান সম্বন্ধে তিনি যা স্থির করেছেন।

পাত্র গ্রহবর্ম্মার পক্ষ থেকে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য পূর্ব্বেই রাজধানীতে যে প্রধান দূতপুরুষ এসোছলেন, তাঁর করপদ্মে শোভন একটি দিবসে সর্ব্ব-রাজকুলের সমক্ষে ঢেলে দেওয়া হ'ল দুহিতৃদান-জল। প্রধান দূতপুরুষ কৃতার্থ হয়ে গভীর আনন্দে প্রস্থান করলেন অবন্তীবর্ম্মার দেশে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল বিবাহের দিন। সময়ের পরিণতির সঙ্গে কল্যাণ-রমণীয় উৎসব-মুখর হয়ে উঠল রাজকুল। উদ্দাম-দীয়মান তাম্বূল, পটবাস এবং পুষ্পের প্রচুর প্রসাধনে সুন্দর হ'ল পরিবেশ ; আনন্দ আর ধরে না।

খবর পাঠানো হয়েছিল দেশে বিদেশে। স্বদেশের নীড় ছেড়ে রাজধানীতে পৌঁছে গেল শিল্পীদের ভিড়। গ্রামে গ্রামে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলেন রাজপুরুষেরা। তাঁদের আদেশমত গ্রামীন্‌রা সমারোহ ক'রে ভারে ভারে বহন ক'রে নিয়ে এল উপকরণ-সম্ভার। অজস্র রাজ-দরবার থেকে আসতে লাগল কৌশলিকা। রাজদৌবারিকের বৃহৎ কার্য্য হয়ে দাঁড়ল—মহারাজের সম্মুখে ভেটগুলিকে নিয়ে গিয়ে দর্শানো। রাজবল্লভেরা হিম্‌সিম্‌ খেয়ে গেলেন ; নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গ যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সম্বর্দ্ধনায় কোনো ত্রুটি ঘটছে না তো ? —ব্যগ্র হয়ে, এই দেখতে দেখতে।

আনন্দের সঙ্গে খাটতে লাগল, কাজ ক'রে যেতে লাগল কর্ম্মীরা।

রগড় দেখ চর্ম্মকারদের! ওদের আনা হয়েছিল চামড়া দিয়ে মঙ্গলপটহ ছাইবার উদ্দেশ্যে ; কিন্তু মধু-মদের প্রসাদ পেয়ে ওরা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে ; কাজ শেষ ক'রে হাতের মুঠোর মধ্যে কাঠিগুলোকে ধ'রে, উল্লোল-উল্লাসে নৈপুণ্য দেখিয়ে ধন্‌ধন্‌ ক'রে বাজিয়ে চলেছে মঙ্গল-ঢাক।

ঐ দেখ রাজমজুরেরা! কী আনন্দে ওরা উদূখল, মুষল, শিল ইত্যাদি উপকরণগুলি মণ্ডন করছে, দিয়েছে পঞ্চাঙ্গুলের মঙ্গল-ছাপ্।

আবার ঐ দেখ, দিগ্‌দেশ থেকে ভাটেদের আবির্ভাবে যে সব ঘরগুলো ভ'রে গিয়েছিল—সেই সব ঘরগুলোতে কী সমারোহে প্রতিষ্ঠাপিত হয়ে যাচ্ছে দেবী ইন্দ্রাণীর কল্যাণময়ী মূর্ত্তি!

দ্রুত কাজ চলতে লাগল রাজপুরীতে।

শ্বেতকুসুম আর চন্দনবসনের সৎকার পেয়ে সূত্রধরেরা বিবাহবেদীতে সূত্রপাত আরম্ভ ক'রে দিল।

হাতে কূর্চ্চি, ঘাড়ে চূণের ডাবা, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তড়তড় উঠে যেতে লাগল মানুষেরা, সাদায় সাদা ক'রে দিল প্রাসাদ, প্রতোলীর উপরকার প্রাকার এবং তার শিখরগুলো।

দেখতে দেখতে কত যে কুসুম্ভফুলের বাঁক এল তার ঠিকানা নেই; তাদের মেড়ে, তারপর ধুয়ে যে লাল রঙের বন্যা ছুটল, সেই জলে রাঙা হয়ে গেল রাজপুরীর জনতার পদপল্লব।

হঠাৎ একদিন তরঙ্গ উঠল অঙ্গনে,—মাতঙ্গ আর তুরঙ্গের; উদ্দেশ্য,—কোন্‌গুলি যৌতুকযোগ্য! সেগুলিকে বেছে নেওয়া হবে।

মকরমুখো প্রণালী দিয়ে ঝরঝর ক'রে ঝরতে লাগল গন্ধজল, শান্ত ক'রে দিয়ে ক্রীড়াবাপীদের তৃষ্ণা।

লগ্নের গুণাগুণ নিয়ে চমৎকারভাবে মেতে উঠলেন গণৎকারেরা।

অলিন্দে অলিন্দে ব'সে গেল হেমকারদের চক্র; সোনা পিটিয়ে জিনিস গড়ছে; গঠনের টাঙ্কার কি বাচাল!

আলেপক-রা বালুকা-কণ্টকের সঙ্গে বহল (আখের রস বা চন্দন) মিশিয়ে, সেই প্রলেপ দিয়ে তৈরি করতে লেগে গেল চিত্রাঙ্কনের জন্যে নূতন নূতন ভিত্তি।

চতুর চিত্রকরেরা জটলা বেঁধে লিখতে ব'সে গেল মঙ্গল-আলেখ্য।

সার বেঁধে ব'সে গেল লেপ্যকার, ভাস্করেরা; মাটি দিয়ে কেউ গড়ছে মূর্ত্তি, মীন, কূর্ম্ম, মকর; কেউ গড়ছে নারিকেল, কদলী আর সুপারীফলের ছোট্ট ছোট্ট গাছ।

রাজারাজড়াদেরও হাতের বিরাম নেই। তাঁরাও বিবাহের বিবিধ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। মহারাজ তাঁদের ভার দিয়েছেন। তাঁরা মেতে উঠলেন শোভাসম্পাদন-ব্যাপারে কোমর বেঁধে। তুললেন উদ্বাহ-বিতর্দ্দিকার স্তম্ভ, স্তম্ভের শিখরে বাঁধলেন আম্রপল্লব আর অশোকপল্লব, মেজে ঘ'সে মসৃণ ক'রে দিলেন বেদিকার সিন্দূরবরণ কুট্টিমভূমি, এবং স্তম্ভের মসৃণতায় আলিম্পনের সরসমাঙ্গল্য দিয়ে বিন্যাস ক'রে দিলেন অলক্তকের রক্তিমা।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরীতে প্রবেশ করতে লাগলেন—গণনায় সংখ্যান হয় না—সামন্ত-সীমন্তিনীরা, সতীরা, সুভগারা, সুরূপারা, সুবেশারা,—অবিধবাদের দল। আহা, তাদের ললাট! দেখবার জিনিস।

সিন্দূররজোরাজি-রাজিত কী সুন্দর তাদের ললাট!

তাঁদের মধ্যে একদল কর্ণে অমৃত বর্ষণ ক'রে গান করতে লাগলেন,—বধূ এবং বরের গোত্রগ্রহণগর্ভ মঙ্গলগীত;

একদল অনেক রকমের রঙে আল্‌তো-আল্‌তো ক'রে আঙুল ভিজিয়ে রাঙাতে লাগলেন গ্রীবাসূত্র;

এঁদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁরা বিশেষজ্ঞা; তাঁরা বিচিত্র পত্রলতা-কৃপাণের উপর কেমন ক'রে ছবি আঁকতে হয়, জানতেন। পারদর্শিতা দেখিয়ে তাঁরাও সামান্য কাজে নিজেদের নিয়োগ ক'রে দিলেন—যেমন অন্নপাত্র তৈরি, শ্বেতবরণ শীতল ঘট তৈরি, এবং তার উপর চিত্র-বিচিত্র কাজ তোলা ইত্যাদি।

আর একদল;—তাঁরা কেবল রঞ্জিত করতে লাগলেন অভিন্নপুট কার্পাস-তূলার পল্লব এবং বৈবাহিক কঙ্কণের উর্ণাসূত্রের সংনাহ।

আর একটি দল—

বলাশনা-ঘৃতে, ঘন ক'রে কুঙ্কুম-কল্কের মিশ্রাণ দিয়ে, অঙ্গরাগ তৈরি করতে লাগলেন; কত রকমের যে মুখলেপের কল্পনা,—তার ইয়ত্তা নেই। সবেতেই রয়েছে—লাবণ্যযোজনা।

আর একটি দল—

নিবিষ্ট মনে সাজিয়ে সাজিয়ে বিরচন করতে লাগলেন—লবঙ্গমালা। তাতে মেশানো হ'ল সুগন্ধি কক্কোল, গাঁথা হ'ল জৈত্রী জায়ফল, মালিকার মধ্যে মধ্যে খচিত হ'ল কর্পূরের স্ফীত-স্ফুরৎ-শোভা।

রাজকুলের ওদিকে দৃষ্টি ফেলতেই দর্শকনয়ন পুনর্ব্বার স্তম্ভিত হয়ে গেল নূতন ধরণের দৃশ্য দেখে।

অসংখ্য পৌরস্ত্রী।—

যাঁরা কাপড়-ছাপার কাজে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন—দেখা গেল, তাঁরা সহস্র সহস্র বস্ত্র চিত্রিত ক'রে ফেলে রেখেছেন; এবং বিরামহীন কর্ম্মদক্ষতায় আবার মন দিয়েছেন—চিত্রণে।

অন্তঃপুরের আচার-চতুরা বৃদ্ধাদের সকাশে পূজার প্রসন্নতা লাভ ক'রে
আনন্দিত রজক-সঙ্ঘ সহস্র সহস্র বস্ত্র রাঙিয়ে আবার রাঙাচ্ছে।

সেই সব রঙছাপা কাপড়ের দুটি পাড় ধ'রে সহস্র সহস্র পরিজনের সে কী ছায়া-কাপড়-শুকানোর নৃত্য!

সেই সব শুষ্কবসনের উপর, বাঁকা-আঁকা পংক্তির সারি টানা যে সব আশ্চর্য্য-সুন্দর বাহার-আঁকা জিনিস ছিল,—সে একটি দেখবার জিনিস। কুঙ্কুমের স্থাসক! এত দ্রুত, এত স্রুত, এত ঘটা!

হাতনাড়ানাড়িতে পরিচারকদের চিরে ফেটে যেতে লাগল ভঙ্গুর উত্তরীয়।

সেখানে কত রকমের যে বসন ছিল তার তালিকা দেওয়া কঠিন।

তবু বলি—

সেখানে ছিল ক্ষুমা, নীলিগাছের সৌরস; বদরা-কাপাস থেকে তৈরি বাদর বসন; মাকড়সার লালাতন্তু-জাত উত্তরবাস; অংশুক, নেত্রবাস;

এই বসনগুলি—

সর্পনির্মোকের মত চুড়িদার,
কচি কলাগাছের থোড়ের মত কোমল,
নিঃশ্বাস দিয়ে সেগুলিকে হরণ ক'রে নেওয়া যায়;
স্পর্শ করলে বোঝা যায়—
যে—আছে।

রাজকুলের এই অম্বর-অরণ্য খচিত হয়ে ছিল সহস্র সহস্র বর্ণমায়ার আচ্ছাদনে।

পালঙ্কের জন্যে—কত যে হংস-লাজ আস্তরণ তৈরি করা হচ্ছিল তার সংখ্যান নেই। কী উজ্জ্বল!—তারা-মুক্তা বসাবার কী অপূর্ব্ব নৈপুণ্য!

আবার দেখা গেল—

রাজকুলের আর একদিকে নবরঙ্গী দুকুলবাসের পটবিতান। প্রৌঢ়েরা চিরে ফেলেছে ফালি। মণ্ডপের মাথাগুলি স্তবরক-বস্ত্র দিয়ে ছাওয়া। এবং স্তম্ভগুলির বেষ্টনীতে উচ্চিত্র নেত্রপটের শোভা।

দেখতে দেখতে রাজকুল হয়ে উঠল উজ্জ্বল, রমণীয়; জাগাল ঔৎসুক্য, আনন্দ কল্যাণ।

দেবী যশোবতী আকুল হয়ে উঠলেন।

বিবাহের উৎসব-সমারোহ একক-যশোবতীকে রূপায়িত ক'রে দিল বহু-যশোবতীতে।

হৃদয়-যশোবতী রইল—মহারাজ-স্বামীর পাশে,
কুতূহলিনী-যশোবতী রইল—জামাতা সকাশে,
দুহিতার সকাশে রইলেন—স্নেহপরায়ণা যশোবতী।

আধারে পৌঁছে দিল এক-একটি গুণ।—

আদেশ তাঁকে পৌঁছে দিল—পরিজনে,
উপচার ... ... —নিমন্ত্রিত ললনায়,
শরীর ... ... —সর্বত্র-সঞ্চারণে,
চক্ষু ... ... —কৃত এবং অকৃতদর্শনে,
এবং আনন্দ ... ... —উৎসবিত মহিমায়।

সেখানে ছিল,

আজ্ঞাসম্পাদন-দক্ষ বহু পরিজন,
মুখেক্ষণপর অগণিত ভৃত্যের বাহুল্য।

তবুও মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন কুমারদ্বয়ের সঙ্গে স্বয়ং ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন কর্ম্ম-বাহুল্যে।

জামাতার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য উপর্য্যুপরি উষ্ট্র, বামী, ইত্যাদি পাঠানো, তাঁর একটি আনন্দিত-কৃত্য হয়ে দাঁড়াল।

দুহিতার জন্যে স্নেহে কাঁদছিল তাঁর প্রাণ।

বিবাহের দিন যতই এগিয়ে আসে—

ততই—

সৌভাগ্যবতীতে পূর্ণ হ'ল রাজকুল,
মঙ্গলময় হ'ল জীবলোক,
দিকে দিকে চারণের সঙ্ঘ,
পরিজনদের ভূষণিত ভ্রমণ,
পটহে পটহে অন্তরীক্ষ আকুল।
সকলেই বান্ধব,

কাল সদাসুখ,
লক্ষ্মীর পদ্মের মত
শ্রীমতীপদ্মার বিকশন।

তারপরে একদা সত্যই সমাগত হ'ল বিবাহদিবস।
দিবসটি ;—আনন্দের মূর্ত্তিধর,—রাজপথ দিয়ে পা ফেলতে ফেলতে চ'লে এল।—,
জন্মের যেন ফল,
সুখের যেন পুষ্পকোষ,
পুণ্যের যেন পরিণাম,
ঐশ্বর্য্যের যৌবন,
প্রীতির যৌবরাজ্য,
কামের সিদ্ধি।
এই বিবাহদিবসখানিকে যেন গণনা ক'রে নিয়ে এল জনতার অঙ্গুলি, যেন দেখতে লাগল সমুন্নত-শ্রী রাজমার্গের ধ্বজাগুলি, এবং মঙ্গলবাদ্যের প্রতিধ্বনিতে ভেসে এল তার আমন্ত্রণ।
এই বিবাহদিবসখানির কাছে পৌঁছেছিল কি মৌহূর্ত্তিকদের আহ্বান? পৌঁছেছিল কি জাতিহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণ? আলিঙ্গনের সমাদর পাঠিয়েছিল কি বধূ-সখীদের হৃদয়? নিশ্চয়ই। তাই তো এল এই মহাদিবস, প্রণাম করল মহাকালের নীতি।
সকাল হতে না হ'তেই দেখা গেল,
প্রতীহারেরা অনিবদ্ধ লোকদের উৎসারিত ক'রে দিয়ে সুখাবহ ক'রে তুলেছে রাজকুল।

মহারাজের কাছে প্রতীহার প্রবেশ ক'রে নিবেদন করল—
"দেব, জামাতার নিকট থেকে তাম্বুলদায়ক 'পারিজাতক' এসেছে, অপেক্ষা করছে রাজদ্বারে।"
এই ব'লে, নিজের মতই দেখতে একটি যুবাপুরুষকে মহারাজের দৃষ্টিপথে নিবেদন ক'রে দিল।

জামাতার কাছ থেকে এসেছে, সুতরাং তার মান্য অনেক; দূর থেকে প্রশ্রয় দেখিয়ে মহারাজ স্বয়ং জিজ্ঞাসা করলেন—

"বালক, কুশলে আছে তো গ্রহবর্ম্মা?"

মহারাজের কণ্ঠস্বরে বিগলিত হয়ে সেবাচতুর পারিজাতক কয়েক পা দ্রুত অগ্রসর হয়ে ভূমিস্পর্শ ক'রে নিবেদন করল—

"দেব, আপনার আজ্ঞাতেই তিনি কুশলে আছেন। আপনি গ্রহণ করুন তাঁর নমস্কৃতির অর্চ্চনা।"

এই নিবেদনে জামাতার শুভাগমনের সঙ্কেত প্রণিধান ক'রে মহারাজ তাকে বললেন—

"সংবাদ দিও; রাত্রির প্রথমযামে বিবাহ-কাল, অত্যয়-কৃত দোষ যেন না ঘটে।"

বিদায় নিল পারিজাতক।

দেখতে দেখতে—

অবসানে ঢ'লে পড়ল বাসর—

বধূ রাজ্যশ্রীর মুখে সঞ্চারিত ক'রে দিয়ে,

কমলবনের লক্ষ্মী-শ্রী।

অস্তসূর্য্য রাঙা হয়ে উঠল—

বিবাহের দিবস-লক্ষ্মীর চরণের পল্লবের মত।

নববধূ ও নববরের অনুরাগের আভাস পেয়ে, নিজেদের ভালবাসাকে মনে হ'ল লঘু;—তাই লজ্জায়,—নদীর এপারে আর ওপারে চ'লে গেল চক্রবাক-দম্পতি।

আকাশ-গাত্রের রঙখানি হ'ল রাঙা কাপড়ের মত সুকোমল: তার উপর স্ফুরিত হতে লাগল সন্ধ্যারাগ—যেন সৌভাগ্যের কেতন।

বরযাত্রীদের শুভাগমনে যে ধূলো উঠল রাজপথে, সেই ধূলির মতই ধীর-পদ-সঞ্চারে এল—

কপোত-কণ্ঠ-কর্বুর

তিমির।

"লগ্ন এসেছে, লগ্ন এসেছে"—তাই যেন সাজগোজ ক'রে সাড়ম্বরে উঠে পড়লেন জ্যোতির্গণ।

উদয়শিখরে দেখা দিলেন চন্দ্রদেব,—বিবাহের যেন মঙ্গলঘট—শরাব দিয়ে ঢাকা তাঁর শুভ্রশ্রী।

তারপরে দেখতে দেখতে, বধূ-রাজ্যশ্রীর মুখলাবণ্যের জ্যোৎস্না লেগেই যেন ধীরে বিলীন হয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকার।

গ্রহবর্ম্মা এলেন ;—

অমনি কুমুদফুলের বন, চাঁদের দিকে মুখ তুলে উপহাস ক'রে ব'লে উঠল, "ও চাঁদ, বৃথাই তোমার উদয়।"

গ্রহবর্ম্মা এলেন ;—

ভালবাসার অগ্রারুণ পল্লবের মত ;—অগ্রগামী সহস্র পদাতিকের করপল্লবে মুহুর্মুহু তুলে উঠল অরুণবরণ চামর ; 'স্বাগতম্' জানিয়ে মহারাজের মন্দুরার অশ্বমণ্ডল হ্রেষা-আমন্ত্রণ জানাল গ্রহবর্ম্মার বাজি-বৃন্দকে ; হেলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগল গজ-ঘটা ;

তাদের বিপুল দেহ সোনার সাজন দিয়ে ঢাকা, বর্ণক থেকে যে ঘণ্টাগুলি ঝুলছিল, অদ্ভুত উঠল তাদের টাঙ্কার। মনে হ'ল,—এই গজ-ঘটা যেন নূতন ক'রে নিয়ে আসছে এক চন্দ্র-বিলীন অন্ধকার।

গ্রহবর্ম্মা এলেন ;—

করিণীর পৃষ্ঠে সমারূঢ় হয়ে,

করিণীর কুম্ভে ঝক্‌মক্ ক'রে জ্ব'লে উঠল নক্ষত্রমালার বাহার।

গ্রহবর্ম্মা এলেন ;—

যেন এক নবীন বসন্ত।

মধু-ঋতুকে যেমন বনে উপবনে, পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে বিহঙ্গের কূজিত মন্ত্র, তেমনি এল চারণ-সঙ্ঘ—গ্রহবর্ম্মার পুরঃসরে ;—

সঙ্গীতের মোহনতায় ঢেলে দিল তালনৃত্যের উন্মদ ঐশ্বর্য্য।

রক্ত-হলুদ হয়ে গেল পৃথিবী,—

হাজার হাজার দীপিকায় উৎসবিত আলোক। দীপিকার গন্ধতৈলের সুরভিতে, মিশ্রিত হয়ে গেল কুঙ্কুম আর পটবাসের গন্ধধূলির প্রসন্নতা।

এলেন কঙ্কণধর গ্রহবর্ম্মা ;—

মস্তকে—উৎফুল্ল-মল্লিকার বিবেষ্টনী মাল্য, তার মধ্যে পুষ্প-মোহ শিখর ;—যেন মণ্ডলের মধ্য থেকে চাঁদ হাসাচ্ছে কুমুদ-ভরা সন্ধ্যাকে।

নির্ব্বাক-বিস্ময়ে কবি দেখতে লাগলেন ;—সেই গ্রহবর্ম্মাকে। সেই মদন-চোর মূর্ত্তিকে। বামস্কন্ধ থেকে দক্ষিণভুজের নীচে নেমে পড়েছে কৌসুম ফুলের মাল্য—যেন পুষ্পের ধনুক !—

সৌভাগ্য-গর্ব্বে ভ্রান্ত হ'ল কি ভ্রমরদের গুঞ্জন-প্রলাপ ?

এই বুঝি বা নন্দনবনের পারিজাত !

নবতনী হয়ে এলেন কি পুরাতনী লক্ষ্মী ?

কবি দেখলেন,—

গ্রহবর্ম্মার উৎসুক একখানি মুখ ! যেন পড়ি-পড়ি হয়ে সে আসছে। পড়বেই তো।

নববধূর শুভদৃষ্টির স্বপন-দেখা সেই মুখ !

গ্রহবর্ম্মা যখন এলেন তখন—

বিবাহের প্রসিদ্ধ লগ্ন প্রত্যাসন্ন।

দ্বারের সমীপে যখন উপস্থিত হলেন গ্রহবর্ম্মা, তখন মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন রাজকুমার দুটিকে সঙ্গে নিয়ে, পায়ে হেঁটে, বরণ করলেন জামাতাকে। সম্বর্দ্ধনার জন্যে অনুগমন করলেন সামন্তরাজচক্র।

করিণীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ ক'রে গ্রহবর্ম্মা নমস্কার করলেন মহারাজকে এবং প্রসারিত-ভুজযুগে মহারাজ আলিঙ্গন করলেন গ্রহবর্ম্মাকে;—একদা এই রকমেরই আলিঙ্গন করেছিলেন,—মন্মথকে মাধব।

শ্রীরাজ্যবর্দ্ধন ও শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সমাপ্ত হ'ল আসনদানাদি আলিঙ্গন-অধ্যায়।

ক্ষণপরেই 'গম্ভীর'-নামা ব্রাহ্মণ—মহারাজের তিনি প্রণয়ী এবং বিদ্বান—গ্রহবর্ম্মাকে সম্ভাষণ ক'রে বললেন—

"তাত, তুমি এবং রাজ্যশ্রী আমাদের সংযোজনা এবং লাভ। তেজোময় দুটি বংশের—'পুষ্পভূতি' এবং 'মুখর,'—মিলন হয়ে গেল। এ যেন জগৎ-গীয়মান বুধ এবং কর্ণের, সোম এবং সূর্য্যবংশের মিলন। প্রথমেই তুমি সমাসীন ছিলে মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের হৃদয়াসনে—কৌস্তুভমণির মত; এখন থেকে আমাদের পরমেশ্বর তোমাকে চন্দ্রের মত মাথায় বহন করবেন—চিরদিন।"

ব্রাহ্মণ গম্ভীরের আলাপের মধ্যপথে বাধা সৃষ্টি ক'রে মৌহূর্ত্তিকেরা এসে ব'লে উঠল,—

"দেব, লগ্ন-কাল আসন্ন। জামাতাকে এখন কৌতুক-গৃহে নিয়ে যাবার অনুমতি দিন।"

"ওঠ, চল।"

অনুমতি লাভ ক'রে গ্রহবর্ম্মা কৌতুক-গৃহের দিকে প্রস্থান করলেন, এবং শেষে, সুখসমৃদ্ধহৃদয়ে—

দর্শিনিকা রমণীদের নীল-পদ্মিনীকা লোচনের অরণ্যানী লঙ্ঘন ক'রে পৌঁছে গেলেন কৌতুকগৃহের দ্বারে।

নিবারিত হ'ল পরিজন।

কৌতুক-গৃহে প্রবেশ ক'রেই বর দেখতে পেল বধূকে।

রাজ্যশ্রী ব'সে রয়েছে, আর তাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটি আপ্ত-প্রিয়সখী স্বজন এবং প্রমদা।

বর দেখতে পেল বধূকে :—

অরুণাংশুকের গুণ্ঠনে মুখখানি তার ঢাকা ;—

যেন প্রভাতসন্ধ্যা নিজের আলোয় ম্লান ক'রে দিচ্ছে প্রদীপিকার গর্ব্ব।

এত সুকুমার সে,—যে যৌবন ভয় পাচ্ছিল তাকে ভর করতে।

নবজীবনের আশঙ্কায় ঐ বুঝি ঘনঘন হৃদয়-প্রদেশটিকে দুলিয়ে দিয়ে

অতিকষ্টে মুক্ত হয়ে পড়ল তার নিভৃত করুণ নিঃশ্বাস !—

না। এ কী অপস্রিয়মাণ কৌমারের অনুশোচনা ?

ঐ দেখ, কী সৌন্দর্য্যে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার চন্দনশুভ্র অঙ্গলতা,—
লজ্জা নিঃস্পন্দ ক'রে দিচ্ছে পতনভঙ্গি।

সুন্দর হাতখানি পদ্মের মত রাঙা ;—এই বুঝি কেউ গ্রহণ করল, তাই
ভয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

প্রতিটি মুহূর্ত্ত নবতা এনে দিল বধূটির রূপে।

একবার মনে হ'ল—বসন্তকালের হৃদয় থেকে ফুল ছড়াতে ছড়াতে বেরিয়ে
এসেছে বধূটি ;

আবার মনে হ'ল—চন্দনী-নিঃশ্বাসের পরিমলে ভ্রমরদের ভুলিয়ে ভুলিয়ে
দক্ষিণসমীরণের দেশ থেকে সে বুঝি বা এল ;

একবার মনে হ'ল—নব-দেহ নব-কান্তি গ্রহণ ক'রে কন্দর্পের পদাঙ্কে
এলেন রতিরাণী ;

আবার পরক্ষণেই মনে হ'ল—নাঃ,—

ইনি আর একটি লক্ষ্মী ; সুরাসুরদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে রত্নাকর বরুণ
এঁকে গড়েছেন—

কৌস্তুভের জ্যোতিঃ দিয়ে, চন্দ্রের লাবণ্য দিয়ে, মদিরার মত্ততা
দিয়ে, পারিজাতের সুরভি দিয়ে, এবং মাধুর্য্য দিয়ে অমৃতের।

মুখখানিকে নীচু ক'রে ব'সে ছিল রাজ্যশ্রী।

বরটিকে দেখছে সখীরা,—কৌতুকভরা তাদের চোখ! কিন্তু কী আশ্চর্য্য, এত
চেষ্টা সত্ত্বেও বধূর মুখখানি আর উঠছে না।

হৃদয়চোর যেই প্রবেশ করল, অমনি বধূ ধরিয়ে দিল চোরকে ;—
কন্দর্প করল বন্দী।

কন্দর্পের নিগ্রহের সমারোহ দেখে লঘুহাসির তরঙ্গ উঠল সখীদের গণ্ডে।
চলতে লাগল পরিহাস। দেখতে দেখতে কৌতুক-গৃহে কত যে ব্যাপার ঘটতে
লাগল তার ঠিকানা নেই। কৌতুক-গৃহে যা যা ঘটা উচিত, সমস্তই সহ্য করল
জামাতা,—অতিনিপুণ চটুলতার মধ্য দিয়ে। তারপরে—

পরিণয়-বেশ-ধারিণী বধূটির একখানি হাত হাতের মধ্যে ধ'রে নিয়ে
কৌতুক-গৃহ থেকে বেরিয়ে এল গ্রহবর্ম্মা।

বাইরে ছিল নবসুধাধবল বৃহৎ বেদী—যেন তুষারশৈলের উপত্যকা। প্রান্তে—পঞ্চাস্য কলস, আর্দ্র-কোমল যবের অঙ্কুর দিয়ে শোভিত। প্রান্তগুলিকে উদ্ভাসিত করা হয়েছিল বর্ণিকাবিচিত্র শক্রমুখ মৃৎপুত্তলীর সহস্রতা দিয়ে;—তারা যেন মাঙ্গল্যফল অঞ্জলিতে নিয়ে বেদীপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। উপাধ্যায়েরা রাশি রাশি ইন্ধনের সম্ভার দিয়ে জ্বালাচ্ছিলেন হোমানল, এবং অক্ষণিক উপদেষ্টৃ-দ্বিজেরা সন্ধুক্ষিত করছিলেন অগ্নি। নিকটেই রাখা ছিল—অখণ্ডিত-পান্নার মত কুশ, এবং সন্নিহিত শিলাতলে কৃষ্ণমৃগের চর্ম্মনির্ম্মিত আজ্যস্রুক, গুচ্ছগুচ্ছ সমিৎ। নব-শূর্পের উপরে রক্ষিত শমীপল্লবের শ্যামশ্রীতে এবং মঙ্গল-লাজের শুভ্রতায় বেদীখানি হাসছিল।

বেদীতে আরোহণ করলেন বর ও বধূ;—

জ্যোৎস্না-সনাথ যেন চন্দ্র।

ধীরে গেলেন রক্তাশোকতরুর সমীপে; তার অরুণপল্লব আগুনের মত কাঁপছে। সম্পন্ন হ'ল হোমবিধি। হোমানলের চতুর্দ্দিকে দুজনে করলেন দক্ষিণাবর্ত্ত পরিক্রমা।

হোমের অনল-শিখাগুলি সেই সময়ে যেন নয়ন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল

সেই সুন্দরকে, সেই সুন্দরীকে।

বধূহস্তের লাজাঞ্জলির দক্ষিণা পেয়ে, বধূবরের অপূর্ব্ব রূপবৈভব দেখে, হেসে ফেললেন অগ্নিদেব; বিস্ময়-বিকচ তাঁর হাসি।

এমন সময় দেখা গেল, রাজ্যশ্রীর ছলছল করছে চোখ। গালের টোল-টিতে প্রতিবিম্ব পড়েছিল হোমাগ্নির; সেইটিকে যেন নেভাবার উদ্দেশ্যেই কালো-তারার-মেঘ থেকে, নেমে এল স্থূলমুক্তার মত দুটি অশ্রুর কণা।

বিকারের কোন চিহ্ন ভেসে উঠল না তার মুখে।

সুসম্পন্ন হ'ল বিবাহকৃত্য।

জামাতা তার বধূকে সঙ্গে নিয়ে প্রণাম করল, শ্বশুর এবং শ্বশ্রূমাতাকে। প্রণামশেষে বরণ ক'রে তাদের নিয়ে আসা হ'ল বাসরে।

প্রবেশের সময় বাসরঘরের দ্বারপক্ষে গ্রহবর্ম্মা দেখতে পেলেন রতিদেবীর প্রীতিমূর্ত্তি, চিত্রিত হয়েছে। প্রবেশ ক'রেই শুনতে পেলেন,—প্রণয়ী ভ্রমরেরা পূর্ব্ব থেকেই আরম্ভ করেছে কোলাহল। ভ্রমরদের পক্ষ-পবনে প্রদীপগুলি কাঁপছে, দুলছে। কেন, তাদের এই কর্ণোৎপলের প্রহারভয়!

বাসরঘরের রাজা,—যখন বাসরঘরে এলেন, তখন তাঁকে সম্বর্দ্ধন করল কক্ষের একপ্রান্ত থেকে চিত্রার্পিত কামদেব;

তিনি ব'সে রয়েছেন স্তবকিত রক্তাশোকের তরুতলে,
ফুলের ধনুকে ভ্রমরের গুণ,
চক্ষে একটি বাঁকা বাঁকা কুণিত চাহনি,
সরল করছেন ফুলের শর।

ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড পালঙ্ক; ছড়ানো রয়েছে উপাধান, বিছানো রয়েছে আস্তরণ। পালঙ্কের এক পার্শ্বে একটি কাঞ্চন আচমনপাত্র, অপর পার্শ্বে একটি কনক-পুত্রিকা। পুত্রিকাটিব হাতে রয়েছে হাতীর দাঁতের মাছের-আকার কৌটা। পালঙ্কের শিরোভাগে ছিল,—কুমুদফুলের কল্ক-গুচ্ছিত রাজত একটি নিদ্রাকলস। যেন কামদেবকে সহায়তা করতে ধরায় নেমে এসেছেন আকাশের চাঁদ।

পালঙ্কের শান্তি-চঞ্চলতার মধ্যে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল বধূ রাজ্যশ্রী। সেই মুখ-ফেরানোটিও বড় ভাল লাগল গ্রহবর্ম্মার।

মুখের প্রতিরূপ ফলেছে মণি-মালিনী ভিত্তিতে ভিত্তিতে,
পুলকিত সৌন্দর্য্যের সলজ্জ দ্যুতিতে।

হঠাৎ গ্রহবর্ম্মার মনে হ'ল—এরা রাজ্যশ্রীর মুখ নয়। অলক্ষ্যসুন্দরী গৃহদেবীরা
বুঝি মণিময় গবাক্ষে গবাক্ষে—স্তব্ধকৌতুকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন;—যেন শুনছেন—শুভ-নবমিলনের প্রথম অক্ষর।

দেখতে দেখতে প্রাচীনা হয়ে গেল রাত্রি।

রাজপুরীতে দশটি দিন কেটে গেল গ্রহবর্ম্মার। আনন্দময় দশটি দিন এক-একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

তার সৌজন্যের জ্যোতিঃ অমৃতের প্লাবন বইয়ে দিয়ে গেল মহারাজ প্রভাকর-বৰ্দ্ধনের হৃদয়ে।

তার পরে এল জামাতা গ্রহবর্ম্মার বিদায়-নেবার পালা,—স্বদেশ-যাত্রা-মঙ্গল

সে তার বিদায়-দুঃখটিকে রাজকুলে দান ক'রে গেল,
—রাজদৌবারিক-রূপে ;
সে তার যাত্রাপথের পাথেয় ক'রে নিল,
—স্থান্বীশ্বরের প্রজাপুঞ্জের হৃদয়-যৌতুকটিকে ;
সে তার আত্মার সুখসঙ্গিনী ক'রে নিয়ে গেল,
—মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের সম্প্রদান—
নববধূ রাজ্যশ্রী।

ইতি শ্রীবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে
চক্রবর্ত্তিজন্মবর্ণনং নাম
চতুর্থ উচ্ছ্বাসঃ ॥

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

নিয়তির স্বভাব অতি তরল।
সুখের বিধান নিয়ে, মানুষের সংসারে প্রথম তিনি আসেন ;
তারপরে তিনি আনেন,—অকস্মাৎ—এক নিদারুণ দুঃখ।
তরল বিদ্যুতের এ যেন,—
প্রথমে —আলোর ঝলকন্
অবসানে—বজ্রের পলক-প্রলয়॥ ১

কাল—!
অনন্ত নাগের মত।
অনন্ত নাগের ফণার দোলায় যেমন ছোট বড় সব পাহাড়ই ট'লে যায়, তেমনি মহাপুরুষরাও টলেন, রক্ষা পান না।
সব ধ্'সে পড়ে, যখন মহাকাল ছোট-বড় বিচার না ক'রে, স্পর্শ ক'রে যান সকলের কেশ॥ ২

কিছু কাল অতিবাহিত হ'ল।

রাজ্যবর্দ্ধনের তখন কবচ-পরবার বয়স হয়েছে। সেই সময় একদিন মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন তাঁকে আহ্বান ক'রে—

—সিংহ যেমন তার সিংহকিশোরক-কে পাঠায় হরিণ-মৃগয়ায়—

হূণদের উদ্দেশে উত্তরাপথে তাঁকে পাঠালেন।

রণসহায়তায় সঙ্গে চলল—

চিরন্তন অমাত্যেরা,
অনুরক্ত মহাসামন্তের সঙ্ঘ,
অপরিমিত সৈন্যবল।

রাজ্যবর্দ্ধন বিজয়-যাত্রায় বাহির হলেন।

দেব হর্ষও নিজের তুরঙ্গ-সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, কয়েকটি প্রয়াণক অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনের অনুগমন করলেন। তারপর ভ্রাতা যখন কৈলাসপর্ব্বতের প্রভাভাসিনী উত্তরদিকে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি বিরত হলেন।

কিন্তু ফিরলেন না। ফেরার পথে বাধা হ'ল—

তাঁর বিক্রম-রস,
তাঁর নবীন বয়স।

তুষার-শৈলের কণ্ঠে উপকণ্ঠে সিংহ-শরভ-ব্যাঘ্র-বরাহ শিকার খেলতে খেলতে কাটিয়ে দিলেন কয়েকটি দিন; বহির্মুখিন দিন—।

উপকণ্ঠ-বিহারিণী বনদেবীদের লোচনকটাক্ষের আলোছায়ায় দেহকান্তিটিকে নিলেন বিচিত্রিত ক'রে। কর্ণান্তকৃষ্ট কার্ম্মুক থেকে ভল্লের সে কী উজ্জ্বল বর্ষণ! কয়েকটি দিনের মধ্যেই নিঃশ্বাপদ হয়ে গেল অরণ্য।

একদা তখন রাত্রির চতুর্থ যাম। বাতাস বইছে ভোরের, স্বপ্ন দেখলেন হর্ষদেব।

দেখলেন—অরণ্য জুড়ে দুর্নিবার দাবানল উঠেছে জ্ব'লে, আর সেই চটুল-শিখা হলুদ-বরণ আগুনে পুড়ে মরছে প্রকাণ্ড এক কেশর-ফোলা সিংহ। সিংহিনী শাবকদের ছেড়ে দিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে পড়ছে,—সেই দাবদহনের মধ্যে।

স্বপ্নের মধ্যেই হর্ষদেব শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে,

"জগতে স্নেহের বন্ধন নিশ্চয় লোহার চেয়েও কঠিন, তা না হ'লে তির্য্যক-যোনির জীবেরাই বা এমন ব্যবহার করবে কেন ?"

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হর্ষের।

হঠাৎ কেন বারম্বার নেচে ওঠে তাঁর বাম নয়নের পল্লব ? কেঁপে ওঠে গা, অঞ্চিত হয় রোম ? কি আশ্চর্য্য ! কোনও কারণ নেই, অথচ অন্তরের অঙ্কন-স্থান ভেঙে দিয়ে যেন বেরিয়ে যেতে চায় হৃদয় ! এল গভীর দুঃখিত বেদনা।

পালঙ্কের নিভৃতিতে সমাসীন থেকে, নিজের চকোর-চোখখানি দিয়ে মাটির বুকে, যেন একখানি স্থলপদ্ম ফুটিয়ে, হর্ষদেব বারম্বার মনে করতে লাগলেন— "এ কি হ'ল ?"

নানান্ জল্পনায় মথিত হ'ল মন, হারায় হারায় বুঝি ধৈর্য্য ; চিন্তায় নুয়ে পড়ল মাথা ! চক্ষের তারকা হ'ল স্তিমিত !

প্রভাত হ'ল।

মৃগয়ায় বেরলেন শ্রীহর্ষ, শিকার খেললেন,

কিন্তু চিত্ত কেমন যেন শূন্য-উদাস।

দেখতে দেখতে এল মধ্যদিন ; সূর্য্য তখন হরিৎ-মরকত অশ্বের রথে চ'ড়ে ছুটে চলেছেন আকাশে।

মধ্যদিনে ঘরে ফিরে এলেন হর্ষ।

চন্দ্রধবল-উপাধান-ধারিণী, চন্দনপঙ্ক-শীতলা, বেত্র-পট্টিকায় অঙ্গখানিকে এলিয়ে দিলেন। কিন্তু কেমন একটা অকারণ আশঙ্কা তাঁকে ঘিরে রইল। তাঁর দুপাশে বইতে লাগল তনুতালবৃন্তের ব্যজনী ; কিন্তু বল তো, কেন দূর হতে চায় না অদ্ভুত আশঙ্কা ?

এমন সময় হর্ষদেব বাতায়ন-পথে দেখতে পেলেন, দূর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এক দূরাধ্বগ আসছে।

নীলিরাগ দিয়ে রাঙানো একখানি ময়ূরকণ্ঠী চীরচীরিকা, ছোট্ট ছোট্ট মালার মত ক'রে তার মাথায় রয়েছে জড়ানো ;—আর তার গর্ভে জ্বল্‌জ্বল্ করছে একখানি লেখ।

হর্ষদেবের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল।

দূরাধ্বগ আসছিল—ধুলো ওড়াতে ওড়াতে ;

—মনে হ'ল, পত্রের আভ্যন্তরীণ সংবাদ জানবার ব্যগ্রতায় ধরণী বুঝি ধূলিচ্ছলে তার পাছু পাছু ছুটছে।

বাতাস-বৈমুখী উত্তরীয় তার দুপাশ দিয়ে দুলছে ;—দেখে মনে হ'ল—দূরাধ্বগ বুঝি উড়তে উড়তে আসছে।

দূরাধ্বগ নিকটে এল। হর্ষদেব তাকে চিনতে পারলেন।

এ যে "কুরঙ্গক"! পরিশ্রমে আর সূর্য্যস্নানে কী কালিবরণ হয়ে গেছে ওর চেহারা! দুঃসংবাদ আনছে না তো? আগুনের রঙ তো নয়, এ যে অঙ্গারের!

প্রভুর আদেশ যেন তাকে পিছন থেকে ঠেলে পাঠাচ্ছে, আর দীর্ঘশ্বাস সামনে থেকে টানছে। আরও নিকটে এল কুরঙ্গক।

তাই তো! সমান জমি, তবু ওর পা কেন থেকে থেকে স্খলিত হয়?

সে কি—শূন্যহৃদয় বলে, না, পত্রে-লেখা প্রয়োজনের গুরুভারে?

যখন আরও নিকটে এল কুরঙ্গক, তখন হর্ষদেব ভাবলেন,—

"কুরঙ্গক আসছে নিশ্চয়—অশুভ সংবাদ নিয়ে।
যেন দুর্বার্ত্তার বজ্র হানছে কালমেঘ,
যেন বীজ ফলবে দুষ্কৃতির শালিধান্যের ক্ষেতে।"

যখন কুরঙ্গক সম্মুখে এল তখন স্বপ্নে-দেখা দুর্নিমিত্তের ভীতির বাতাসে হর্ষদেবের হৃদয়খানি শুখিয়ে আসছে, ভেঙে পড়ছে। কুরঙ্গক এল। এগিয়ে এল, প্রণাম করল। হর্ষদেবের পদপ্রান্তে প্রথমেই সে নিবেদন ক'রে দিলে,—

মুখে-ফোটা বিষণ্ণতা, তারপর পত্র।

নিজের হৃদয়কে যেমন মুহূর্ত্তে চেনা যায়, তেমনি মুহূর্ত্তে হর্ষদেব বুঝে নিলেন পত্রের মর্ম্মার্থ।

অনাবৃষ্টি যেন কথা কইল—

"কুরঙ্গক! পিতৃদেব ভাল আছেন তো? মন্দ খবর নয় তো?"

কুরঙ্গকের চোখে অশ্রুবিন্দু। ওষ্ঠে খণ্ডাক্ষর। সে ব'লে বসল—

"দেব, মহারাজের ভয়ঙ্কর দাহজ্বর।"

শ্রবণমাত্রই আকস্মিক আঘাতে সহস্রখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ল হর্ষের হৃদয়।

তার পরে ধীরে ধীরে আচমন শেষ ক'রে পিতৃদেবের আয়ুষ্কামনায় ব্রাহ্মণদের দান করলেন অপরিমিত স্বর্ণ, অপরিমিত রৌপ্য, মণি, এবং সর্ব্বশেষে নিজের রাজপরিচয় পরিবর্হ। প'ড়ে রইল মাধ্যাহ্নিক ভোজন।

ললাটে কৃপাণ স্পর্শ ক'রে অচঞ্চল সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল যে তরুণ-প্রহরীরা, তাদের আদেশ দিলেন "ঘোড়ায় জিন চড়াও।"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়তে দৌড়তে অশ্বপাল নিয়ে এল তুরঙ্গম।

হর্ষের হৃদয় তখনও কাঁপছে।

তুরঙ্গমে আরোহণ ক'রে একাকীই বেরিয়ে পড়লেন স্কন্ধাবার থেকে।

অকস্মাৎ ক্ষুভিত হ'ল দিগ্বিভাগ, প্রয়াণশঙ্খের ধ্বনিতে। স্কন্ধাবারে সে কি তূর্ণী!

দেখতে দেখতে সেজে উঠল তুরঙ্গ-সৈন্য। অদ্ভুত শোনাতে লাগল ধাবমান অশ্বখুরের ধন্ধন্ আরাব! তারা ছুটল হর্ষের পরিচর্য্যায়।

বেরিয়ে পড়লেন হর্ষ। পথে যেতে যেতে দেখতে পেলেন অমঙ্গলের চিহ্ন।

'বিনাশ উপস্থিত'—এই কথা জানিয়েই কি হরিণগুলো তাঁর দক্ষিণ দিক দিয়ে ফিরে গেল? ছিঃ!

সেই দাববাহী গ্রীষ্মেও—সূর্য্যের দিকে চাইছে, আর ডাকছে—ঐ পাষণ্ড কাক! ছিঃ!

ছিঃ ছিঃ!—ঠিক কি সামনে এসে পড়ল শিখি-পিচ্ছ হাতে নিয়ে

একটা উলঙ্গ ক্ষপণক। তার চামড়ায় বাসি-চন্দনের পুরু ময়লা
জমেছে, কি বিশ্রী, কাজলের মত কালো!

চলতে চলতে কেবল ভয় হতে লাগল।

শঙ্কা!

পিতৃস্নেহ হৃদয়কে বললে—"ঘোড়ার কাঁধে চোখ রেখে চল,
কিছু দেখো না।"

ঘোড়া হাঁকিয়ে যে সব ভূপালেরা গভীর দুঃখে তাঁর অনুগমন করছিলেন, তাঁদেরও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হাসি ও জল্পনা। বহু যোজনের সংপিণ্ডিত পথ তাঁরা এক দিনেই মাড়িয়ে পার হয়ে গেলেন।

রাত্রি এল। তবু হর্ষের এবং তাঁর তুরঙ্গ-সৈন্যের চলার নেই বিরাম। যে সব প্রতীহারেরা আগেই চ'লে গিয়েছিল, তারা গ্রামিন্‌দের নিকট থেকে জেনে, দেখে নিতে লাগল সংক্ষেপ-পথ। ঘোড়ার পিঠে রাত্রি কেটে গেল সকলের।

পরের দিন মধ্যাহ্নে শ্রীহর্ষ তুরঙ্গ-সৈন্য নিয়ে রাজধানীতে এসে পৌছলেন।

এ কী হয়েছে! এই কী রাজধানীর চেহারা! নির্ব্বাক-স্তব্ধতায় সকলে অনুভব করলেন;—রাজস্কন্ধাবার যেন শূন্য, রাজস্কন্ধাবার যেন ঘুমিয়ে পড়েছে,—

জয়ধ্বনি নেই,
তূর্য্যনাদ অস্তমিত,
থেমে গেছে গান,
উৎসারিত উৎসব।

চারণদের মুখে কোথায় গেল তার-স্বর সেই সঙ্গীত? কোথায় গেল দোকানে দোকানে পণ্যভারের সজ্জা?

কেবল দেখতে পাওয়া গেল—

এখানে সেখানে, অন্য হোম নয় ;—কেবল কোটিহোমেরই ধূম্রলেখন উঠছে ; যেন আকাশগাত্রে ফুটে উঠেছে যমরাজের মহিষের বক্রবিষাণ।

অমঙ্গলের সূচীপত্র,—ঐ কালো কালো কাক! মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরে ঘুরে ডাকছে। উঃ, কী তাদের খন্‌খনে গলা,—যেন কালো লোহার কিঙ্কিণী বাজছে কালো মোষের গহনায়!

ওরা কারা! ঐ যারা—মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে!

তাই তো, না খেয়ে না দেয়ে, ওরা মহাদেবের দেউলে মানত ক'রে লুটিয়ে পড়ছে—ঝাঁকে ঝাঁকে। ওরা কারা!

ষোড়শমাতৃকার মন্দিরে—কুলপুত্রেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?—তাদের মাথায় ছোট্ট ছোট্ট দীপ। প্রসাদের ব্যগ্রতায়, আহা, জ্বলন্ত তেলে পুড়ে যাচ্ছে ওদের-গা, তবু তো নড়ে না!

দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ কেন বেতাল-সাধনা করছে—মড়ার খুলির উপহার নিয়ে?

হর্ষদেব যতই এগিয়ে চলতে লাগলেন ততই তাঁর মনে হতে লাগল—

রাজস্কন্ধাবারের হৃদয় নেই, কে যেন চুরি ক'রে নিয়ে গেছে!

রাজস্কন্ধাবারের মস্তক নেই, কে যেন বিকার ধরিয়ে দিয়ে গেছে!

বুদ্ধি নেই—কে যেন তাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেছে।

জ্ঞান নেই—আছে কেবল মূর্চ্ছা!

তা না হ'লে—চণ্ডিকার মন্দিরে—বাহুর ভঙ্গিতে হাতীর শুঁড়ের বাহার জাগিয়ে কেন ভিক্ষা চাইবে অন্ধ্রদেশীয় জনতা?

তা না হ'লে—মহাকালের মন্দিরে গুগ্‌গুলের ধূপদান মাথায় বহন ক'রে, কেন দাঁড়িয়ে থাকবে ঐ সব নব-সেবকদের দল?

তা না হ'লে—নিকট বান্ধবেরা শাণিত ছুরিকা নিয়ে নিজেদের গায়ের মাংস কেটে কেটে, কেনই বা ফেলে দেবে হোমের আগুনে?

তা না হ'লে—প্রকাশ্য দিবালোকে, দাঁড়িয়ে থেকে, রাজার ছেলেরা কেনই বা বিক্রয় করবে নরমাংস?

সে রাজধানী আর এ রাজধানী নয়।—

দৈত্যরাক্ষসদের এ যেন বিধ্বংসী কবলে,
এ যেন কাল,—শ্রীমান কল্কির করতলে।
এর চোখে শ্মশানের ধূলো,
এর গায়ে পাপমেঘের উত্তরীয়।
জোড়-পায়ে হেঁটে এসে একে লুট করছে অধর্ম্ম,
ধিক্কারের হাসি হানছে অনিত্যতা,
এ যেন নিয়তির এক হঠ-নির্ম্মিত বিলাসী আত্মীয়

বিপণি-বীথিতে প্রবেশ করলেন হর্ষদেব। তাঁর চোখে পড়ল—যমপট দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক যম-পট্টিক।

তার ডান হাতে প্রকাণ্ড শর,
আর বাম হাতে,—ভীষণ মহিষে-চড়া প্রেতনাথের এক চিত্তির-বিচিত্তির ছবি।

নগরের পথের বালকেরা চীৎকার করছে—"কি হয়েছে, কি হয়েছে?"
দেখছে, আর ভীড় ক'রে সঙ্গে ছুটছে। যখন শ্রীহর্ষ তাঁর তুরঙ্গ-সৈন্য নিয়ে যমপট্টিককে পিছনে রেখে চ'লে গেলেন, তখন সে ছড়া আওড়াচ্ছে—

"মাতাপিতৃসহস্রানি পুত্রদারশতানি চ
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্॥"*

ছড়া শুনে শ্রীহর্ষের হৃদয়টা আরও খানিকটা দীর্ণ হয়ে গেল।

হর্ষদেব রাজদ্বারে এসে পৌঁছলেন।
দেখলেন, সাধারণের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ।
তুরঙ্গ থেকে নেমে অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেন, এমন সময় তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল বৈদ্যকুমার সুষেণের সঙ্গে। তিনিও বেরিয়ে আসছিলেন,—অপ্রসন্ন মুখশ্রী,—যেন একেবারে উন্মুক্ত-ইন্দ্রিয়।

* হাজার হাজার মা আছে, হাজার হাজার বাপ আছে; ওরে, ছেলেও আছে; ওরে, স্ত্রীও আছে। যুগের পর যুগ চ'লে যাচ্ছে, তুই কে, ওরা তোর কে?

নমস্কার ক'রে হর্ষদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পিতৃদেব কেমন আছেন? ভাল, না, ভাল নয়?"
তিনি বললেন, "এখন তো বিশেষ ভাল নয়, তবে যদি কুমারকে দেখে একটু ভালর দিকে যান।"
দ্বারপালদের প্রণতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হর্ষদেব প্রবেশ করলেন রাজকুলে।

সম্পূর্ণ বদল হয়ে গেছে রাজকুলের চেহারা। রাজকুল যেন নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, আজ সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসেছে।

কুলদেবতার সাড়ম্বরে চলেছে পূজা; আরম্ভ হয়ে গেছে অমৃতচরুর পচন-ক্রিয়া;
প্রজাপতি, সোম, অগ্নি, ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী এবং ধন্বন্তরি—এই ছয় দেবতার উদ্দেশ্যে জ্ব'লে উঠেছে ষড়াহুতি হোম;
দূর্ব্বাপত্রের গুচ্ছে গুচ্ছে দধি এবং ঘৃত মাখিয়ে, তুলিয়ে তুলিয়ে প্রদত্ত হচ্ছে আহুতি;
উচ্চকণ্ঠে পঠিত হচ্ছিল মহামায়ুরী মন্ত্র; তাতে আনবে গৃহশান্তি, তাতে ঘটবে ভূতরক্ষাবলি-বিধান;
ব্রাহ্মণেরা নিম্নকণ্ঠে বিশুদ্ধ স্তুতিতে জপ ক'রে চলেছিলেন সংহিতা;
শিবের গৃহখানি ধ্বনিত হয়ে উঠছিল রুদ্রৈকাদশীর মন্ত্রপাঠে;
এবং শিবলিঙ্গ স্নাত হচ্ছিলেন সহস্র-কলস দুগ্ধে।

রাজকুলের কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের শারীরিক অবস্থায় যে একটা প্রলয় নেমেছে,—বিকটভাবে সেটি প্রকাশ পেতে লাগল নরপতিদের ব্যবহারে;—

> তাঁরা মহারাজের দর্শন না পেয়ে, মানস-মৃত হয়ে, মৃগচর্ম্মের উপরে পটে-আঁকা ছবির মত, নিশ্চল ব'সে ছিলেন। আসন্ন-পরিজনেরা ভিতর থেকে বার্ত্তা নিয়ে আসে, আর তাঁরা উন্মুখ হয়ে শোনেন, তারপরেই আবার নিশ্চলতা। স্নান ভোজন তাঁদের কাছে, বলতে গেলে,—বার্ত্তীভূত। আত্মসংস্কার উজ্ঝিত হয়েছে, বেশে পারিপাট্য নেই, সমস্ত মলিন। রাজকুলের অলিন্দে অলিন্দে

জটলা বেঁধে বাহ্যপরিজনেরা রাত্রিদিন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মুখে দুঃখের দীনতা।

ফিস্‌ফিস্ ক'রে তারা সবাই কথা কইছে।

কেউ খুঁটিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে চিকিৎসকেরা কী কী দোষ করেছেন, কী কী ভুল তাঁরা করলেন—তাই।

কেউ শাস্ত্র খুলে প'ড়ে শুনিয়ে দিচ্ছেন—অসাধ্য ব্যাধির লক্ষণপদ।

কেউ আবার নিবেদন করছে, রাত্রে-দেখা দুঃস্বপ্নের বিচার।

একদল বলছে,—নিশ্চয়ই মহারাজের ব্যাধির মূলে রয়েছে পিশাচের ব্যাপার;

একদল টুক্‌টুক্ ক'রে বলছে—ওরে, জ্যোতিষের লিখন অভ্রান্ত, খণ্ডাব কি ক'রে।

একদল দেখিয়ে দিচ্ছে,—কী কী অশুভ ব্যাপার ঘটল, দৈব-দুর্ঘটনা কী কী ঘটেছে, কী কী তার ফল!

আবার অন্য জায়গায় অন্য একদল বসেছে।
তাদের মধ্যে কেউ বলছে, 'ব্রহ্মাণ্ডে,—বুঝলে হে, কোনো পদার্থই নিত্য নয়, সবই অনিত্য;
কেউ বলছে, 'সংসার বড় বিভ্রমের স্থান, সংসারের সবই মন্দ; কলিকালটার সুখ্যাতি কি কোনও রকমে করা চলে ভাই!'
আবার কেউ গালাগাল দিচ্ছে দৈবকে; রেগে উঠছে ধর্ম্মের উপরে; আধিখ্যেতা করছে রাজকুলের ইষ্টদেবতার; ভাবছে—কি কষ্টেই না পড়ল কুলপুত্রেরা!
কী ভাগ্যই না ওরা নিয়ে এসেছে—ওদের বুঝি দুঃখের সীমা রইবে না!

রাজকুলে হর্ষদেবকে দেখতে পেয়ে পিতৃপরিজনেরা কেঁদে উঠল। চোখের বাঁধ ভেঙে, টপ্‌টপ্ ক'রে অশ্রু, দুঃখের সমুদ্রে গিয়ে মিলল। সেখানে দাঁড়াতে

পারলেন না হর্ষদেব। ওষধি-দ্রব্যের, ঘৃতের, ঔষধমিশ্র তৈলের, মালিশের, ক্বাথের,—বিচিত্র পাঁচন-গন্ধ নিতে নিতে তিনি প্রবেশ করলেন তৃতীয় কক্ষে।

সেই তৃতীয় মহলখানি একখানি শুভ্রাতিশুভ্র কিন্তু—নিঃশব্দ গৃহ।
গৃহের দেহলীতে বেত্রহস্তে দ্বারপালেরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।
মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের সুবীথি-পথখানি তিন স্তর পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। ছোট্ট পক্ষদ্বারটি বন্ধ।
কবাটে যাতে শব্দরটনা না হয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গবাক্ষগুলি রুদ্ধ, বাতাস এখন শত্রু। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে কারোর পায়ে একটু আওয়াজ হ'লেই প্রতীহারেরা চোখ রাঙাচ্ছে।
দীন পরিজনেরা কাজ ক'রে চলেছে শব্দহীন ইঙ্গিতে। উরচ্ছদ-ধারী সান্ত্রীরা একটু দূরে আছে দাঁড়িয়ে।
আহ্বান-চকিত আচমনক-বাহিনী,—গৃহকোণে স্তব্ধ।
চন্দ্রশালায় নীরবে ব'সে রয়েছেন,—মৌলমন্ত্রী।
কক্ষের চারিভিতে যে প্রচ্ছন্ন প্রগ্রীবকগুলি ছিল, তাতে নিঃশব্দে ব'সে রয়েছেন মহাব্যাধিবিধুর বান্ধবদের পত্নীরা। মহলের চারিধারে যে সঞ্জবন ছিল, সেগুলি পরিজনদের পুঞ্জিত উদ্বিগ্নতায় পূর্ণ।
মহলে প্রবেশ করতে পেরেছেন—

মহারাজের কয়েকটি প্রণয়ী ;—
কয়েকটি বৈদ্য ;—তাঁরা ভীত হয়ে উঠেছেন এই গম্ভীর জ্বরে ;
কয়েকটি দুর্মনায়মান মন্ত্রী, কয়েকটি মন্দায়মান পুরোহিত ; এবং
অবসন্ন আর্ত্ত সুহৃৎ।

প্রবেশাধিকারীদের মধ্যে ছিলেন—

ঘুম-হারা কয়েকটি পণ্ডিত,
বিশ্বাসী কয়েকটি সামন্ত,
হারা-প্রাণ কয়েকটি চামরগ্রাহী—
আর কতকগুলি দুঃখশীর্ণ শিরোরক্ষী।

প্রসাদলোভী কয়েকটি মিত্ররাজা, তাঁরাও ছিলেন; আহার নিদ্রা বন্ধ; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁরা দেখছিলেন তাঁদের আশা এবং কামনা ধীরে ধীরে লুপ্তির সীমানায় এসে দাঁড়াচ্ছে।

ছোট ছোট রাজপুতকুমারেরা মাটিতে চুপ ক'রে শুয়ে রয়েছে—তাদের সেবা,—রাত্রিজাগরণ। কঞ্চুকীরা শোকে সঙ্কুচিত। বন্দীচারণ নিরানন্দ। আসন্ন-সেবকেরা নিরাশ হয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। বারযোষিতদের মুখে তাম্বুল নেই, ধূসর তাদের অধর। মহানসাধ্যক্ষ (পৌরগব) অবহিতচিত্তে লজ্জিত বৈদ্যদের নিকটে উপদেশ নিচ্ছেন পথ্যের।

কঠিন আস্য-শোষী ব্যাধিতে মহারাজ জলপান করতে পারছেন না; তাই সমবেদনায় অনুজীবীরা ধারাজল পান করছে, চষকটিকে ঠেকাচ্ছে না ঠোঁটে।

মহারাজ ভোজন করতে পারছেন না; তাই তাঁর অভিলাষ-পূরণের জন্য বহুভোজীদের ডাকিয়ে ভোজন করানো হ'ল। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বণিকেরা জোগাড়পত্র করছিল ভেষজ সামগ্রী। ঘোর ব্যাধির শান্তির জন্যে তোয়-কর্ম্মান্তিকের পরিশ্রমের বিরাম নেই—মুহুর্মুহুঃ তাকে পড়ছে ডাক।

সেই কক্ষে তুষার দিয়ে ঢেকে, করকে করকে জমানো হচ্ছিল তক্র; সাদা ভিজে কাপড়ের মধ্যে কর্পূরের পরাগ বেঁধে, শীতল করা হচ্ছিল অঞ্জন-শলাকা।

সারি সারি সাজানো ছিল গণ্ডূষ-গ্রাহ্য নতুন ভারে ছানার জল। সেখানে বিছানো ছিল কোমল পদ্ম-পাতা দিয়ে ঢাকা মৃদুমৃণালের আর্দ্রতা, বড় বড় সলিলপাত্রে সনাল নীলপদ্মের গুচ্ছ গুচ্ছ সমারোহ। ধারা-নিপাত ক'রে শীতল করা হচ্ছিল ফুটন্ত জল; উঠছিল লাল চিনির তীব্র গন্ধ।

মঞ্চকের উপরে রক্ষিত ছিল একটি কর্করী পাত্র, তার ভিতরে বালির দানা; সমস্ত গৃহবাসীর আন্তর-চক্ষু যেন সেই কাল-কথক যন্ত্রের উপর লুণ্ঠিত হয়ে প'ড়ে রয়েছে।

সরল শৈবাল-বলয়িত গোলযন্ত্র থেকে টিপ্‌টিপ্ ক'রে গ'লে পড়ছে জল। ললাটের জন্য শীতল প্রলেপ তৈরি করতে করতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল কত পাথর। কত কি যে ছিল সেই কক্ষে, তা বর্ণনা ক'রে শেষ করা যায় না।

স্ফটিকের রেকাবিতে সাদা খই আর ভাজা সাতু উল্লসিত;
পান্নার বাটিতে শুভ্র শর্করার সন্নিবেশ;

ফটিকের, শুক্তির আর শঙ্খের পাত্রে কত চূর্ণ, কত ঔষধরসের বিন্যাস;
ছোট্ট পাহাড় হয়ে গেছে প্রাচীন আমলকী, মাতুলুঙ্গ, দ্রাক্ষা এবং
দাড়িম্বাদি ফলের সংগ্রহে।

সেই শুভ্রাতিশুভ্র গৃহে ব্রাহ্মণেরা ঘুরে ঘুরে বিকীর্ণ ক'রে চলেছিলেন শান্তিজল।
সেই শুভ্রতার মধ্যে হর্ষদেব দেখতে পেলেন তাঁর পিতৃদেব মহারাজ প্রভাকর-
বর্দ্ধনকে। জ্বরের জ্বালায়, অবিশ্রান্ত পার্শ্বপরিবর্ত্তনে, পালঙ্কের আস্তরণখানি
তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে; যেন বিষের জ্বালায় ক্ষীরোদসাগরকে আলোড়িত
করছেন শেষনাগ বাসুকি।
এ জ্বালা জ্বরের নয়, যেন পরলোক-জয়ের নীরাজন হোম।
কক্ষ-বিলুণ্ঠিত মুক্তার মালা বালুকা-ধূলির মত চূর্ণ হয়ে শুষ্কশুভ্র হয়ে পড়ছে।
চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিচারিকাদের দল;

মহারাজের সর্ব্বদেহে চন্দন-চর্চ্চার ফলে, যেন ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে
তাদের করতল।

মহারাজকে দেখে হর্ষদেবের মনে হ'ল,—
কমল কুমুদ আর নীলপদ্মের পাপড়ি দিয়ে এই যে শীতল সেবা চলেছে, এতে
কোনও ফলই বুঝি হবে না; ওগুলো যেন মহারাজের শরীরের উপর যমরাজের
ভ্রূকুটি-কটাক্ষের বিনিপাত।
চোখের তারা কোটরে প্রবেশ ক'রে গেছে, যেন কৃতান্তদর্শনের উদ্বিগ্নতায়।
ললাটে উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে নীল শিরা, করাল যেন জাল; কালের নীল
অঙ্গুলি যেন সেই ললাটে বিখ্যাত মরণের শেষ তারিখখানি লিখে দিয়ে
যাচ্ছে।
মুখ খুলতে পারছেন না, অথচ দশনের শুষ্কতাকে ভেদ ক'রে একটি উষ্ণবাষ্প
নিগূঢ় নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশছে; সৃষ্টি করছে মৃগতৃষ্ণিকার একখানি তরঙ্গিত
ধূসরচিত্র।
শ্যাম হয়ে গেছে রসনা।

কথা-বলার শক্তি নেই, চোখে-দেখার শক্তি নেই। মহারাজের সমস্ত শরীর যেন স্পর্শ করতে চাইছে, প্রণয়িণীর মত মূর্চ্ছাদেবীকে ;—যিনি নিখিল বিশ্বাসের বিশ্রান্তি।

মৃত্যুর এই ছবিখানি দুর্দর্শন :—

যেন উপদ্রবের উদ্যোগ,
যেন শীর্ণতা তার কঙ্কাল-তূণ থেকে শেষ অস্ত্রখানি হেনেছে,
যেন ক্ষয়ের ক্ষেত্র,
যেন মহাকাল এঁকে ক্রোড়ে নিয়ে নাচছেন,
যেন এঁরই দিকে চেয়ে আছে দক্ষিণ দিক্,
পান করছে পীড়া,
লোল জিহ্বায় গিলছে জাগরণ,
বিবর্ণতার রক্তহীন গৃহ,
যেন বেঁটে বিলিয়ে দিচ্ছে বেদনা,
যেন দুঃখের এক লুণ্ঠিত পণ্য,
যেন দৈবের মহামার।

নিয়তি যেন শেষ-দেখা দেখছে,
অনিত্যতা যেন শেষ-আঘ্রাণ নিয়ে গেল,
অভাব এখানে অভিভূত।

—মৃত্যুর এই হেন সাম্রাজ্য!

এঁকে কি অবকাশ দেবে না ক্লেশ?
এ ঘর ছাড়বে না কি দুরাশা?
দূরে থামবে না কি সময়?
বাধা পাবে না কি শেষ-নিঃশ্বাস?

হর্ষদেব চোখের সামনে দেখতে পেলেন—মহারাজের দ্বারে যেন—

দীর্ঘনিদ্রা আজ দৌবারিক,
মুখখানি মহাপ্রয়াণের স্তব,
জিহ্বাগ্রে সমাসীন শুধু যমরাজ।

এবং—

বিরল বাক্য, চঞ্চল চিত্ত, বিহ্বল দেহ, ক্ষীণ আয়ুঃ, প্রচুর প্রলাপ, অশ্রান্ত শ্বাস, ব্যাধির পরাধীনতা, জৃম্ভার জয়,—এর মধ্যে তাঁর পিতৃদেবের আসন্নতায় লতার মত নুয়ে রয়েছেন তাঁর মাতা মহারাণী যশোবতী—

জল শুকিয়ে গেছে তাঁর চোখে,
হাতের চামর কখনো দোলে, কখনো দোলে না,
নিঃশ্বাসের বাতাস যেন প্রেমের হাওয়া।

মহারাণী ব'সে রয়েছেন—কত রকমের ঔষধ, কত রকমের প্রলেপ, কত চূর্ণের ধূলায় ধূসর তাঁর অঙ্গ,—আর থেকে থেকে তিনি বলছেন—

"আর্য্যপুত্র, তুমি একটু ঘুমোও, ঘুমিয়েছ কি ?"

চীৎকারের মত এসে বাজল এই স্নিগ্ধ কণ্ঠ ;
হর্ষদেব দেখতে পেলেন তার পিতাকে—

পিতার মাথায় মায়ের মাথা এসে ঠেকেছে,
পিতার বুকে মাতৃবক্ষের সেই শীতল শ্রদ্ধা।

জীবনে এই প্রথম দুঃখ পাওয়া।—
তার হঠাৎ-আক্রমণে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হর্ষ।
অদ্ভুত আশঙ্কা নিয়ে কালো মেঘের মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নিয়তি
স্থির জানতে পারলেন—পিতৃদেব আজ নিয়েছেন মহাপ্রস্থানের পথ।
হঠাৎ মনে হ'ল,

অন্তঃকরণ ছিঁড়ে রক্ত ঝ'রে পড়ল
ধৈর্য্য তাঁকে ত্যাগ ক'রে গেল,
ফসল বুনল ক্ষোভ,
শ্রদ্ধারতিতে এল বিরতি।

মনে হ'ল—কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল দেহে,
কে যেন বিষ মাখিয়ে দিয়ে গেল ইন্দ্রিয়ে।
পাতাল বুঝি এত কালো নয়,
আকাশ বুঝি এত শূন্য নয়।
কে বলে দেবে, কী করা উচিত!

ধীরে ধীরে মহারাজের ব্যাধির সম্মুখে,—নিদারুণ ভীতিকে স্পর্শ করল হর্ষদেবের হৃদয়, এবং ক্ষিতিতলকে স্পর্শ করল তাঁর অবলুণ্ঠিত শির।

পালঙ্ক-লীন মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন সেই অবস্থাতেও দূর থেকে দেখতে পেলেন তাঁর অতি-স্নেহের পুত্রকে। স্নেহের প্রবল বন্যা ভাসিয়ে দেয় মন; আপনা থেকেই প্রসারিত হ'ল শীর্ণ দুটি বাহু। ক্ষীণকণ্ঠ ব'লে উঠল,

"এসেছিস, তুই এসেছিস?"

পালঙ্কের উপরে,—আধখানি উঠে বসল তাঁর শরীর।

বিনয়াবনম্র হর্ষদেব পিতার কাছে এগিয়ে এলেন সসম্ভ্রমে।

শীর্ণবাহুর ক্ষীণ-শক্তি দিয়ে হর্ষদেবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মহারাজ—

যেন প্রেম প্রবেশ করল চন্দ্রের শীতলতায়,
মহাসরোবরের অমৃতে এ কোন্ অপূর্ব্ব অবগাহন,
হরিচন্দনের নির্ঝরিণীতে এ কোন্ মহাস্নান!

কে যেন তুষারের আর্দ্রবিন্দুতে অভিষেক ক'রে চ'লে গেল।
পীড়া দিলেও অঙ্গ জড়িয়ে রইল অঙ্গকে,
কপোল লগ্ন হয়ে রইল কপোলে,
নিমীলিত দুটি চক্ষুর অশ্রু মিশে গেল,—
নিমীলিত আর দুটি চক্ষুর অশ্রুতে।
ভালবাসা কি ভুলিয়ে দেয় জ্বরের তাপ?
ভালবাসা কি মিটিয়ে দেয় দেহের ব্যথা?

—অনেকক্ষণ মহারাজ আলিঙ্গন ক'রে রইলেন কুমারকে। তারপরে হর্ষদেব ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গন-বিমুক্ত ক'রে, জননীকে প্রণাম ক'রে শয্যাপ্রান্তে এসে বসলেন।

মৃত্যুদীন মহারাজের চক্ষু নিশ্চল-নিমেষে পান করতে লাগল কুমারকে। আবার তাঁকে কাছে ডেকে কম্পিত-হস্তে তাঁকে বারম্বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্ষয়-ক্ষীণ-কণ্ঠে অতিকষ্টে মহারাজ বললেন—

"হর্ষ, তুই বড় রোগা হয়েছিস।"

ভণ্ডী কাছেই ছিল দাঁড়িয়ে, সে ব'লে উঠল—

"দেব, আজ তিন দিন হ'ল কুমারের আহার হয় নি।"

ভণ্ডীর কথা শুনে মহারাজের চোখ জলে ভ'রে উঠল। সেই জলের ধারা রক্তহীন নাসিকার দুটি পাশ বেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসকে তরঙ্গিত ক'রে ভিজিয়ে শিথিল ক'রে দিল মুখের অক্ষরগুলোকে।

অতি ক্লেশে কোনরকমে মহারাজ বললেন—

"হর্ষ, তোকে জানি। জানি, তোর নরম মন বাপকে কতখানি ভালবাসে। এই রকম অবস্থায় পড়লে জ্ঞানীদেরও বুদ্ধি বিহ্বল হয়। স্নেহ শ্রদ্ধা, কী যে না ক'রে বসে, তা বলা যায় না! তাই তোকে বলি, এখন আর শোক ক'রে কি হবে! নিজেকে সাম্‌লে নে। তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস, ধারালো ছুরি আমাকে কাটছে। সুখ বলো, রাজ্য বলো, বংশ, আমার সমস্ত প্রাণ, তোর জন্যেই কাঁদে। যেমন আমার, তেমনি আবার আমার প্রজাদের। তুই বংশের তিলক, জন্মান্তরের সুফল। তোর জীবনের রেখায় আমি দেখেছি—চতুঃসমুদ্রের আধিপত্য তোর করতলগত। জীবনে যা কিছু চেয়েছিলুম, তা সব ফলেছে তোকে পাবার পর থেকে। আজ আমার রিক্ত হয়ে গেছে জীবনের স্পৃহা। ওযুধ ভাল লাগে না; বৈদ্যদের অনুরোধই আমাকে খাওয়ায়। জেনে রাখিস, বাপ মা জন্ম দেয়, কিন্তু রাজার প্রকৃত বন্ধুই হচ্ছে প্রজা;—জ্ঞাতিরা নয়। মিছে ভাবিস নি। সোজা হয়ে দাঁড়া, কর্ত্তব্য ক'রে যা। যাও, খেয়ে এস; তোর খাওয়া হ'লেই আমি পথ্য করব।"

বেদনার বহ্নি আরও উগ্র তেজে জ্ব'লে উঠল হর্ষের হৃদয়ে। ক্ষণকাল তিনি পালঙ্ক থেকে উঠতে পারলেন না। মহারাজ আবার তাঁকে আদেশ দিলেন। তখন যেন ভূতগ্রস্তের মত, ভাঙা-চমক, বেরিয়ে গেলেন শুভ্রাতিশুভ্র সেই মহল থেকে।

মন হৃদয়টাকে চীৎকার ক'রে বললে—

"ওরে এই তো প্রলয়, এই তো নির্ম্মেঘ বজ্রপাত! সামান্য একটা শোককে এখনও চেনো নি?

শোকই তো মৃত্যু,—শুধু এর নিঃশ্বাস বয়;

শোকই তো বিপুল ব্যাধি,—শুধু এর চিকিৎসা নেই;

শোকই তো আগুনে-ঝাঁপিয়ে-পড়া,—শুধু কুড়িয়ে পাওয়া যায় না
এর ছাই ;
শোকই তো নরকবাস,—না মরলেও ভোগ হয়।
নিরগ্নি অঙ্গার-বর্ষণের মত এই শোক।
এই শোক করাত-দিয়ে-কাটার মত,—শুধু দেহখানা টুকরো টুকরো
হয়ে যায় না ;
বজ্রহীরের সূচ দিয়ে বেঁধার মত,—শুধু দেখতে পাওয়া যায় না ক্ষত।
সাধারণ শোকই যদি এই ধরণের হয়, তা হ'লে না জানি বিশেষ শোকের
ব্যবস্থাটা কি! এখন কি করা উচিত!" •

ধীরে ধীরে হর্ষদেব রাজপুরুষদের সমভিব্যাহারে নিজের মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সম্মুখে রক্ষিত হ'ল বিবিধ ভোজ্য-সামগ্রী।

গ্রাস কি মুখে তোলা যায়!

চোখের জলের ভিতর দিয়ে প্রথম গ্রাস যখন মুখে উঠল, তখন মনে হ'ল—খাবার নয়, এ ধোঁয়ার পুঞ্জ। দ্বিতীয় গ্রাস—যেন আগুনের ডেলা,—হৃদয়খানাকে পুড়িয়ে দিলে। তৃতীয় গ্রাস—যেন বিষ,—মূর্চ্ছা আনবে না তো? চতুর্থ গ্রাস—মুখে তুলতে ঘেন্না হ'ল—মহাপাতক করছি না তো? পঞ্চম গ্রাস—আনল বেদনা—অন্ন নয়, এ যেন ক্ষার।

কোন রকমে আচমন সেরে চামরগ্রাহীকে আদেশ দিলেন হর্ষ—"যাও, জেনে এস, পিতৃদেব এখন কেমন আছেন!" চামরগ্রাহী ক্ষণকালের মধ্যেই ফিরে এসে নিবেদন করল, "দেব, সেই রকমই রয়েছেন।"

শুনে হর্ষের ভুল হয়ে গেল তাম্বূল-সেবা। তম্‌তম্ করতে লাগল মন।

তারপরে দিনান্তে সূর্য্য যখন পাটে বসেছেন, তখন অন্তিকাগারে বৈদ্যদের আহ্বান ক'রে, এই রকম সময়ে কি করা বিধেয়, জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, বিষণ্ণহৃদয়ে। তাঁরা শেষ বিচার ক'রে বললেন—

"দেব, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। কয়েক দিনের মধ্যেই শুনতে পাবেন, আপনার পিতা প্রকৃতির স্বকীয়তাকে আশ্রয় ক'রে সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"

পুনর্বসু-সদৃশ ভেষজদের মধ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন অষ্টাদশবর্ষ-দেশীয় এক যুবা,—"রসায়ন" তাঁর নাম। রাজকুলের আশ্রয়ে থেকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন তিনি। সুতনির্ব্বিশেষে মহারাজ তাঁকে লালন করেছিলেন। অসাধারণ প্রজ্ঞা! ব্যাধির স্বরূপনির্ণয়ে তাঁর মত কেউ ছিল না।

সেই বৈদ্য-কুমারক রসায়নই শুধু সাশ্রুনেত্রে অধোমুখে স্তব্ধ হয়ে সেখানে ব'সে রইলেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজকুমার, "সখে রসায়ন, তথ্য বল, অমঙ্গলের কিছু আশঙ্কা দেখছ কি?"

তিনি বললেন—

"কাল সকাল হোক, অবস্থার যাথার্থ্য আপনাকে জানাব।"

এমন সময়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে—

মহারাজের পদ্মবনের মালাকর—

চক্রবাককে আশ্বাস দিয়ে অপরবক্ত্র ছন্দে উচ্চকণ্ঠে এইটি পাঠ করল :—

"বিহগ কুরু দৃঢ়ং মনঃ স্বয়ং ত্যজ শুচমাশ্ব বিবেকবর্ত্মনি
সহ কমলসরোজিনী-শ্রিয়া শ্রয়তি সুমেরুশিরো বিরোচনঃ।"*

পাঠ শুনে বাক্য-নিমিত্তজ্ঞ হর্ষদেব কেমন যেন বুঝতে পারলেন! পিতার জীবন সম্বন্ধে যে একটি ক্ষীণ আশা এতক্ষণ তাঁর ছিল, সেটিও যেন শিথিল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘরে গেলেন বৈদ্যসঙ্ঘ; সাহস ট'লে গেছে। তার পরে রাত্রে হর্ষদেব পুনর্বার প্রবেশ করলেন মহারাজের শয়নাগারে। সেখানে ব'সে নিম্নকণ্ঠে মহারাজের কাতরধ্বনি শোনা—আর শোনা!

"বড্ড জ্বলছে, জ্বালা। হরিণি, হারটা নিয়ে আয়! বৈদেহি, দে তো একবার মণির দর্পণখানা।
লীলাবতীকে বল্, বরফের কুচি দিয়ে কপালটা একটু মেজে দিক।

* ওরে বিহঙ্গ, মনটিকে দৃঢ় কর;
শোকের পথ ছেড়ে বিবেকের পথখানি ধর।
জান নাকি, সুমেরুর শিরে যখন আশ্রয় নেন সূর্য্য
তখন তাঁর সঙ্গেই থাকেন পদ্ম-সায়রের লক্ষ্মী।"

ঘনসারের গুড়ো আনতে বলত শুভ্রাক্ষিকে।

ওরে কান্তিমতি, চন্দ্রকান্ত-মণিখানা একবার চোখের উপর রাখ্।

ওরে কলাবতি, চারুমতি, পাটলিকা, ইন্দুমতি,—বড় জ্বালা, বড় আগুন। গালের উপর পদ্ম বোলা, চন্দন দে, একটু বাতাস দে, ঠাণ্ডা বাতাস! পাখাটাতে জল ঢেলে বাতাস কর্।

মালতীকে বলো, নতুন মৃণাল নিয়ে আসবে;—মাথা ঘুরছে, বন্ধুমতি, বেঁধে দে।

ধারণিকে, কাঁধটাকে একটু তুলে ধর্ তো। ভিজে হাত বোলা তো বুকের উপর, হাত দুটো একটু টিপে দে, বড় ব্যথা করছে গোড়ালিতে।

অনঙ্গসেনা, খুব জোরে জড়িয়ে ধর তো একবার আমাকে।

ক'টা বাজল? ঘুমের নাম নেই! কেবল জ্বালা, জ্বালা!

ওরে কুমুদ্বতি, কথা ক'য়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখ্ না।"

পদ্মাবতী, বলাহিকা, কুরঙ্গবতীকে,—যখন এই সব কথা ক্লান্তকণ্ঠে বলছিলেন মহারাজ পিতৃদেব, তখন কে যেন নোড়া দিয়ে শিলে পিষতে লাগল হর্ষদেবকে। একটু জল, একটু পদ্ম, একটু তুষার, একটু বাতাসের জন্যে মহারাজ আজ খোসামোদ করছেন দাসীদের! দুঃখদীর্ঘ রজনী জাগ্রত কেটে গেল হর্ষের।

ভোর হয়, ভোর হ'ল।

হর্ষদেব রাজদ্বারে এসে দেখলেন—'পরিবর্দ্ধক' তুরঙ্গ নিয়ে এসেছে। কিন্তু অশ্বারোহণ করতে পারলেন না, পদব্রজেই ফিরে এলেন নিজের মন্দিরে। সেখানে পৌঁছে ভ্রাতাকে আনয়ন করবার উদ্দেশ্যে উপর্য্যুপরি ক্ষিপ্রগামী দীর্ঘাধ্বগদের, ঘোড়-সোয়ারদের, উষ্ট্রপালদের পাঠালেন। তারপরে মুখ প্রক্ষালন ক'রে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন ভৃত্যদের হাত থেকে গ্রহণ করতে পারলেন না প্রসাধন। সম্মুখেই যে সব রাজপুত-যুবকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে চেয়ে নিজের মনেই যেন অব্যক্ত জল্পনা করতে লাগলেন, "রসায়ন রসায়ন!" নিজের কথার উত্তরই যেন পুনর্ব্বার বললে—

"কি বললুম? রসায়ন! আর তাকে ডেকেই বা কি হবে?"

রাজপুত-যুবকেরা যুগপৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
বারম্বার একই প্রশ্ন বর্ষিত হতে লাগল তাদের উপর, "ডাক, রসায়নকে ডাক।"
—শেষে তারা কোনপ্রকারে ব'লে ফেলল,

"দেব, তিনি অগ্নিপ্রবেশ করেছেন।"

উত্তর শুনে হর্ষদেব সদ্য-সদ্য বিবর্ণ হয়ে গেলেন।—তিনিই যেন আগুনে প্রবেশ করছেন!
একটা অন্ধ শোক হৃদয়টাকে যেন পাঁজরার ভিতর থেকে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে! কে যেন মনের ভিতর দাঁড়িয়ে, কথা ব'লে উঠল,—

"আসল-অভিজাত পুরুষ নিজেকে শেষ ক'রে ফেলবে, তাও ভাল, তবু অমানুষের মত শোনাতে আসবে না, যা অপ্রিয়, যা অপ্রীতিকর। দুঃখের দিনে অগ্নিপ্রবেশ ক'রে রসায়ন সংসারকে যা দেখিয়ে গেলেন, তাতে তাঁর উন্নত-বংশমর্য্যাদা, এবং সেই মর্য্যাদার কল্যাণপ্রকৃতি, অগ্নিমান স্বর্ণের মত উজ্জ্বলতম হয়ে দীপ্তিময় হয়ে উঠছে।"

পরক্ষণেই চিন্তা গ্রাস করল হর্ষকে—
"এই কি ওর উচিত কাজ হ'ল? না, এ স্নেহের শোধ? আমার বাপ কি ওর বাপ নয়? আমার মা কি ওর মা ছিল না? আমরা কি ওর ভাই নই? গৃহস্থের ঘরে যখন গৃহস্বামী পরলোকে যান, তখন তাঁর ভৃত্যদের কাছে জীবন-যাপন একটা লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর যেখানে প্রভু—একটি অমৃতের কূপ, যাঁর প্রসাদ কখনও নিষ্ফল হয় না, যিনি একজন মহাধন্য মহারাজ—তাঁর অন্তর্দ্ধানে তাঁর অনুজীবীদের কী যে হবে তা ভাবতেও পারা যায় না। ভালই করেছে, নিজেকে পুড়িয়ে সে সৎকার করেছে। আর পুড়বেই বা কী? আকল্পস্থায়ী যশোরাশির পুড়বেই বা কী? ও তো কেবল আগুনে প্রবেশ করেছে, পুড়ছি তো আমরা! ধন্য আজ রসায়ন,—ঐ-ই পুণ্যের পথ দেখিয়ে পুণ্যচয়ীদের অগ্রণী হয়ে চ'লে গেল। ঐ একটি কুলপুত্রের বিয়োগে আজ রাজকুল পুণ্যহীন। আমারই বা এই পৃথিবীতে কী এমন বিশেষ করণীয় প'ড়ে রয়েছে, কী এমন কার্য্যভার, জীবনের ব্যাপৃতি, যার জন্যে আমার নির্ম্মম প্রাণ মর্ম্ম ভেঙে এখনো বেরিয়ে যাচ্ছে না? কী এমন অন্তরায় রয়েছে?"

রাজপুরীতে যেতে পারলেন না হর্ষদেব। মুষড়ে পড়লেন, কোনো কাজ করবার সামর্থ্য রইল না। শয্যায় উপুড় হয়ে, উত্তরীয়বাসে নিজের মাথাটিকে গুণ্ঠিত ক'রে প'ড়ে রইলেন।

মহারাজের এই অবস্থা, হর্ষদেবের এই ;—
সর্ব্বলোক বিমূঢ় হয়ে গেল।

লক্ষ লক্ষ হাত পেরেক-ঠোকা হয়ে রইল লক্ষ লক্ষ কপোলে,
লক্ষ লক্ষ চক্ষে অশ্রুর আল্‌পনা,
নাসাগ্রে গ্রথিত হ'ল লক্ষ লক্ষ দৃষ্টি,
রোদন-ধ্বনি উৎকীর্ণ হয়ে রইল লক্ষ লক্ষ কর্ণে।
লক্ষ লক্ষ জিহ্বা অতি সহজে একটি কথাই বলল 'কি কষ্ট, কি কষ্ট'!
লক্ষ লক্ষ মুখের কাছে দীর্ঘশ্বাসগুলো বেঁকে যেতে লাগল, শুকনো পাতার মত ;
বিলাপের অক্ষরগুলো লেখা হয়ে থাকল লক্ষ লক্ষ অধরে,
আর লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে বইতে লাগল দুঃখের ঝঞ্ঝা।

অশ্রুর উষ্ণতায় পাছে দগ্ধ হই—এই ভয়ে নিদ্রা প্রবেশ করল না রাজপুরীর নেত্রমন্দিরে।

দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে কেঁপে উঠে বিলীন হ'ল রাজ্যের হাস্য।
দুঃখের তাপে নিরবশেষ দগ্ধ হয়ে গেল, অস্তিত্ব রইল না ভাষার।

এত লোক, এত জনতা, অথচ একটা ঠাট্টা নেই, তামাসা নেই! কথা বন্ধ, আহার-ত্যাগ। গীতগোষ্ঠীগুলো কোথায় লুকাল,—কেউ তো জানেও না। কোথায় মিলিয়ে গেল ললিত অঙ্গহার, অভিনয়, বাসকসজ্জা :—ছিল ব'লে কারও যেন মনে পড়ে না। যেন জন্মজন্মান্তরের ব্যবধানে অতীত হয়ে গেছে। খোঁপায় দুটো ফুল দেবে, মুখে একটু পরাগ,—স্বপ্নেও এ কথা কেউ ভাবতে পারল না। সীধুপানের আপানগুলি আজ আকাশকুসুম। আনন্দ-সুখ যেন ফিরে চ'লে গেছে যুগান্তরে। আবার যেন শোকাগ্নিতে নতুন ক'রে মদন হলেন ভস্ম।

ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে, প্রকৃতিতে, পাঞ্চভৌতিক মহোৎপাতের ভীতিপ্রদ অশুভলক্ষণ দেখা দিতে লাগল। সকলেই বুঝতে পারল মহাপুরুষের বিনিপাতের সময় এসেছে।

পৃথ্বীপতির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে'—এই ভেবে চঞ্চলা হয়ে উঠলেন ধরিত্রী, দুলে উঠল দিগ্‌দিগন্তের সপ্তপর্ব্বত, হ'ল ভূমিকম্প।

ঘূর্ণিচক্রে ঘুরে ঘুরে দুলে উঠল সপ্তসমুদ্র,—আঘাতের পর আঘাত লেগে সে কী তরঙ্গের বাচালতা!—

এমনি বিক্ষোভ হয়েছিল আর একদিন, যেদিন ধন্বন্তরি উঠেছিলেন সমুদ্র মধ্যে, অমৃতের পাত্র হাতে নিয়ে;

সমুদ্রেরা আবার যেন তাঁকে মন্থন ক'রে তুলছেন মহারাজের শেষ-চিকিৎসার উদ্দেশ্যে।

ধূমকেতু দেখা দিল আকাশে,—অগ্নিবর্ণ বিরাট পুচ্ছের কুটিলতা নিয়ে; তারা যেন আর্ত্তা দিগ্বধূদের বিকট-কুটিল স্রস্ত শিখা-কলাপ। ধূমকেতুদের করাল অভ্যুদয়ে ধূম্র হ'ল দিঙ্‌মুখ; দেখে মনে হ'ল—দিক্‌পালেরা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন আয়ুষ্কাম হোম, ধূমের ধূম্রতায় ছেয়ে ফেলেছেন মেদিনী।

সূর্য্য তখন ভ্রষ্টশ্রী, একটা গন্‌গনে লোহার ঘড়ার মত লালচে-খয়েরী তাঁর চেহারা; তাঁর কলঙ্কচিহ্নটিকে দেখে মনে হ'ল মহারাজের দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে কে না জানি এক পুরুষ—মুণ্ডহীন এক কবন্ধের ছলায় বলিদান দিচ্ছে নিজেকে।

অগ্নিভাস্বরতায় জ্ব'লে উঠল চন্দ্রমণ্ডল; রাহুর গ্রাসের ত্রাসে চাঁদ যেন নিজের চতুর্দ্দিকে রচনা করেছেন অগ্নিপ্রাকার।

হ'ল দিগ্দাহ;—রাজ-রঞ্জনী দিগ্বধূরা যেন চিতায় উঠতে চলেছেন সহমরণে।

রক্তবিন্দুর ধারাবর্ষণে রাঙা হয়ে গেল বধূকা বসুধা; অনুমরণে যাবার উদ্দেশ্যে যেন তিনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, লাল চেলী প'রে।

আকাশের দিকে দিকে কোথাও কিছু নেই, লোহার কপাটের মত অকালে দেখা দিল কালমেঘের ভীষণতা;

যেন তারা লোকপাল: মহারাজের বিনাশ-সম্ভ্রমে ভীত হয়ে হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিল দিক্‌দ্বার।

নির্ঘাতের সে কী হৃদয়স্ফোটন নির্ঘোষ!

মনে হ'ল প্রেতপতি যাত্রা করেছেন,

এবং তাঁর যাত্রা-পথে আরটন করছে ঘনঘোর প্রেত-দুন্দুভি।

সূর্য্যকে ধূসর ক'রে দিয়ে হঠাৎ হ'ল পাংশুর বৃষ্টি; উষ্ট্র-লোমের মত কপিল-বর্ণ পাংশু; যেন আকাশ-পথে ধূলো ঝরিয়ে চলেছে কৃতান্তবাহি, মহিষের খুর।

আকাশে উল্কাপাতের মত মাটিতেও উঠল উল্কামুখী শৃগালদের বিকট কলরব!

হঠাৎ দেখা গেল, রাজপুরীতে কুলদেবতাদের যে সকল প্রতিমা ছিল—তাদের মাথার চুল থেকে নির্গত হচ্ছে ধূম।

একদল ভ্রমর, কোথাও কিছু নেই, রাজসিংহাসনের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল; —যেন কালরাত্রির কুটিল বেণী দুলছে।

অন্তঃপুরের অলিন্দে দাঁড়কাকগুলোর কী উল্লম্ফিত চীৎকার! এক মুহূর্ত্তও কি এই হতভাগাগুলো শান্ত থাকতে জানে না?

একটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ শকুনি রাজপুরীর শ্বেত-ছত্রের মাথায় এসে বসল; ছত্রে ছিল মাণিক্য; লাল, কাঁচা, মাংসের টুক্‌রো ভেবে—রাজ্যের প্রাণের মত— সেটিকে ছিঁড়ে ফেলে দিল সে।

মহোৎপাতের বিভীষিকার মধ্য দিয়ে দেখতে দেখতে কেটে গেল মহারাত্রি।

পরের দিন। নিজ মন্দিরে সমাসীন আছেন হর্ষদেব।

এমন সময় বাতায়ন-পথে তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন রাজ-অন্তঃপুর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল প্রতিহারী।

বিষাদের বিজয়-ঘোষণার মত দূর থেকে শোনা গেল স্রস্ত অলঙ্কারের ঝঙ্কার;

তার চরণ-মঞ্জীরের ব্যাকুল ধ্বনিতে বাচাল হয়ে উঠল ভবন-হংসীরা;—তারা দূর থেকেই যেন গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে?'

প্রতিহারী অমন ক'রে চলে কেন? চোখের জলে তবে কি ও অন্ধ হয়ে গেছে? তা না হ'লে গৃহ-সারসীরা ওকে পথ দেখিয়েই বা দেবে কেন? ওর মুখখানি লাল রঙের কাপড় দিয়ে ঢাকা কেন? না, তা তো নয়। নিশ্চয়ই কক্ষের কপাটগুলো দেখতে পায় নি, তাই কপাটের আঘাত লেগে ললাট ফেটে রক্ত ঝরছে। আহা, কি হ'ল ওর! হাত থেকে বেত্রলতা খ'সে যাচ্ছে,—যেন সোনার বলয়গুলো বিষাদের আগুনে গ'লে গিয়ে হাত থেকে ঝরিয়ে দিচ্ছে রসধারা। এত হাঁপাতে হাঁপাতে আসে কেন?

গলার শুভ্র উত্তরী মুখের বাতাসে দোল খেয়ে যাচ্ছে,—যেন ফণিনী তার দেহ থেকে টেনে খুলে ফেলছে নির্মোক-মঞ্জরী। কবরীর রচনা নেই, নীচু কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, তমাল-পল্লবের মত গাঢ়নীল গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের পুঞ্জতা।

'এ যে বেলা!'—মহাদেবী যশোবতীর প্রতিহারী!

অমন ক'রে বুক চাপড়ায় কেন?

আহা, চোখের জলে পুড়ে গিয়ে, তামা হয়ে গেছে ওর হাত। ঝর্ণার মত ঝরছে চোখ।

দেখতে দেখতে প্রতিহারী 'বেলা' হর্ষদেবের সমীপে এসে উপস্থিত হ'ল। প্রত্যেক পুরুষকে সে জিজ্ঞাসা করছে, 'কুমার কোথায়, কুমার কোথায়?'

উপস্থিত জনতার বিষণ্ণনয়ন বেলাকে স্বাগত জানাল। কিন্তু বেলা মুখ তুলতে পারল না। কুট্টিমের উপর হাত রাখল। ধূসর অধরে শুষ্কতর কাঠিন্য; কোন রকমে নিবেদন করলে,—

"দেব, রক্ষা করুন। মহারাজ এখনও জীবিত রয়েছেন,
কিন্তু মহাদেবী কী আরম্ভ করেছেন দেখুন।"

এক মহাশোকের অভিভূতির পর আর এক মহাশোকের আবির্ভাব!

চিত্ত যেন চ্যুত হ'ল,
দুঃখ যেন গলিয়ে দিল,

চিন্তা যেন মাতাল হ'ল,—
আতঙ্ক !—অঙ্গীকার করল হর্ষকে।

দু-দুটো সন্তাপ যেন দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করছে প্রাণকে। চেতনা কি অচেতন ? তারপরে জ্ঞান ফিরে এল।

মন বললে—

"বারম্বার তোর হৃদয়ের সঙ্গে ঘটছে দুঃখের পরিচয়, শোকের পরিচয় ; কঠিন পাথরের মত নির্ম্মম তোর দেহ, তার উপর শোকের লোহার হাতুড়ি পড়ছে, পিটছে। দেখা দিচ্ছে শুধু স্ফুলিঙ্গের স্ফূর্ত্তি ; এ তো দেহশেষ ভস্ম নয়।"

উঠে পড়লেন হর্ষদেব। দ্রুতপদে প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। দূর থেকেই তাঁর প্রাণে এসে বাজল—মৃত্যুকামিনী রাজমহিষীদের বিলাপের প্রলাপ :—

কেউ বলছেন,—"ওরে আমার আমগাছ, নিজের কথা এখন থেকে নিজেই ভাবিস ; তোর মা, এবার চলল,—প্রবাসে।"

কেউ বলছেন—"যুঁই ফুল, আমি চললুম, আমায় বিদায় দে। ওরে আমার ডালিম ফুলের লতা, আমায় আর চাস নে।"

কেউ বলছেন,—"অশোক ফুল, রঙীন ফুল ! আমাদের ক্ষমা করিস, আর তোর গায়ে পা দেব না। মার্জ্জনা করিস অপরাধ। তোর পাতা ছিঁড়ে নিয়ে, কানে আর দুল দোলাব না।

ওরে আমার বকুলশিশু, বারুণীর গণ্ডূষ দিয়ে তোকে বড়টি করেছি, এই হ'ল আমাদের শেষ দেখা।"

একটি মহিষী বলছেন,—"প্রিয়ঙ্গুর লতা, আমায় জড়িয়ে ধর্, দুর্লভ হব।"

আবার কেউ ভবনদ্বারের শিশু সহকারকে বলছেন,—"তোরাই তো আমার ছেলে, নিবাপ-জলের অঞ্জলি তোরাই তো আমায় দিবি।"

পিঞ্জরের শুক-পাখীকে কেউ বলছেন,—"ভুলবি না ? তাই কি এত ডাকছিস ? আমি এখন দূর থেকে আরও দূরে যাচ্ছি।"

আর এক মহিষী বলছেন,—"মাগো, কাকে দিয়ে যাব ময়ূরটাকে? ও যে আমার পথে পথে ফিরত। দেখিস লবলিকে, এই হাঁসের জোড়াকে আমার ছেলেমেয়ের মত লালন করিস। এমন আমার পোড়া কপাল যে, চখাচুটোর সাধের বিয়েটা আমি দিতে পারলুম না।"

আর এক মহিষী বলছেন,—"চন্দ্রসেনা, নিয়ে আয় আমার বীণাখানা, একবার একটু জড়িয়ে ধরি। আর, শোন্, আমাকে একটু সাজিয়ে দে। বিন্দুমতি, তোর কাছে আমার এই শেষ-বন্দনা। ওরে আমার পোষা দাসী, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমার পা।"

গৈরিক-বসনা বিধবা কাত্যায়নীকে এক মহিষী বলছেন,—

"শুধু শুধু কাঁদিস কেন বোন, আমি অলক্ষুণে। কঞ্চুকি, চারিদিকে কি ঘুরতে আছে? ধাত্রেয়ি, নিজেকে সামলে রাখিস, পায়ের উপর লুটোস নি। তার চেয়ে বোন, যাকে আর দেখতে পাবি না, তার গলাটা একটু জড়িয়ে থাক্।"

আর একটি মহিষী বলছেন,—"কুরঙ্গবতি, বিদায়-অঞ্জলি নাও। সানুমতি, শেষ-প্রণাম। কুবলয়বতি, আমার অবসান-আলিঙ্গন। ওগো সখীরা, ভালবাসার ঝগড়া অনেক করেছি, সব কিছু ক্ষমা ক'রে দিস, ভুলে যাস।"

হর্ষদেবের কান পুড়ে যেতে লাগল।

মাতৃদেবীর মন্দিরে তিনি প্রবেশ করলেন।

থম্‌কে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে :—বজ্রাহত।

দেখলেন—মাতা যশোবতী অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে চলেছেন;—সব-দান—কেবল-দান; গ্রহণ করেছেন মৃত্যুর প্রসাধন। পতির লোচনাগ্রে যেন অগ্নিপ্রবেশ করতে চলেছেন দেবী জানকী।

সদ্য-স্নানে আর্দ্র তাঁর অঙ্গ,
আকাশের মত পূত নির্ম্মল তাঁর দেহ;
পরিধানে রয়েছে সান্ধ্য তেজের মত কুসুম্ভ-বস্ত্র দুখানি বসন।

তাম্বূলের রঞ্জিত-সোহাগে অন্ধকার তাঁর অধরপুট,—যেন মুখখানি পরিধান করেছে সধবার মরণ-মাঙ্গলিক লালধারি কাপড়।
মাতৃস্তনের অবকাশ দিয়ে নেমে পড়েছে রক্তিম কণ্ঠসূত্র;—হৃদয়-চেরা যেন রুধিরের ধারা।
সর্ব্বাঙ্গে সরস কুঙ্কুমের অঙ্গরাগ। সে কি চিতাগ্নির লেলিহান ঔৎসুক্য?
অংশুকের উপর টপ্‌টপ্‌ ক'রে ঝ'রে পড়ছে অশ্রুর বিন্দু,—চিতার আগুনের উপর যেন অর্চ্চনা-ফুল।

এক-পা এক-পা ক'রে চলেছেন, আর একখানি একখানি ক'রে হাতের বলয় খ'সে খ'সে পড়ছে; গৃহদেবীদের যেন অন্তিম-পূজন।
কণ্ঠ থেকে আপ্রপদী ঢুলছে—যমের ঝুলনার মত কুসুমের প্রগুণ মাল্য।
ভ্রমর-ডাকা কানের পদ্ম বিদায় নিয়ে গেল পুরাতন চোখের, মণিনূপুরের
চৌদিকে মণ্ডল বেঁধে ফিরতে থাকে নূপুরবন্ধু ভবনহংস।
কিন্তু মাতা যশোবতী চলেছেন, মরণের পথে চলেছেন, অচঞ্চল হাতে ধ'রে
রয়েছেন একখানি চিত্রফলক।
চিত্রের চারদিকে অর্চ্চনাবদ্ধ শুভ্রফুলের মাল্য। পতিব্রতা-পতাকার মত
যশোবতী উপগূহন ক'রে রয়েছেন পতির প্রাস এবং যষ্টি। নৃপতির
রাজছত্রটিকে দেখছেন আর টপ্‌টপ্‌ ক'রে ঝ'রে পড়ছে চোখের জল।

সচিবদের চক্ষু রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অশ্রুর প্রবাহ পায়ে পড়তে লাগল
মহারাণীর। তাঁরা বুঝেও বুঝতে পারলেন না তাঁর যাত্রার নির্দ্দেশ।
কোথায় যাবেন, কেন?
বৃদ্ধ বন্ধুরা মহারাণীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন, তাঁরা আর অনুনয় মানছেন না।
প্রাসাদে প্রাসাদে সে কি ক্রন্দনের রোল!
পিঞ্জরের হিংস্র সিংহও গর্জ্জন ক'রে উঠছে।

এ সব কি চোখ দিয়ে দেখা যায়!
মাতা যশোবতীকে আজ সাজিয়ে দিয়েছেন
ধাত্রী এবং নিজের পতিভক্তি;

তাঁকে অবলম্বন ক'রে রয়েছেন
এক জরতী বৃদ্ধা এবং সংস্তুতা মূর্চ্ছা ;
তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে
এক সখী এবং দীর্ণা যন্ত্রণা ;
তাঁকে ঘিরে রয়েছেন
পরিজন এবং সর্ব্বদেহগ্রাসী সন্তাপ,
সম্মুখে চলেছেন কুলপুত্রেরা, এবং পশ্চাতে চলেছেন কঞ্চুকীদল,
এবং বৃদ্ধ শোক ও দীর্ঘশ্বাস।
মহারাজের প্রিয় কুকুরগুলোও মহারাণীর মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে আছে—চক্‌চক্‌ করছে তাদের চোখ।

মাতা যশোবতী ঈর্ষ্যা অসূয়া ভুলে গিয়ে সপত্নীদের প্রণাম করিতে লাগলেন ; চিত্রপুত্রিকাদের জানালেন শেষ আমন্ত্রণ ; গৃহ-পালিত পশুপক্ষীর নিকটে নিলেন বদ্ধাঞ্জলি-বিদায় ; এবং নিবিড় আলিঙ্গন দিলেন ভবন-পাদপদের।
তার পরে আবার চললেন—অচঞ্চল, নির্ভীক-চলা, মরণের পথ।

চোখে ঘনিয়ে এল কৃষ্ণ মেঘের বাষ্পীয় মহিমা।
হর্ষদেব দূর থেকেই বললেন, "মা, আমি কি এমনই অভাগা, যে তুমিও আমায় ত্যাগ করতে চলেছ ? প্রসন্না হও, ফিরে চল।"
এই বলতে বলতে মাতৃদেবীর যুগল চরণে লুটিয়ে পড়ল হর্ষদেবের চূড়া।
দেবী যশোবতী তখন কী করবেন, বুঝতে পারলেন না।
পায়ের উপর মাথা লুটিয়ে পড়েছে ছেলের ! আহা, ওর মনখানা পাগল হয়ে যাবে না তো ? তাঁর ছোট্ট ছেলে, তাঁর কুমার, তাঁর আদরের ছেলে হর্ষ !
প্রকাণ্ড পাহাড় যেন উদ্বেগের বিপুল বেগ নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। এর চেয়ে ভাল ছিল, রসাতলে প্রবেশ করা—মূর্চ্ছার মত যা অন্ধকার।

মহারাণী এতক্ষণ আবেগের যন্ত্রটিকে জোর ক'রে চেপে রেখেছিলেন, কিন্তু সেই পুঞ্জ পুঞ্জ আবেগের মেঘকে স্নেহের বিদ্যুৎ একেবারে খণ্ড খণ্ড ক'রে চিরে দিয়ে চ'লে গেল। চোখের দু-পাড় ভেঙে নেমে এল ধারা।

অসহ্য শোকের আকুতিতে ঘন ঘন কেঁপে উঠল মাতৃবক্ষ; অদ্ভুত-চপল একটি নির্বাণী বিকল ক'রে দিয়ে কী যেন ব'লে গেল; অধরের প্রান্ত দুটি তরল হয়ে উঠল অসামান্য বেদনায়; "না না, কিছু বলতে চাই না"— এই কথাটিই জানাল নাসাপুটের নিবিড়ন। শেষে চোখ দুটিকে মুদ্রিত ক'রে নয়নজলে মহারাণী ভাসিয়ে দিলেন বিমল কপোল দুটির ঘাট।

বসনাঞ্চলের সূক্ষ্ম স্বচ্ছলতা দিয়ে মুখখানিকে ঢেকে ফেললেন মহারাণী।

কী যেন তাঁর মনে প'ড়ে গেছে! এই কুমারটি তাঁর কত আদরের! এ-ই তো একদিন শিশু ছিল। প্রসবকাল থেকে আরম্ভ ক'রে শৈশব পর্য্যন্ত এই ছেলেটিই তাঁর পিত্রালয়ে, তাঁর কোলের কাছে, কোলের পাশে, কোল ঘেঁষে, শুয়ে ব'সে দিন কাটিয়েছে! কী যেন তাঁর মনে প'ড়ে গেল?

সঙ্গে সঙ্গে মহারাণীর মনে পড়ল তাঁর বাপ, তাঁর মায়ের কথা।

আর পারলেন না, বললেন—

"ওরে বাছা, আমার সমস্ত পাপ নিয়ে আমি আজ পরলোকের পথে চলেছি, আমি বড় দুঃখী; আমার দিকে চোখ মেলে তাকাস নে।"

চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন।—

দূর প্রবাসে রয়েছে বড় ছেলে—দেখা হ'ল না।

মেয়ে রয়েছে শ্বশুর ঘরে—দেখা হ'ল না।

নিজেকে, দৈবকে, যমকে ধিক্কার দিতে দিতে বললেন,—

"নিষ্করুণ, আমার মত মানুষ, কী এমন অপরাধ করেছিল তোর কাছে? আমার মত সীমন্তিনীর এত দুঃখও লেখা ছিল কপালে! ছিঃ ছিঃ, যম, তুই আমার সর্ব্বনাশ করলি।"

এই কথা বলতে বলতে গলা ছেড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মহারাণী;—গ্রাম্য-ললনার মত।

দুঃখের বেগ যখন শান্ত হ'ল, তখন মহারাণী পুত্রকে মাটি থেকে সস্নেহে ওঠালেন।

ছেলের চোখের পাতায়,—দেখতে কষ্ট হয়,—চোখের জলের কণা! হাত দিয়ে ছেলের চোখ দুটিকে মুছে দিলেন।

মহারাণীরও সাদা চোখ তখন টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল;

চোখের কোণ বেয়ে ঝরছিল উষ্ণ অশ্রুর জল,

চোখের পাতায় ফুটে উঠেছিল জলের তারা।

যতবার মোছা যায় ততই আবার ভ'রে ওঠে। আর্দ্র কপোলে যে অলকদাম শোকে স্রস্ত হয়ে লগ্ন হয়ে ছিল, সেগুলিকে মহারাণী শ্রবণ-শিখরে তুলে দিলেন; আলুথালু এলোচুলে—যা কুণ্ডলে আটকে গিয়েছিল, সেগুলিকে ঘাড়ের পিছনে দিলেন সরিয়ে; হাত দিয়ে বুকের উপর গুছিয়ে নিলেন খ'সে-পড়া স্তনোত্তরী। কুব্জিকারা দ্রুত নিয়ে এল মবালমুখো রূপোর ঘড়া, তার জলে মুখপদ্মটি করলেন প্রক্ষালন; শুভ্র বাসঃ-শকল ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল কলমূকেরা। তাতে মহারাণী পুঁছে ফেললেন দুখানি হাত। তারপরে নিভৃতনয়নে পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন। ক্ষণকাল।

পুনর্বার দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর বললে—

"হর্ষ, তুই আমার আদরের নোস, গুণী নোস, তোকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত,—এ কথা আমি বলব না। আমার বুকের দুধ-চেনার সঙ্গে সঙ্গে একদিন তুই তো আমার হৃদয়টাও চিনেছিস। আজ আমার প্রভুর অনন্ত প্রসন্নতা আমার দৃষ্টিকে বন্দী ক'রে রেখেছে। তাই তোকে আর দেখতে পাচ্ছে না আমার চোখ। ওরে হর্ষ, রাজ্যের উপকরণ আমি নই। আমি লক্ষ্মীও নই, পৃথিবীও নই,—ওঁদের স্বভাব অন্য-পুরুষদের সোহাগ-কুড়িয়ে-নেওয়া। মহান কুলের আমি বউ, চারিত্র্য আমার ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মশুভ্র কুলে আমার জন্ম। ওরে, কোনদিন ভুলে যাস নি, আমি শত-সমরের বীর প্রকাণ্ডপুরুষের গৃহিণী, কেশরীর স্ত্রী, আমি কেশরিণী। আমি বীরজা, বীরজায়া, আমি বীর-জননী, আমি পরাক্রম-ক্রীতা। আমার কাছে কি

অন্যথা হওয়া সম্ভব ! এই আমার পাণি,—গ্রহণ করেছিলেন ভরত-ভগীরথ-নাভাগের মত নরেন্দ্র-ভগবান তোর পিতৃদেব ; অনন্ত সামন্ত-সীমন্তিনীদের সোনার-কলস-থেকে-ঢালা-জলে সেবিত হয়েছে—এই শিরঃ ; এই ললাট,—লাভ করেছে মনোরথ-দুর্লভ মহাদেবীর পট্টবন্ধ। তোরা যখন ছোট্ট ছিলি, তখন এই পয়োধর দুটির উপরে চীনাংশুক কাঁপত,—শত্রুবধূদের চামর-ঢোলানো বাতাসে। এই ছোট্ট দুটো পা ;—এর উপর প্রণামে নুয়ে পড়েছে কত সপত্নীর অহঙ্কার ; অর্চ্চনায় ঝ'রে পড়েছে জনপদ-বধূদের কত কিরীটের কত মাণিক্য ! আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ কৃতার্থ হয়ে রয়েছে। ক্ষীণ-পুণ্যা হয়ে আমি আজ কার বা কিসের জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকব ? আমার একমাত্র কামনা,—মরব—অবিধবা থেকে। সধবা ! আর্য্যপুত্র-বিরহিত হয়ে,—দগ্ধস্বামী রতির মত—আমি কেন বিলাপ করতে যাব ? তোর পিতার পায়ের ধূলির মত আমি আগে উঠব আকাশে ; বাক্যহারা হবে সুরাঙ্গণাদের দল। দারুণ দুঃখের আগুনে যে আগেই দগ্ধ হয়েছে, তার আর নতুন ক'রে কী পোড়াবে ধূমের ধ্বজা ? মরণের চেয়ে এখন আমার বেঁচে-থাকাই—সাহস। যে পতিশোকের আগুন আমার স্নেহের ইন্ধন পেয়ে জ্বলছে, তার কাছে তো চিতার আগুন হিম। কৈলাসের মত আমার স্বামী ;—সেই যার চ'লে যায়—তার আর কিসের উপর থাকে লোভ ? তার জীবন তো শূন্য, হাল্কা—পাকা পাতার শিরার মত। মহারাজের পরে 'বেঁচে থাকবে, পুত্ররাজ্যের সুখভোগ করবে এক বিধবা পাতকিনী',—তা হয় না, সে সুখ আমাকে স্পর্শ করতে দেব না। আমার মত দুঃখে-পোড়ার কাছে ছাই ঐশ্বর্য্য, কেবল নিয়ে আসবে অমঙ্গল, অভিশাপ, উপদ্রব। হর্ষ, স্বামী-হারাদের যশঃ নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই এই ধরণীতে ;—মেদক্লিষ্ট দেহ নিয়ে নয়। তাই তোকে বলছি, ওরে বাছা, বাধা দিয়ে আমার অপমান আর বাড়াস নি।"

এই কথা বলতে বলতে ছেলের পায়ের উপর প'ড়ে গেলেন মহাদেবী।

স-সম্ভ্রমে নিজের পা-দুটিকে সরিয়ে নিলেন হর্ষদেব। তারপরে নত হয়ে ভূলুণ্ঠিতা মাতৃদেবীকে দু-হাত দিয়ে ধ'রে ধীরে ধীরে ওঠালেন। ভেবে পেলেন না, কি করবেন। শোকের দুর্নিবারতা, কুলকামিনীদের অনন্য-কর্ত্তব্যতা, তার উপর মায়ের স্থিরনিশ্চয়তা—সব দিক বিবেচনা ক'রে নতমুখে, স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন হর্ষ।

স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা অনেক কিছু করিয়ে নেয়—কিন্তু তা হ'লেও কৌলিন্য অভিনন্দন করিয়ে নেয় দেশকালের অনুপন্থী ক্রিয়াটিকে। মহাদেবী আর দাঁড়ালেন না। পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে আঘ্রাণ করলেন তাঁর শিরঃ। তারপরে অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পায়ে পায়ে চলতে লাগলেন নদী সরস্বতীর অভিমুখে।

রাজপুরীর ক্রন্দনে ভারাক্রান্ত হ'ল দিক। অশ্রান্তচরণে মহাদেবী পৌঁছে গেলেন সরস্বতীর কিনারে। তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দীনতমা নারীর মত শ্রান্তচক্ষে একবার চিতার আগুনের দিকে চাইলেন। সে দৃষ্টিপাতে ফুটে উঠল লক্ষ লক্ষ পদ্মবনের প্রসূনতা। তারপরে ভগবান সূর্য্যদেবকে অবসান-প্রণাম ক'রে প্রবেশ করলেন অগ্নিতে। মিলিত হয়ে গেল চান্দ্রমসী এক মূর্ত্তি সূর্য্যের শ্রদ্ধায়। সব শেষ হ'ল।

মাতৃ-মরণ-বিহ্বল হর্ষদেব জ্ঞাতিকুটুম্ব এবং পরিজনদের সঙ্গে ফিরে এলেন পিতৃদেবের পদপ্রান্তে। এসে যা দেখলেন তা বর্ণনা করা যায় না। পিতার স্বল্প একটি প্রাণ তখন দেহমন্দিরকে বিদায় দিতে বসেছে। চোখের তারা এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে। তারকরাজ যেন প্রার্থনা করছেন অস্ত।

শোকের অসহ্য অভিযানে ধৈর্য্য হারায় স্নেহ। পিতৃদেবের চরণ-দুটিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে, সাধারণ মানুষের মত, গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলেন হর্ষ।

—কণ্ঠ আর সে কণ্ঠ নয়,
অন্তরের তাপে যেন গ'লে ঝ'রে গেল মুখের জ্যোৎস্না;
জ্যোৎস্না হয়ে গেল যেন জল,
বিলীয়মান হ'ল লোচন-লাবণ্য,
নয়নের উপর যে মহামেঘ জ'মে ছিল, সেই মেঘ
বিদীর্ণ হয়ে বইয়ে দিল অশ্রুর স্রোতস্বিনী।

মহারাজের চোখে তখন পুত্রমুখ অদৃশ্য। কিন্তু তাঁর কান তখনও শুনতে পেল পুত্রের রোদন। চিনতে পারলেন। ধীরে ধীরে এল তাঁর শেষ-আশীর্ব্বাদ।

"হর্ষ, অমন ক'রে কাঁদিস নে। তোর মত ছেলের উচিত নয়, অধীর-হওয়া। প্রজাদের প্রথম অবলম্বন হচ্ছে অচঞ্চল মহাপ্রাণতা, তারপরে তারা দেখে রাজার বংশমর্য্যাদা। যে জনমনের আশ্রয়, প্রাণীশ্রেষ্ঠ, তার বিহ্বল হতে নেই।

'তুই আমার কুল-প্রদীপ'—এ ঠিক কথা নয়,—সূর্য্য কখনও প্রদীপ হয় না।

'তুই পুরুষসিংহ'—এ বলাতে নিন্দা করা হয় শৌর্য্য-পরাক্রমের,

'এই পৃথিবী তোর'—চক্রবর্ত্তী লক্ষণ যার, তার কাছে সেটা পুনরুক্তি।

লক্ষ্মী যাকে গ্রহণ করেছেন তাকে কি ক'রে বলি,

'গ্রহণ কর লক্ষ্মী'—বিপরীত বলা হয়।

স্বর্গ মর্ত্ত্য দুটিই যে জয় করবে তাকে ছোট করা হয়, যদি

আশীর্ব্বাদ করি 'মর্ত্ত্যলোক তোর আসন হোক।'

বলতে বলতে আর বলতে পারলেন না।

চোখ দুটিকে নিমীলন করলেন রাজসিংহ প্রভাকরবর্দ্ধন।

এ নিমীলন আর কোনদিন পৌঁছল না—উন্মীলনে।

সেই অবসরে, আয়ুঃশান্তির সঙ্গে সঙ্গে, সূর্য্যের বিযুক্ত হ'ল তেজঃসম্ভার।

সূর্য্যবংশীয় নরপতির বিয়োগান্ত হ'ল—এই লজ্জিত অপরাধে যেন সূর্য্য হলেন অধোমুখী। পুত্রশোকের মত দারুণ সন্তাপে তাঁর বর্ণ হয়ে গেল তাম্র।

লৌকিকী স্থিতির অনুবর্ত্তন ক'রে আকাশ থেকে নেমে এলেন শ্রীসূর্য্য। উপস্থিত হলেন পশ্চিম সমুদ্রের তীরে ;—জননাথকে জলাঞ্জলি দেবার বাসনায়, যখন জলদান করলেন, তখন আলোহিত হ'ল সূর্য্যের দুঃখদহনদগ্ধ সহস্র সহস্র কর।

বিপুল বৈরাগ্য নিয়ে অস্তগিরির গুহাগহ্বরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন সূর্য্যদেব। মহাজনদের চোখে আর জল ধরে না ; অশ্রুর দুর্দ্দিনে সিক্ত হয়েই বুঝি শীতল হয়ে এল গোধূলির আলো।

স্থাণ্বীশ্বরের প্রজাপুঞ্জের রোদনতাম্র নয়নের আভায়—একবার লোহিত হয়ে গেল পরিবেশ, আবার পরক্ষণেই যেন নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় নীল হয়ে গেল দিন। কমলিনীদের পরিত্যাগ করলেন লক্ষ্মী,—বললেন, "মহারাজের সঙ্গ নিতে হবে আমাকে—বিদায়।"

সহস্রছায়ায় নিজেকে আবৃতা ক'রে শ্যামায়মানা পৃথিবী বললেন—

"পতিশোক কেউ যেন না পায়।"

দেখতে দেখতে—দুঃখিত চক্রবাক্‌গুলো প্রলাপের কারুণ্য ছড়িয়ে বন থেকে বনান্তরে আশ্রয় নিতে লাগল; তারা কুলপুত্রদের মত আজ পরিত্যক্ত-কলত্র এবং বনাশ্রয়ী।

দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে উড়ে এল, প্রেতপুরীর পতাকার মত, সহস্র-বর্ণা সন্ধ্যা। দর্শনের পথ রোধ ক'রে ঘনিয়ে এল তিমিরের রেখা—শবের শিবিকায় যেন মাল্য দুলল কৃষ্ণ-চামরের।

তারপরে এলেন রজনী;—অসিত অগুরু আঁর কালো কাষ্ঠে কে যেন রচনা ক'রে দিয়ে গেল চিতা!

সতী হবার লোভে হেসে উঠলেন কুমুদলক্ষ্মী।

শাখার শিখরে শিখরে নীড়ে ফিরে এল পাখী; তাদের ডাক যেন আকাশযানের কিঙ্কিণীর ক্বণন।

পূর্ব্বগগনে শেষে দেখা দিলেন চন্দ্র;—মহাবাজকে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র যেন প্রথম পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর হেমারুণ ছত্র।

সেই সময়ে পুরোহিতপুরঃসর সামন্তেরা এবং পৌরজনেরা মহারাজের শব-শিবিকাখানি স্কন্ধে বহন ক'রে সরস্বতী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সম্রাটোচিত চিতা রচনা ক'রে ধীরে ধীরে করলেন অগ্নিসৎকার। ধরণীতে কিছুই রইল না মহারাজের; রইল কেবল যশঃ।

ভীমরথী-ভীমা রাত্রিতে মহারাজ সর্ব্বশান্তি লাভ করেন; তখন তাঁর বয়স সাতাত্তর বৎসর সাত মাস সাত দিন।

নির্ব্যবধান ভূমির উপর উপবেশন ক'রে জাগ্রত কাটিয়ে দিলেন হর্ষদেব সেই রাত্রিটি।

চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত জনতা,—শোকমূক রাজলোক পরিজন; শোকের অনলে অন্তর তাঁর তপ্ত, স্নেহের সিঞ্চনে বাহির তাঁর সিক্ত।

মন কথা কইতে লাগল—

“পিতৃদেব বিদায় নিলেন। এইটুকুই তো প্রাণীদের পৃথিবী!

হায় রে, মিলিয়ে গেল চলার পথ, পতিত রইল আশার জমি,
বন্ধ হ'ল সুখের কপাট।

এখন সত্যবাদিতা ঘুমোবে, লোকযাত্রা লুপ্ত হবে;
রণশৌর্য্য বিলীন, প্রিয়ালাপ প্রলীন।

এখন নির্ব্বাসনে যাবে পুরুষকার, ধ্বংস হবে গুণের আদর।

কাকে যে বিশ্বাস করব, জানি না! অবদান ভগ্নপদ, শাস্ত্র বিফল; অসি-
মাত্র বিক্রম; নামেই কেবল বেঁচে রইল বিশেষজ্ঞতা। কি আর করব!

লোকে যদি শৌর্য্যকে জলাঞ্জলি দেয়, দিক;
প্রজাধর্ম্ম যদি প্রব্রজ্যা নেয়, নিক;
মানবতা যদি বিধবার মত বেণী বাঁধে, বাঁধুক;
রাজলক্ষ্মী যদি আশ্রমে যেতে চান, যান;
বসুন্ধরা যদি দুখানি সাদা কাপড় প'রেই দিন কাটাতে চান,
তাই না হয় কাটালেন।

এখন বিলাসিতা বাকল প'রে বেড়াবে, তেজস্বিতা তপস্যা করবে তপোবনে
চীবরে আবৃত থাকবে বীরতা।

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা!—কোথায় খুঁজে পাবে তুমি তেমনধারা একটি মানুষ?
হায় রে পরমেষ্ঠী!—মহাপুরুষ-গঠন অমন কোথায় খুঁজে পাবে তুমি পরমাণু?

সব শূন্য হ'ল, ধর্ম্মের জগৎ আজ অন্ধকার।
শস্ত্রোপজীবীদের জন্ম আজ নিষ্ফল। বীরগোষ্ঠীই বা এখন কি করবে?—
যুদ্ধের কথা, অসামান্য ফলাফল, সমররসের প্রবন্ধ নিয়ে যখন তারা সারাদিন
গবেষণা করত পিতৃদেবের পায়ের কাছে ব'সে, তখন যে কণ্টকিত হয়ে
উঠত তাদের কপোলভিত্তি!

আমি দেখতে পাই—যেন স্বপ্নের মধ্যস্থতায়—
তাঁর মুখপদ্মের দীর্ঘরক্ত নয়ন;
আমি আলিঙ্গন পাই—যেন জন্মজন্মান্তরে—
তাঁর লৌহস্তম্ভের চেয়েও গরিমাগর্ভ ভুজযুগলের;
আমি শুনতে পাই—যেন লোকান্তর থেকে,—
আমাকে 'পুত্র, পুত্র' ব'লে ডাকছেন,

তাঁর সুধাক্ষরা তরঙ্গগর্জ্জন গম্ভীর বাণীতে।”

এই রকম ও তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক রকমের চিন্তার মধ্য দিয়ে সেই রাত্রি কেটে গেল হর্ষের।

রজনী অবসান হ'ল।

শোকে মুক্তকণ্ঠ, ডাক দিয়ে উঠল কুক্কুটেরা; মন্দির-ময়ূরেরা ভবন-শৈলের তরুশিখর থেকে নীচে এল নেমে; নিজের নিজের নীড় ছেড়ে অরণ্যে চরতে চ'লে গেল পাখীরা।

ক্ষীণ-তনু হয়ে এল রাত্রির অন্ধকার।

তৈলহীন প্রভাতী প্রদীপগুলো তখন বলছে
“এবার তবে যাই”;
অরুণাভ বল্কল প'রে আকাশ তখন বলছে
“এবার তবে প্রব্রজ্যা নিই”;
কলবিঙ্কের কন্ধরের মত ধূসর, আকাশের তারাদল তখন বলছে
“প্রভাতের খেয়া আমাদের পারে নিয়ে চলেছে,
আমরা যেন রাজার অস্থি।”

সরোবরের দিকে, নদীর দিকে চ'লে গেল অরণ্যের গজেরা; তাদের ধাতুরাগলগ্ন গজকুম্ভ দেখে মনে হ'ল, তারা যেন নদীতীর্থে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে রাজার ভস্ম-ভরা কুম্ভ।

মলিন হ'ল প্রাভাতিক চাঁদ,—প্রেতকৃত্যের সিদ্ধ তণ্ডুলের যেন একটি পিণ্ডশেষ।

ধীরে ধীরে ভোর হ'ল। দেখা দিলেন সবিতা। রাজ্যের ওলটপালটের মতই ঘুরে গেল রজনীর প্রবন্ধ। জাগল রাজহংসের মণ্ডল; তাদের জাগৃহি-মঙ্গলেই যেন ঘুম থেকে উঠে এলেন পদ্মাকর সূর্য্য।

উপস্থানের জন্যে হর্ষদেব রাজকুলের দিকে চললেন।

সেখানে গিয়ে দেখলেন

নূপুর বাজছে না মন্দির-হংসদের পায়ে, তারা বোবা হয়ে ব'সে আছে;
সারা শুদ্ধান্তঃপুরে দু-চারিটি মাত্র ব'সে আছে শোকাচ্ছন্ন কঞ্চুকী;

রাজকুঞ্জর নিস্পন্দ, স্তম্ভে হেলান দিয়ে রয়েছে ;—আর তার পিঠের উপর মাহুত উপুড় হয়ে কাঁদছে ;

রাজ-অশ্বের মুখে হ্রেষা নেই, অঙ্গনে মন্দুরা-পালক কাঁদছে ; মহাস্থান-মণ্ডপ শূন্য ।

হর্ষদেবের চোখ পুড়ে যেতে লাগল। রাজকুল থেকে বেরিয়ে এলেন ; ফিরে এলেন সরস্বতীর তীরে। নীরে স্নান ক'রে, পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে জল দিলেন। মৃত্যুস্নান সমাধা ক'রে, সিক্তকেশ, অঙ্গে দুখানি মাত্র শুভ্রবাস, অ-প্রতীহার, ছত্রহীন, নিঃশ্বাস-সম্বল চলতে লাগলেন পদব্রজে। তুরঙ্গম সজ্জিত হয়ে এল, কিন্তু চড়লেন না। লাল টকটকে পদ্ম-চোখের দৃষ্টি নাকের ডগায় লেগে রইল। মুখে নেই তাম্বূলের রক্তিমা ; তবুও, কী শোভন সেই সুচির-প্রক্ষালিত, স্বভাব-পাটল অধর !

নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে উপস্থিত হলেন নিজের মন্দিরে।

বহু রাজবল্লভ, ভৃত্য, সুহৃদ, বহু সচিব—সেই দিন গৃহত্যাগ করলেন ; কানেও নিলেন না কারোর কথা ; স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে একান্তমনে স্বর্গীয় মহারাজের গুণের কীর্ত্তন করতে করতে ভৃগুপতন করলেন। অনেকে তীর্থাশ্রম নিলেন।

আবার কেউ কেউ অনশনব্রত অবলম্বন ক'রে তৃণকুশের শয়নীয়ে শান্ত করতে প্রয়াস পেলেন অসামান্য শোক।

কেউ কেউ মৌনব্রত গ্রহণ ক'রে শরণ নিতে প্রস্থান করলেন তুষারশিখর হিমালয়ে ;

বাণপ্রস্থী হলেন অনেকে। বিন্ধ্যাচলের অরণ্যে প্রবেশ ক'রে বনকরীদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন পল্লব-শয়নে। দু-এক মুষ্টি অন্ন মুখে দিয়ে, সেবাবিমুক্ত হয়ে, ত্যক্তবাসনা হয়ে, বনের শূন্য স্থানগুলিতে নিলেন আশ্রয়। কেউ মুনিব্রত নিলেন,—ধর্ম্মই তাঁদের ধন, পবন তাঁদের অশন, তাঁদের একমাত্র দেখা যায় নাড়ীর কম্পন। আবার অনেকে কাষায়গ্রহণ ক'রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে পাঠ করতে লাগলেন কপিল-মতবাদ। অনেকে শিখর-চূড়ার মাণিক্য বর্জ্জন ক'রে দেবাদিদেব ধূর্জ্জটির শরণাপন্ন হয়ে আজুট হলেন জটায়। অন্য সকলে পাটলবর্ণ চীবর পরিধান ক'রে তপোবনে চ'লে গেলেন ;—

সেখানে, তপোবন-হরিণেরা জিহ্বাগ্র দিয়ে লেহন করত তাঁদের চীবরাঞ্চল ;
সেখানে, স্বহস্তে স্বাশ্রুধারায় কমণ্ডলু প্রক্ষালন ক'রে জল নিয়ে আসতেন সরোবর থেকে,
সেখানে, ততঃপর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষান্ন গ্রহণ ক'রে প্রতিদিন করতেন দিনক্ষয়।

পিতৃশোকবিহ্বল হর্ষদেবের তখন সেই অবস্থা, যখন

শ্রীকে মনে হয় শাপ,
পৃথিবী— মহাপাতক,
রাজ্য — রোগ,
ভোগ — যেন একটা কেউটে সাপ,
ভবন — যেন নরক,
বন্ধুরা — বন্ধন,
জীবন — কুকীর্তি,
আহার — বিষ,
বিষ — অমৃত,
চন্দন — যেন আগুন,
দেহ — যেন দ্রোহ,
স্বাস্থ্য — কলঙ্ক,
আয়ুঃ — কী যেন একটা পাপের ফল,
কাম — যেন করাত, এবং
হৃদয়-ভেঙে-পড়াটাই চিরদিনের অভ্যুদয়।

এই অবস্থাতেই আসে সংসার-বৈরাগ্য, সমস্ত বিষয়বৃত্তিতে মন হয়ে যায় বিমুখ। সেই জন্যই এবং পাছে হর্ষদেব বিরাগী হয়ে যান, সেই ভয়েই,—পিতৃপিতামহ-কালীন বৃদ্ধ কুলপুত্রেরা, গুরুরা, শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-বিশারদ জরৎ-দ্বিজেরা, অভিজন অমাত্যেরা, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজারা, তাঁকে ঘিরে রইলেন।

সংস্তুত পরিব্রাজকেরা—যাঁরা আত্মতত্ত্বে লীন ;
মুনিরা—যাঁদের কাছে সুখ ব'লেও কিছু নেই, দুঃখ ব'লেও কিছু নেই ;
ব্রহ্মবাদীরা—যাঁদের কাছে সংসার অসার ;

পৌরাণিকেরা—যাঁরা তত্ত্বকথার নৈপুণ্য দেখিয়ে
অপনোদন করেন দুঃখসম্ভার ;
তাঁরা সকলে হর্ষদেবকে তাঁদের বাণীর কুশলতায় ফিরিয়ে আনলেন
—অসীম বিহ্বলতা থেকে।

হর্ষদেবের স্বাতন্ত্র্য বিলীন হয়ে গেল সকলের সৌজন্যে। রুদ্ধ হয়ে গেল শোকের অনুপ্রচার।

অনুনয়ের কল্যাণবাহুল্যে ধীরে তাঁর মুখে প্রবেশ করল অন্নের গ্রাস। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রাস ক'রে ফেলল জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের চিন্তা :—

"পিতৃদেবের মৃত্যু-মহাপ্রলয়ের সংবাদ পেয়ে অশ্রুস্নাত হয়ে বল্কল গ্রহণ করবেন না তো? যদি করেন? রাজা হয়ে যদি ঋষি হয়ে যান? গিরিগহ্বরে প্রবেশ করবেন না তো পুরুষসিংহ? অনাথা দেখবেন না তো পৃথিবীকে, চোখের জলে অন্ধ হয়ে? এই তো প্রথম দুঃখ। কী যে ক'রে বসবেন কে জানে! পদসেবায় উন্মুখ হয়ে রয়েছেন রাজলক্ষ্মী—তাঁকে অবহেলা করবেন না তো—অসীম বৈরাগ্যে, সাংসারিক অনিত্যতা-চিন্তায়? যদি বলেন আমি অভিষিক্ত হব না, বিজয়াভিযান থেকে ফিরে এসে নৃপতিদের সামন্তদের অভ্যর্থনায় যদি প্রতিকূল হন, তা হ'লেই রাজ্যে বিপদ আসবে—তখন কি হবে? পিতৃদেবকে বড় ভালবাসেন রাজ্যবর্দ্ধন। দাদা আমাকে সব সময়েই বলতেন,

'ভাই হর্ষ, পিতৃদেবের মত এমন মহারাজ দেখেছিস? পৃথিবীতে যা হয়েছে বা হবে! এমন সোনার তালগাছের মত প্রাংশু শরীর, এমন সূর্য্যমুখী মহাপদ্ম, এমন বজ্রস্তম্ভের মত দুখানা ভুজকাণ্ড, মদালস শ্রীবলদেবের মত এমন হাসির বিভ্রম,—কোথাও দেখেছিস? আমি তো শুনি নি এত বড় মানী, এত বিক্রান্ত, বদান্যের কথা।'

এই সব চিন্তার মধ্য দিয়ে কোনক্রমে কাটে হর্ষদেবের দিন। কবে আসবেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন! অপেক্ষা যেন অপবাদ।

ইতি শ্রীবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে
মহারাজমরণবর্ণনং নাম
পঞ্চম উচ্ছ্বাসঃ ॥

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

মহারাজ কৃতান্ত—

গুপ্ত আত্মদূতদের পাঠিয়ে দেন—

যেন বিজয়কামী।

এবং সেই দূতদের দিয়েই বেছে বেছে

সংগ্রহ ক'রে নেন, তাদের—

যারা পৃথিবীর শৌর্য্যকামী বীর। ১

গুপ্তহত্যার পাপকলঙ্কে যিনি লিপ্ত হন

তার উপরেই পড়ে এসে বীরদের কোপ ;

নিঃশেষে তিনি লাভ করেন নিজেরই মৃত্যু।

নতুন গাছকে যখন হাতী এসে ভাঙে,

তখন সেই ভাঙনের মড়্‌মড়্‌ আরাব ঘুম চুরি ক'রে নেয়,

জাগিয়ে দিয়ে যায় পশুরাজ সিংহকে। ২

শেষ হয়ে গেল প্রথম পিণ্ডদান ; ব্রাহ্মণভোজন সমাপ্ত। ধীরে ধীরে অতিবাহিত হয়ে গেল অশৌচের উদ্বেজনীয় দশটি দিন। মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন যে সব তৈজসপত্র উপকরণ ব্যবহার করতেন,—যেমন শয়ন, আসন, চামর, ছত্র, অমত্র, যানবাহনাদি—যেগুলোকে দেখলে চোখ পুড়ে যায়—সেগুলি ব্রাহ্মণসাৎ হ'ল। জনহৃদয়ের সাহচর্য্যে তীর্থে তীর্থে নীত হ'ল মহারাজের অস্থি। সুধাধবল করা হ'ল চিতাচৈত্য-চিহ্নটিকে,—শোকশল্যের একটি কল্পনা। রাজগজেন্দ্রকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল অরণ্যে ;—কত সংগ্রামই না সে দেখেছে, জয় ছাড়া অন্য কিছু সে দেখে নি।

ধীরে ধীরে—

মন্দীভূত হ'ল ক্রন্দন, বিরল হ'ল বিলাপ, বিশ্রাম পেল অশ্রু, শিথিল হয়ে এল দীর্ঘশ্বাস, অস্পষ্ট হ'ল হা-কষ্টাক্ষর, ত্যক্ত হ'ল দুঃখের শয্যা।

ধীরে ধীরে—

কানগুলো উপদেশ বোঝবার ক্ষমতা ফিরে পেল,
হৃদয়গুলো অনুরোধ,
গণনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল স্বর্গীয় মহারাজের গুণাবলী,
প্রাদেশিক আশ্রয় নিল শোক।

ধীরে ধীরে—

'রুদিতক'-লেখা শেষ হয়ে গেল কবিদের।

যখন স্বর্গীয় মহারাজের দর্শন,—জনতা পেত স্বপ্নে ;
যখন স্বর্গীয় মহারাজের শেষ আশ্রয়—হয়ে উঠল জনতার হৃদয় ;
যখন স্বর্গীয় মহারাজের আকৃতি—মূর্ত্ত হয়ে উঠল চিত্রে চিত্রে ;
এবং নাম—কাব্যে এবং কাব্য-শেষে ;

তখন একদিন উৎসৃষ্টব্যাপার হর্ষদেব হঠাৎ দেখতে পেলেন—তাঁকে ঘিরে রয়েছে বৃদ্ধ বন্ধুদের সজ্ঘ এবং নত-মস্তক মৌনমহারাজের নীরবতা।

দেখলেন ; তারপরে মনে হ'ল—

"দাদা আসবেন, কি আর নতুন কথা বলবে মানুষের এই দুঃখের, এই শোকের খনি !"

হৃদয়টি কেঁপে উঠল।

এমন সময় হুড়মুড় ক'রে কক্ষে প্রবেশ করল জনৈক প্রতীহার।

জিজ্ঞাসা করলেন, "অঙ্গ, দাদা কি এসে পৌঁছেছেন ?"

ধীরে নিঃশ্বাস নিয়ে সে বললে, "দেবতার যা আদেশ,
তিনি দ্বারে— "

শুনে হর্ষের হ'ল সেই দশা, যখন সৌদর্য্য-স্নেহে ঢাকা প'ড়ে যায় কোমল শিথিল মন, অথচ ঝ'রে যায় না অশ্রুর সঙ্গে প্রাণ।

দ্বারপাল, তখন না জানি, কাকে ছেড়ে দিয়েছিল। দৌড়তে দৌড়তে কক্ষে প্রবেশ ক'রে একজন পরিজন কাঁদতে কাঁদতে কী যেন কী ব'লে চ'লে গেল;— বোঝা গেল না তার সব কিছু। সঙ্গে সঙ্গেই হর্ষদেব দেখতে পেলেন, দ্বারে প্রবেশ করছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন।

কী চেহারা হয়ে গেছে তাঁর!
বেদনায় পিষ্ট, সন্তাপে স্বিন্ন, চিন্তায় উচ্চিত, বিলাপে লুপ্ত;
কারাগারে যেন তাঁকে রুদ্ধ ক'রে রেখেছে বৈরাগ্য;
প্রত্যাখ্যান করেছে বিবেক-শুভ-বুদ্ধি;
প্রজ্ঞা যেন তাঁকে চিনতেই পারছে না অসীম অবজ্ঞায়;
বৃদ্ধবুদ্ধির অগম্য;
দুর্জ্জয় স্থৈর্য্য আজ যেন তাঁকে বিতাড়িত ক'রে দূর ক'রে দিয়েছে।

দূরপথ অতিক্রম ক'রে রাজ্যবর্দ্ধন এলেন। কোনো বাহুল্য আজ সঙ্গে নেই;—
ছত্রধর পিছনে প'ড়ে রয়েছে। পরিচ্ছদবাহীরা কোথায় কে আছে কে জানে! আচমন, ভৃঙ্গার, তাম্বূল নিয়ে কেউ আজ সঙ্গে আসে নি তাঁর। শুধু খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছে খড়্গগ্রাহী, আর কতকগুলো প্রকাশ-দাস। কালি হয়ে গেছে তাদের শরীর; কতদিন যে শয়ন অশন স্নান হয় নি, তার ঠিকানা নেই।

রাজ্যবর্দ্ধনের সমস্ত দেহ পথের ধূলায় ধূসর হয়ে গিয়েছিল; যেন কুলক্রমাগতা বসুন্ধরা সদ্য অনাথা হয়ে তাঁর অঙ্গখানিকে আঁকড়িয়ে ধরেছেন। হূণ-বিজয়-সংগ্রামে কত শরের আঘাতই না পেয়েছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই; তাই তাঁর দেহের ক্ষতস্থানগুলো বাঁধা ছিল দীর্ঘ শুভ্র পট্টকে—যেন সেগুলি সমাসন্ন রাজ্যলক্ষ্মীর কটাক্ষপাত।

একেবারে কৃশ হয়ে গেছেন;—যেন পিতৃশোকের হোমে আহুতি দিয়েছেন নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে কেটে।

চূড়ামণি নেই; কুন্তল মলিন উদাস; শেখর-শূন্য শির। রৌদ্রে ভিজে গিয়ে ললাট-পট্ট থেকে ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে ঘাম; যেন নাথহারা বসুন্ধরার মূর্চ্ছা ভাঙাতে চায় এই সিঞ্চন। গাল দুটি কেমন যেন ব'সে গেছে, দুঃখে কৃশ হয়ে, অশ্রুর প্রবাহে টোল খেয়ে। তাম্বুলহীন শুষ্ক অধর। ক্ষত্রিয়ের পবিত্রিকাটি দেহে দুলছে। পবিত্রিকায় আবদ্ধ রয়েছে একখানি ইন্দ্রনীলিকা; সেই অঙ্গুরীয়ের নীল আভা ঠিকরে পড়ছে তাঁর কানের উপর,—পিতৃশোকের যেন দগ্ধরূপ। চিবুকে সামান্য কিছু শ্মশ্রু, কিন্তু অধোমুখের ছায়াচ্ছন্ন নীল কনীনিকার আলোকে শ্মশ্রুর শ্যামলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পাহাড় ধ'সে পড়ছে, তাই আজ বিহ্বল যেন গুহাহীন কেশরী। সূর্য্য অস্ত গেছে, তাই অন্ধকারে কালো হয়ে হেঁটে আসছে দিন। ভেঙে পড়েছে কল্প-পাদপ, তাই আজ ছায়ার শান্তি নেই নন্দনে।

যা ছিলেন না, তাই যেন হয়ে গিয়েছেন রাজ্যবর্দ্ধন।

ক্রশিমা যেন তাঁকে কিনে নিয়েছে; কিঙ্কর করেছে কারুণ্য; শিষ্য করেছে শোক; আত্মীয় করেছে আধি; আর মৌনতা যেন চেপে ধ'রে রয়েছে তাঁর মুখ।

স্নেহের উৎকলিকা হর্ষের দেহটাকে যেন আছাড় মেরে সম্পূর্ণ অসাড় ক'রে দিয়ে চ'লে গেল।

রাজ্যবর্দ্ধন দূর থেকেই দেখতে পেলেন শ্রীহর্ষকে। অবাধ বেগে বহে যেতে লাগল অশ্রুস্রোত। তারপরে হঠাৎ যেন জমাট বেঁধে গেল সমস্ত দুঃখ। দুটি বাহু প্রসারিত ক'রে জড়িয়ে ধরলেন হর্ষদেবের কণ্ঠ। মুক্তকণ্ঠ রোদনের সঙ্গে সঙ্গে দীন বক্ষ থেকে খ'সে পড়ল ক্ষৌমবাস। বুকের উপর রাখলেন হর্ষের বুক, কণ্ঠে লগ্ন হ'ল কণ্ঠ। সে কি ক্রন্দন! হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে যায়! উপস্থিত রাজবল্লভরা বিচলিত হয়ে উঠলেন; তাঁদের মনে প'ড়ে গেল প্রাচীন নৃপতির কথা। তাঁরা প্রতিধ্বনির মত কেঁদে উঠলেন।

কিছুকাল গেল, তারপরে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল ক্রন্দন। ক্ষান্ত হ'ল অশ্রুবর্ষণ, যেমন শরৎকালে শান্ত হয়ে আসে বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘ।

রাজ্যবৰ্দ্ধন আসনে উপবেশন করলেন। পরিজনেরা জল নিয়ে এল। চোখের পাতা যতই ধুয়ে ফেলেন, ততই আবার চোখের পাতায় ভেসে এসে জ'মে যায়, চাঁদের ছোট্ট ছোট্ট টুকরোর মত সজল বিন্দু, যেন বন্যাজলের মাথায় মাথায় ফেনার রেখার আভাস। তাম্বূলিক নিয়ে এসে দাঁড়াল শুভ্র একখণ্ড বসন। রাজ্যবৰ্দ্ধন মুখখানি মুছে ফেলে, কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। তারপরে গাত্রোত্থান ক'রে চ'লে গেলেন স্নানভূমিতে।

স্নানভূমিতে সমস্ত ভূষণ ত্যাগ করলেন। অনাদরে মৌলিতে বাঁধলেন বিস্রস্ত-ব্যস্ত কুন্তল। স্নান-শেষের অধরে সে কি অপূর্ব্ব রক্তিমা!

সেই রক্তিমা যেন পূর্ণ যৌবনকে বলছে, "আমরা বাঁচতে চাই।" যেন সেই রক্তরাগ—সোহাগের চুম্বন। কিন্তু রাজ্যবৰ্দ্ধনের শোক সে রক্তরাগকে দূর ক'রে দিল। নয়নের শ্বেতিমা ঝ'রে পড়ল পূজার মিনতিতে, শরতের চাঁদ যেমন ক'রে ঢ'লে পড়ে কুমুদবনের প্রাঙ্গণে।

রাজ্যবৰ্দ্ধন প্রবেশ করলেন চতুঃশালা-বিতর্দ্দিকায়। পর্য্যঙ্কিকার নিম্ন অপাশ্রয়ে একখানি উপাধানের উপর মাথা রেখে স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইলেন।

স্নানান্তে হর্ষদেবও তাঁর অগ্রজের মতই ভূমিতলে, কুথার উপর প্রসারিত-মূর্ত্তি, অদূরে মৌন হয়ে শুয়ে রইলেন। তাঁর অগ্রজন্মাকে দেখেন আর অজ্ঞাত এক বেদনায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আসে। লক্ষখণ্ডে যেন ভেঙে যাচ্ছে কাঁচের মত হৃদয়। ঔরসদর্শনই হচ্ছে শোকের যৌবন।

এদিকে প্রজাপুঞ্জের কাছে এই দিনখানি দারুণ হয়ে উঠল স্বর্গীয় মহারাজের মৃত্যুবাসরের চেয়েও। নগরে কারোর ঘরে রান্না নেই, কারোর মাথায় জল নেই, কারোর মুখে অন্ন নেই। সর্ব্বত্র সকলে কাঁদছে। বিষণ্ণতার মধ্য দিয়ে ক্রমে শেষ হয়ে গেল দিন।

বিশ্বকর্ম্মা যেন এইমাত্র বাটালি দিয়ে তাঁর তনুখানি ছিলেছেন, মাংস থেকে ঝ'রে পড়ছে রুধিরের রস,—এই রকম একখানি ছবির কল্পনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম সমুদ্রের জলরাশিতে ডুবে গেলেন মঞ্জিষ্ঠারুণ অরুণ-সারথি সূর্য্যদেব।

পদ্মসরোবরে বন্ধ হয়ে গেল কমলিনীদের গৃহদ্বার, বিকল হয়ে খন্‌খন্ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল ফড়ফড়ে চঞ্চরীকের দল।

চক্রবাকের চোখে তখন জল ভ'রে আসছে,—সে ভাবছে 'আমার বন্ধু ঐ সূর্য্যের,
বন্ধুকফুলের মত আলোটি এখনই তো নিভে যাবে; হায় হায়,
এখনই আসবে প্রিয়ার সঙ্গে আমার বিরহ।'

পদ্মদীঘিতে কিঙ্কিণী বেজে উঠল বনলক্ষ্মীর মাণিক্য-কাঞ্চীতে,—কলহংসরমণী-
রমণীয় কৈরবের শুভ্রতার উপরে মধুকরের যেন গুঞ্জন।

এমন সময় আকাশে প্রকাশ হ'ল এক বিপুল শশাঙ্ক।
—কলঙ্ক তার প্রকট,
শঙ্করের শান্ত শক্করের (বৃষভের) যেন এক ককুদ্‌কুট,
আর সেই শক্করের বিশঙ্কট বিষাণে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে
পঙ্ক শঙ্কর।

বেলা গড়িয়ে পড়ল সন্ধ্যায়।

প্রধান সামন্তেরা এলেন, তাঁদের বচন অনতিক্রমণীয়।

কিছু আহার করতেই হ'ল রাজ্যবর্দ্ধনকে।

তার পরের দিন—প্রভাত। রাজবৃন্দেরা উপস্থিত হলেন রাজ্যবর্দ্ধনের সান্নিধ্যে।

হর্ষের দিকে দৃষ্টি ফেলে রাজ্যবর্দ্ধন বললেন,—

"তাত, হর্ষ, গুরুজনেরা বরাবর তোমাকে গুরুভার কার্য্যেই নিয়োগ ক'রে এসেছেন। শৈশব থেকেই পিতৃদেবের চিত্তবৃত্তিটিকে তুমি সগুণ-পতাকার মত গ্রহণ ক'রে রয়েছ। বিধির বিধানে আজ আমার হৃদয় নির্দ্দয় হয়ে উঠেছে, অথচ তুমি রয়েছ কোমল;—স্বভাবতঃ যা হওয়া উচিত তাই। সেই জন্যই তোমাকে দুটো কথা শোনাতে চায় আমার মন। আশা করি, কৈশোর-চাপল্যে আমার স্নেহের বিলোমতা বা বিরুদ্ধাচরণ তুমি করবে না; কিংবা, মূঢ়ের মত, বাধা সৃষ্টি করবে না আমার প্রচেষ্টায়। লোক-বৃত্ত যে তুমি জান না, তা নয়। ত্রিলোকের ত্রাতা মান্ধাতা যখন মারা যান, তখন কী করেছিলেন পুরুকুৎস? যাঁর ভ্রূলতার একটি বিক্ষেপে কেঁপে উঠত অষ্টাদশ দ্বীপ, সেই দিলীপ যখন দেহ রাখেন, তখন কী করেছিলেন রঘু? দশরথ যিনি মহাসুরদের সংগ্রামে রথ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ত্রিদশে, তাঁর পরে কী করেছিলেন রাম? চতুঃসমুদ্র

গোষ্পদের মত প্রতিভাত হ'ত দুষ্মন্তের রাজত্বে।—মনে পড়ে কি তারপরে ভরতের কীর্ত্তি? যাক, সে সব পুরাতন কথা যাক।

কিন্তু আজ আমাদের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেছেন। জন্ম থেকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন স্মরণীয় নাম। তাঁর শতাধিক অশ্বমেধের কীর্ত্তি একদা ধূসর ক'রে দিয়েছিল বাসবের বয়স। তাঁর রাজ্যের আজ কি হবে? কি করা উচিত? শাস্ত্রবিদেরা বলেন, যারা শোকে অভিভূত হয় তারা কাপুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরাই হয় শোকের বিষয়ীভূত। তথাপি বলব, আজকে কি করব আমি। স্বভাবজাত কাপুরুষতাই হোক, বা স্ত্রৈণই হোক, পিতৃশোকের আগুনের অঙ্গার হয়ে যেন আমি জন্মেছি।

পর্ব্বত আজ পর্য্যস্ত, আমার অশ্রুর নির্ঝর ঝ'রে পড়ছে অজস্র-ঝর্ঝরে।
মহত্তেজ আজ অস্তমিত, অন্ধকার হয়ে গেছে আমার দশমুখী আশা।
প্রজ্ঞানলোক প্রণষ্ট, হৃদয় প্রজ্বলিত।
আত্মদহনের ভয়ে বিবেকও আজ স্বপ্নের আশ্রয় নিতে চায় না। একটা বলিষ্ঠ সন্তাপে লাক্ষার মত ভেঙে ভেঙে লীন হয়ে যাচ্ছে নিখিল ধৈর্য্য।
বিষ-মাখা শরের আঘাতে হরিণী যেমন পদে পদে মূর্চ্ছায় ভেঙে ভেঙে পড়ে, তেমনি হয়েছে আমার মতি। স্মৃতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুরুষদ্বেষিণীদের মত।

পিতৃদেবের সঙ্গে মাতৃদেবীও চ'লে গেছেন;—কী নিয়ে থাকব? আমার দুঃখের সুদ দিন দিন বেড়েই চলেছে, যেমন ক'রে প্রতিদিন বিত্ত বাড়ায় সুদখোর।

আগুনের ধোঁয়া থেকে মেঘ জাগে, সেই মেঘের শোকাচ্ছন্ন বর্ষণে আপ্লুত আজ আমার শরীর। 'পঞ্চজন পঞ্চভূতে মিশে যায়'—এই কথা ব'লে থাকে শিশু-সংসার; কিন্তু আমি দেখছি, সে শুধু অগ্নির এক রূপময়ী মূর্ত্তি; সেই মূর্ত্তিই আমাকে দগ্ধাচ্ছে।

আমার মনে আজ যুদ্ধের তাড়না নেই; তাই বোধ হয় এই দুর্নিবার শোক—

সমুদ্রে বাড়বের মত, মৈনাকে বজ্রের মত,
চন্দ্রে ক্ষয়ের মত, সূর্য্যে রাহুর মত,—
আমাকে দগ্ধ করছে, দীর্ণ করছে,
ক্ষীণ করছে, গ্রাস করছে।

আমার হৃদয় তার অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে নির্ব্বাণ করতে পারছে না এই শোক। রাজ্য যেন বিষ, চকোরের বিরক্ত যেন চোখ।

চঞ্চলা লক্ষ্মীটিকে চিনে রেখো।—সে চণ্ডালিনী। প্রাচীন মৃতপটের গুণ্ঠনে সে ঢাকা।—তাই নিয়ে সে সমাজে রঙ্গ ক'রে বেড়ায়।—অনার্য্যা! তাকে আর আমার মন চায় না!

এই দগ্ধ ঘরে শকুনির মত আমি থাকতে পারছি না। এক মুহূর্ত্তও না। এই আমার বাসনা, স্নেহের তেল-মাখা এই কাপড়খানাকে হিমালয়ের প্রস্রবণের স্বচ্ছধারায় ধুয়ে ফেলে চ'লে যাই আশ্রমে।

হর্ষ, তুমি গ্রহণ কর আমার রাজ্যচিন্তা, যেমন যৌবনসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে পুরু একদিন গ্রহণ করেছিলেন জরা।

গ্রহণ কর রাজ্যলক্ষ্মী। আমি—এই ত্যাগ করলুম আমার শস্ত্র।"

এই কথা ব'লে, খড়্গগ্রাহীর হস্ত থেকে নিজের ত্রিংশাঙ্গুলি তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিলেন ধরণীতে।

রাজ্যবর্দ্ধনের ভাষণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন। শানানো শূল দিয়ে কে যেন প্রচণ্ড বেগে হৃদয়টাকে ফেঁড়ে দিয়ে চ'লে গেল।

চিন্তা ঘিরে ফেলল হর্ষদেবকে,—

"নিশ্চয়ই আমার বিষয় কেউ কিছু লাগিয়েছে,—কোন এক অসহিষ্ণু মহাত্মা;—তা না হ'লে আর্য্যের এতটা কোপের কী কারণ হতে পারে? এও সম্ভব, পরীক্ষা ক'রে দেখতে চান। কিংবা আর্য্যের চিত্তের এটা একটা অদ্ভুত শোকোচ্ছ্বাস, সমাক্ষেপ। এ ব্যবহার আর্য্যের কাছে আশা করা যায় না। আর্য্য তবে কি অন্য কিছু বললেন, না, আমার শোকশূন্য দুখানা কান অন্য কিছু শুনল।

একটা কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথা বেরিয়ে পড়ে নি তো আর্য্যের মুখ থেকে?

কিম্বা, আমাদের সমস্ত বংশের ধ্বংসের এটি একটি বিরাট ব্যবস্থা,— বা আমার সমস্ত পুণ্যের সমস্ত কর্ম্মের কপাল-ভাঙার এটি সূচনা!

হতেও পারে আমার গ্রহগুলো আজ একটা দুষ্ট খেলা খেলতে আরম্ভ করেছে! পিতৃদেবের মৃত্যুতে হয়তো ভয় ভেঙে গেছে মহারাজ শ্রীকলিদেবের। তা না হ'লে আমার উপরে কেন এমন আদেশ হয়!

যেন আমি কোথাকার একটা কে !
একটা যা-তা,
আদেশ চালালেই আমাকে মানতে হবে !
যেন অমি পুষ্পভূতি-বংশের ছেলে নই !
একটা অ-পৈতৃক তনয়।
মায়ের পেটের ভাই নই, অভক্ত।

কী একটা প্রকাণ্ড পাপ করতে গিয়ে হঠাৎ যেন ধরা প'ড়ে গেছি।

এ যেন শ্রোত্রিয়কে সুরাপান করতে দেওয়ার মত,
পুরাতন সম্ভৃত্যকে বলা—"বিশ্বাসঘাতকতা কর্",
সজ্জনকে বলা—"নীচের পা চাট্",
সাধ্বী স্ত্রীকে বলা—"ব্যাভিচারিণী হ্"।

শৌর্য্যের মদ খেয়ে একদা উন্মত্ত হয়ে উঠত এই সব সামন্তমণ্ডল—যেন সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ; তাদের মন্থন-মন্দর ছিলেন আমার পিতৃদেব। তিনি আজ আর নেই, সমুদ্র শান্ত।

এখন আমার উচিত তপোবনে চ'লে যাওয়া, বাকল নেওয়া, তপশ্চর্য্যায় উৎসর্গ করা জীবন।

এই যে আজ্ঞা আসছে—"গ্রহণ কর রাজ্যভার," সে আজ্ঞা কি নতুন ক'রে পোড়াতে চায় আমার-মত-দগ্ধশেষ একটা মানুষকে ? একটা মরুভূমি শুকিয়ে রয়েছে অনাবৃষ্টিতে, সেই মরুটার উপর এ যেন আর একটা আঙ্রার বৃষ্টি।

এত আঘাত দেওয়াটা উচিত হয় নি আর্য্যের।

জগতে কেউ কি কখনও দেখেছে :—

প্রতাপ রয়েছে—অভিমান নেই,
ব্রাহ্মণ এসেছে—আকাঙ্ক্ষা নেই,
অরোষণ মুনি,
সাধু—অথচ দরিদ্র নয়,
একটা বাঁদর—অথচ স্থির,
মাৎসর্য্যহীন কবি,
বেণিয়া—অথচ ডাকাত নয়,
সুয়োরাণীর হিংসা নেই,
যে দরিদ্র সে চোখের কাঁটা নয়,

ধার্ম্মিক ব্যাধ,
পরাশরী ভিক্ষু—অথচ ব্রাহ্মণ্য বজায় আছে,
সেবক—অথচ সুখী,
কৃতজ্ঞ জুয়োড়ী—,
আমাত্য হয়ে সত্য কথা কয় ?

তেমনি এই জগতে রাজার ছেলে দুর্বিনীত হ'ল না, এও পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমি নিরুপায়, আর্য্যই আমার আচার্য্য।

অমন পিতার মত পিতা—যেন রাজ-গন্ধকুঞ্জর—তিনি আজ পড়েছেন;
অমন দাদার মত দাদা—রাজ্য ত্যাগ ক'রে নবীনবয়সে চলেছেন তপোবনে;
কে এমন চণ্ডাল আছে—এই মৃদ্‌গোলকের মত অশ্রুপঙ্কিল অপবিত্র বসুন্ধরাকে, লক্ষ্মী-নাম্নী এই একটা কুলটা কুম্ভদাসীকে,—আজ কামনা করবে!

এ রকম অসম্ভব সম্ভাবনা আর্য্যের মাথায় ঢুকলই বা কেমন ক'রে? এর মধ্যে শুভ্রতা নেই। পুরাণের সৌমিত্রী, বৃকোদর—সব কি তিনি বিস্মৃত?

আমি তো আমার দাদার মধ্যে আগে কখনও দেখি নি সেই রকম একটা প্রভুত্ব করবার বাসনা,—

যে বাসনা অপেক্ষা রাখে না ভক্তদের,
যে বাসনা নিষ্ঠুর,
নিজের একমাত্র স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে একান্ত নিষ্ঠুর।

তিনি যাবেন তপোবনে, আমি রইব চিরজীবী; মহিয়সী পৃথিবীর উপর পা হাঁকিয়ে বেড়াব—মনটা যে সে-কথা ধ্যান করতে পারে না।

কে রক্ষা করে গুহা-নিবাস, যখন বজ্র-নখর সিংহ যায় বনবিহারে? প্রাণবন্তদের একমাত্র সহায় হচ্ছে প্রতাপ।

দাদা যখন বনে যাবেন স্থির করেছেন, তখন তাঁর রাজ্যলক্ষ্মীটিরও উচিত তাঁর সঙ্গিনী হওয়া;—

চীর হোক্ তাঁর কঞ্চুলিকা,
হাতে ধরুন কুশকুসুমসমিৎ আর পলাশের পুলিকা,
বনের হরিণীর মত জরার জালে ঘিরে তিনি চিরজীবন বেঁচে থাকুন।

যাক্, এ সব বাজে কথা বারবার ভেবেই বা লাভ কি?
মন, স্তব্ধ হও, চ'লে যাও আর্য্য যেখানে যান।

গুরুর আদেশ অমান্য করার অপরাধ পাপ ;—তপোবনে তপস্যায় দূর হয়ে যাবে পাপ।”

এই কথা ভাবতে ভাবতে হর্ষদেবের মনখানি প্রথমেই প্রয়াণ করল তপোবনে, আর মুখখানি বাক্যহারা স্তব্ধতায় ভূমিদৃষ্টি হয়ে রইল।

ক্রমে ক্রমে রাজগৃহে ফুটে উঠল—নিগূঢ় শোকের অতৃপ্তিকর একখানি চিত্র।

পূর্ব্বাদেশমত বস্ত্রকর্ম্মান্তিক রোদন করতে করতে রাজ্যবর্দ্ধনের সামনে এসে দাঁড়াল—হাতে তার বল্কলবাস।

রাজপুর-সুন্দরীরা চীৎকার ক'রে উঠলেন।

ঊর্দ্ধে বাহু বিক্ষেপ ক'রে বিপ্রেরা বিলাপ ক'রে বললেন, “অব্রহ্মণ্যম্।”

পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে পৌরবৃন্দদের সে কি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না!

বৃদ্ধ বন্ধুবর্গ নিবারণ করবার জন্যে এলেন ;—

আহা—তাঁদের ধ'রে নিয়ে আসতে হয়, শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে, কাপড় যে কোথায় লুটোচ্ছে তার ঠিকানা নেই, কথা বলতে যান, পারেন না ; গাল দুখানা চোখের জলের ধারা দিয়ে আঁকা।

সামন্তেরা মুখ ফিরিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, আর মণিকুট্টিমের উপর নখ দিয়ে লেখা হতে লাগল নৈরাশ্যের লিখন।

দলে দলে প্রজারা, ছেলে-বুড়ো সবাই, তপোবনের দিকে প্রস্থান করল।

এমন সময় হঠাৎ সভার মাঝখানে কে একজন দৌড়ে এসে লুটিয়ে পড়ল। কে এ, কে সে?

এ যে রাজ্যশ্রীর বিখ্যাত ভৃত্য “সংবাদক” ;—

শোকে যেন পাগল, কণ্ঠ ছেড়ে কাঁদছে, চোখে অশ্রুর নদী।

সমস্ত কেমন যেন ঘুলিয়ে গেল রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষদেবের। বারম্বার তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন সংবাদককে,—

“ভদ্র, বল, বল, কি হয়েছে, কি ঘটেছে? মহারাজ আজ নেই, তাই বোধ হয় আনন্দে পুলকিত হয়ে নির্ম্মম বিধি নতুন ক'রে শোকের

ব্যবসার উপরে শুল্ক ধার্য্য করছেন; সযত্নে কেমন ক'রে দুঃখটিকে বাড়াবেন তারই চেষ্টায় অধীর হয়ে উঠেছেন।"

সংবাদক কোনক্রমে জানাল—

"দেব, নীচ-লোকেরা পিশাচদের মত কেবল ছিদ্র খুঁজতে থাকে, আর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ পেলেই প্রহার করতে ভোলে না। মহারাজের মৃত্যুর সংবাদ যে মুহূর্ত্তে সাম্রাজ্যের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল, সেই বিপন্ন মুহূর্ত্তের প্রশ্রয় পেয়ে দুরাত্মা মালবরাজ দেব গ্রহবর্ম্মাকে আঘাত করে। তিনি আজ নেই, নিজের সুকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে জীবলোক ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। ভর্তৃদারিকা রাজ্যশ্রীকে কান্যকুব্জের একটা কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। তাঁর পায়ে পরিয়ে দিয়েছে, কালো লোহার শিকল—যেন একটা সাধারণ চোরের বৌ! লোকমুখে শুনলুম, সেনাবাহিনী নায়কহীন ভেবে, দুর্ম্মতি মালবরাজ স্থাণ্বীশ্বর গ্রাস করবার জন্যে এখানে আসছে। এখন প্রভুর যা আদেশ।"

কী অদ্ভুত বিপদের বিবৃতি! এক বিপদের পর আর একটি বিপদ এল—অসম্ভাবিত, উপেক্ষাহীন, আকস্মিক!

কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধনের ইতিহাসে পরাজয়-স্বীকার অশ্রুতপূর্ব্ব; তাঁর স্বভাবে পরবশ্যতা অসহ্য। তাঁর দীপ্ত নব-যৌবন বিদ্রোহ ক'রে উঠল। বীরক্ষেত্রে তাঁর কি জন্ম নয়? তার উপর তাঁর ভগ্নী পড়েছেন বিপদে;—বড় স্নেহের, বড় কৃপার, সে যে বড় তাঁর আদরের! কাজেই, পিতৃবিয়োগের প্রবল শোকের আবেগ—যার মূল পূর্ব্ব থেকেই আবদ্ধ রয়েছে অন্তরে—সেই শোকাবেগ এক মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হয়ে গেল।—

তার বদলে হৃদয়ে প্রবেশ করল ভীষণ গম্ভীর এক চণ্ডক্রোধ—গিরি-গুহে যেন এক কেশর-ফোলা সিংহের প্রবেশ।

প্রথীয়ান ললাটপট্টে উদ্ভিন্ন হ'ল ভ্রূকুটির ভীষণতা, যেন যমস্বসা যমুনার কালো লহরের ভঙ্গী;

দর্পিত সৌন্দর্য্যে বামপাণিপল্লব, দিঙ্‌নাগের কুম্ভকূটের মত বিকট, দক্ষিণ বাহুর শিখর-কোষটিকে আস্ফোটন করতে লাগল,—যেন নখর-কিরণের জলধারায় অভিষেক হ'ল যুদ্ধের।

সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, ঝরল ঘাম ; দক্ষিণ পাণিতে খেলে উঠল রুদ্র কৃপাণ। সেই কৃপাণের নীল রঙ দেখে মনে হ'ল—

কে যেন নিৰ্ম্মূলে উন্মূলন করবার জন্যে,

মালবের কালো কেশরগুচ্ছ মুষ্টির মধ্যে ধ'রে রয়েছে!

একটা অদ্ভুত রোষরাগ রাজ্যবর্দ্ধনের কপোলের উপর দেখা দিল,—শস্ত্রের ঝন্ঝনায় প্রসন্না হয়ে রাজ্যলক্ষ্মী যেন ছিটিয়ে দিলেন সিন্দূরের ধূলি। বাম উরুদণ্ডের উপর লাফিয়ে উঠল উত্তানিত দক্ষিণ চরণ।

ধূলোকে ধোঁয়া করতে লাগল নিষ্ঠুর অঙ্গুষ্ঠের পেষণ—যেন নির্বীর ক'রে দিতে চায় উর্ব্বীকে। হূণ-সমরে রাজ্যবর্দ্ধনের অঙ্গে যে ক্ষতগুলি হয়েছিল সেগুলি এখনও ছিল সরস ; তারা হঠাৎ রুধিরোচ্ছল হয়ে উঠল। সেই রুধিরের সেকে, শোকের বিষে, সুপ্ত পরাক্রমকে প্রবুদ্ধ করতে করতে দ্রুতকণ্ঠে রাজ্যবর্দ্ধন বললেন—

"আয়ুষ্মন্, এই রাজকুল, এই সব বান্ধবেরা, এই পরিজন, এই রাজ্যক্ষেত্র, এই সব প্রজারা, ভূপতির ভুজপরিঘে যারা লালিত-পালিত,—এই সব রইল তোমার আশ্রয়ে। আজই আমি চললুম।

প্রলয় আনব মালবরাজকুলে। যতদিন না অবিনীতকে ডুবিয়ে দিয়ে আসি, ততদিন এই রইল আমার বল্কলগ্রহণ, এই রইল আমার তপশ্চরণ, এই রইল আমার শোকশাতনের সমস্ত উপকরণ।

হরিণ এসে সিংহের কেশর ধ'রে টানবে,

একটা ব্যাঙ্ থাবড়া মারবে রাজগোখ্‌রোর ফণায়,

বাছুর করবে বাঘকে বন্দী,

ঢোঁড়াসাপ গরুড়ের হবে গলগ্রহ,

একটা দাম্ভিক কাঠ বলবে—আগুনকে পোড়াব,

অন্ধকার তিরস্কার করবে সূর্য্যকে ;—

এ যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব—

মালবের খড়্গে পুষ্পভূতির বংশের পরাজয়।

একটা প্রকাণ্ড ক্রোধ আজ আমাকে ঘিরেছে।

থাকুক তোমার কাছে সমস্ত, এই রাজারা, এই সব হাতীদের সমারোহ। ভণ্ডিকে ব'লে দাও, অযুত অশ্বসৈন্য নিয়ে আমার অনুগমন করে।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে আদেশ দিলেন,—

"ধ্বনিত হোক্ প্রয়াণ-পটহ।"

একেই তো ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির দুর্দ্দশাতে চিত্ত ক্রোধে এবং বেদনায় টন্‌টন্ করছিল ; তার উপর যখন রাজ্যবর্দ্ধনের এই আদেশ এল "হর্ষ, তুমি এখানে থাক," তখন হর্ষদেবের বিপুল ভ্রাতৃস্নেহ পীড়া অনুভব করল ;—সে এক দূর-প্রণয়িণী পীড়া।

তিনি বললেন—

"আর্য্য, কি এমন দোষ লাগবে যদি আমি আপনার সঙ্গে যাই ?

যদি ভাবেন আমি বালক—তা হ'লে সত্যই আমাকে ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।

যদি ভাবেন আমি রক্ষণীয়—তা হ'লে আপনার ভুজপঞ্জরই আমার রক্ষা-স্থান।

যদি মনে হয় আমি অশক্ত—তা হ'লে বলব পরীক্ষিত হলুম কোথায় ?

যদি বলেন 'তুমি এখনও বাড়বে, বড় হবে'—তা হ'লে বলব, বিয়োগ রোগা ক'রে দেয়।

'এত ক্লেশ তুমি সহ্য করতে পারবে না' এই যদি আপনার ধারণা হয়, তা হ'লে বুঝব, স্ত্রীপক্ষে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

যদি বলেন 'তোমার এখন সুখ-ভোগের সময়'—তা হ'লে বলব, আর্য্যের সঙ্গেই চ'লে যাবে আমার সুখ।

'পথে বড় কষ্ট'—এর উত্তর—'বিরহ আরও অসহ্য।'

'কলত্র-রক্ষায় তুমি নিযুক্ত হ'লে'—এর উত্তরে বলব, লক্ষ্মীকে তো নিজের তরবারিতে বসিয়েই নিয়ে চলেছেন, রক্ষা করব কাকে ?

'পশ্চাতে থেকে সর্ব্বরক্ষা কর'—সেটি নিষ্প্রয়োজন, কারণ সেখানে আপনার প্রতাপই বলবান।

যদি বিবেচনা করেন, অনধিষ্ঠিত থাকবে রাজন্য-চক্র—তা হ'লে বলতে হয়, আর্য্যগুণে তারা সু-সম্বন্ধ হয়েই রয়েছে।

'যাঁরা মহান, তাঁরা বাহ্য সহায়তা নেন না', এই যদি ভাবেন—তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমাকে পৃথক্ ক'রে ভাবতে হয় ; তা পারব না।

'অত্যন্ত লঘু-বাহিনী নিয়ে যাব,' এই কথা যদি বলেন—উত্তরে বলব, আমি আপনার পায়ের ধূলো, পদধূলির কি ভার থাকে ?

'দুজনেরই অভিযানে যাওয়া উচিত নয়'—তা হ'লে বলি, আপনি থাকুন, আমি যাই।

আর যদি বিচার করেন, ভ্রাতৃস্নেহ কাতর হয়ে পড়বে—তা হ'লে বলব, দু-পক্ষেরই সেটি সমান দোষ।

আমি বুঝতে পারছি না, আপনার বাহুবলের কেন এই আত্মম্ভরিতা ? একাকী শুভ্রামৃতের মত যশঃপান করবার কেন এত আপনার বেগবতী লিপ্সা ? আমি তো পূর্ব্বে কখনও প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হই নি ! তাই বলছি, আর্য্য, প্রসন্ন হোন, আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

এই ব'লে ক্ষিতিতলে মস্তক স্পর্শ ক'রে অগ্রজের দুটি পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন হর্ষদেব।

ক্ষিতিতল থেকে হর্ষদেবকে উত্থাপিত ক'রে অগ্রজ পুনর্ব্বার বললেন—

"তাত, তুচ্ছ একটা শত্রুর বিরুদ্ধে যদি বিরাট অভিযানের সমারোহ গড়া হয়, তাতে শত্রুর গর্ব্বগরিমাই বৃদ্ধি পায়।

একটা শশককে ধরবার জন্যে যদি একপাল সিংহ দৌড়োয়, সেটা কি লজ্জাকর ব্যাপার নয় ? কোথাও কি দেখেছ, একগাছি তৃণকে দগ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বর্ম্ম এঁটে আসছেন অগ্নিদেবের দল ?

তা ছাড়া মনে রেখো, বিক্রম-প্রকাশের জন্যে অন্য স্থানও রয়েছে—এই বসুন্ধরা —অষ্টাদশ-দ্বীপ-কঙ্কণমালিনী মেদিনী।

যে বাতাসেরা কুলশৈলদের বহন ক'রে নিয়ে যায়, হাল্কা তুলোর পাঁজাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে তারা কি কোমর বেঁধে লাগে ?

কবে শুনেছ, তুচ্ছ বল্মীকস্তূপ ভাঙবার জন্যে নেমে এসেছে সুমেরু পর্ব্বতের বপ্রক্রীড়া-প্রগল্‌ভ দিক্‌-হস্তীরা ?

তুমি গ্রহণ কর তোমার কার্ম্মুক, মান্ধাতার মত দিগ্বিজয়ের জন্যে ; সোনার পত্রলতার অলঙ্কারে একদা বাঁধবে তুমি সেই কার্ম্মুক, পৃথ্বীপতিদের প্রলয় ধূমকেতু হবে সেই কার্ম্মুক।

আমার মধ্যে আজ ক্ষুভিত হয়ে উঠেছে দুর্নিবার এক শত্রুঘ্নী ক্ষুধা—তার ক্রুদ্ধ গ্রাসটি একান্ত আমার। আমাকে ক্ষমা কর, সে গ্রাসটি আমাকেই নিতে দাও। তুমি থাক এইখানে।"

এই ভাষণের পর রাজ্যবর্দ্ধন সেই দিনই প্রধাবিত হলেন শত্রুর অভিমুখে।

তথাগত হ'ল ভ্রাতার অবস্থা।

পিতৃদেব স্বর্গে, মাতা নেই, দেহরক্ষা করেছেন ভগ্নীপতি, ভগ্নী কারাগারে বন্ধনদশায়,

হর্ষ নিজেকে মনে করতে লাগলেন,

স্বযূথভ্রষ্ট বন্য করীর মত।

কী যে করবেন, ব'সে ব'সে একাকী ভাবেন, আর দিনের পরে কেটে যায় দিন। এই রকম ক'রে অনেক দিন কেটে গেল।

দাদা চ'লে গেছেন,—চ'লে যাওয়ার দুঃখে এবং বেদনায় সারা রাত জেগেই কেটেছে; তিন ভাগ শেষ হয়ে গেছে রাত্রি, এমন সময় হর্ষদেব শুনতে পেলেন জনৈক যামিক (রাত্রিপ্রহরী) আর্য্যাচ্ছন্দে একটি গান ধরেছে—

"দ্বীপোপগীতগুণমপি সমুপার্জ্জিত রত্নরাশি সারমপি
পোতং পবন ইব বিধিঃ পুরুষমকাণ্ডে নিপাতয়তি॥ ৩॥*

সেই গান শুনতে শুনতে হর্ষের মনের মধ্যে উদয় হ'ল চিন্তার। অনিত্য—সবই অনিত্য! হৃদয় আচ্ছন্ন হ'ল।

রাত্রির শেষ প্রহর যখন শীর্ণ হয়ে আসছে তখন তাঁর অবসন্নদেহ লুটিয়ে পড়ল নিদ্রার মন্দিরে।

স্বপ্ন এল :—

দেখতে পেলেন—একটি মেঘচুম্বী লৌহস্তম্ভ
ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

জেগে উঠলেন। হৃদয় কেমন উৎকম্পিত।

* দ্বীপে দ্বীপে উপগীত হয় যার গুণ,
রত্নৈশ্বর্য্যের সার অর্জ্জন ক'রে যে নিয়ে আসে,
সেই হেন পোতও একদিন ঝঞ্ঝায় হয় ভরাডুবি ;—
বিধাতার বিধান হঠাৎ ধ্বংস-শেষ করে পুরুষকে।

মন কথা ক'য়ে উঠল—

"অবিশ্রান্ত আমায় কেন অনুসরণ করে দুঃস্বপ্ন ? দিবানিশি বাঁ চোখখানা নাচছে—অকল্যাণের আখ্যান-বিচক্ষণ। নিশ্চয় কোন এক বিরাট ক্ষিতিপতির প্রাণক্ষয় ঘোষণা করছে এই উৎপাতগুলো। এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি নেই। প্রত্যহ সূর্য্যবিম্বে প্রকট হচ্ছে কবন্ধ, অথচ রাহুর কায়বন্ধ থেকে যাচ্ছে অবিকল। গ্রহ-গ্রামকে ধূসর ক'রে দিয়ে যেন তপঃকালীন ধূমগ্রাসগুলোকে উদ্গার ক'রে দিচ্ছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলী। দিনে দিনে দেখা দিচ্ছে দারুণ দাহ দিকে দিকে। আকাশ থেকে তারা খসছে যেন দিগ্‌দাহের ভস্মকণা। তারা-ঝরার শোকে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে চাঁদ। নিশি নিশি দেখতে পাচ্ছেন বিলোল-তারা দিগ্বধূরা,—আকাশে আকাশে প্রোজ্জ্বল উল্কার যথেচ্ছ-সঞ্চার, যেন গ্রহযুদ্ধ চলেছে। রাজ্য সঞ্চালনের সূচনা! তাই বোধ হয় পবনদেব পাথর আর ধূলোর মেঘ উড়িয়ে সূৎকার করতে করতে কোথায় যেন ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীকে। লগ্নে লগ্নে কুশলের আভাসও আমি দেখতে পাচ্ছি না। হাতী যেমন বাঁশের কচি কচি ডগাগুলোকে মুচড়ে মুচড়ে ভাঙে, তেমনি না জানি কৃতান্তও কী করবেন আমাদের এই বংশে ? কে করতে পারে কৃতান্তের পথরোধ ? সর্ব্বথা স্বস্তি হোক্ আর্য্যের।"

এই রকম ভাবনায়, ভ্রাতৃস্নেহে ভঙ্গুর হ'ল হর্ষদেবের অন্তর। গ'লে গেল হৃদয়। শেষ পর্য্যন্ত, কোন ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে পড়লেন এবং সম্পন্ন করতে লাগলেন যথাক্রিয়মাণ ক্রিয়া-কলাপ।

সে দিন আস্থান-মণ্ডপে ব'সে রয়েছেন শ্রীহর্ষদেব, এমন সময় দেখতে পেলেন সহসা প্রবেশ করল "কুন্তল", রাজ্যবর্দ্ধনের প্রসাদপত্র, অভিজাততম বৃহদশ্ববার কুন্তল। আর তার পরেই প্রবেশ করল বিষণ্ণবদন কতকগুলি সৈনিক।

আশ্চর্য্য! কুন্তল এখন এখানে? কী অশান্ত চেহারা!

মলিন পটবাসে শরীর আবৃত—অসহ্য দুঃখের উষ্ণনিঃশ্বাসের ধোঁয়ায় যেন বিবর্ণ; হেঁটমুণ্ড;—যেন বেঁচে থাকাটা লজ্জা; দীর্ঘনাসার অগ্রে দৃষ্টি গ্রথিত; শ্মশ্রু দীর্ঘ হয়ে উঠেছে;

মুখ মৌন হ'লেও অবিরল অশ্রুধারা জানিয়ে দিচ্ছে

—কী যেন বিপদ ঘটেছে প্রভুর।

কুন্তলকে দেখেই হর্ষদেবের চোখে জেগে উঠল ভয়,

চোখ ছুটিকে বন্দী করল জল ;

মুখকে বন্দী করল দীর্ঘশ্বাস ;

হৃদয়টিকে হুতাশ,

অঙ্কটিকে ভূমি, এবং

নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ কানে নেবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে একসঙ্গে তাঁর প্রতি-অঙ্গটিকে গ্রহণ করল অষ্টলোকপাল।

তারপরে হর্ষদেব শুনলেন—

কেমন ক'রে হেলায় ও তাচ্ছিল্যে রাজ্যবর্দ্ধন পরাস্ত করেছিলেন মালবদের অনীক ;

কেমন ক'রে গৌড়াধিপ মিথ্যা সৌজন্যে ভুলিয়ে, রাজ্যবর্দ্ধনের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছিলেন ;

কেমন ক'রে একদিন যখন রাজ্যবর্দ্ধন একাকী স্ব-ভবনে বিস্রব্ধ বিশ্রামে মগ্ন, তখন মুক্ত-শস্ত্র গৌড়াধিপ সেখানে প্রবেশ করেছিল ; এবং হর্ষদেবের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনকে ক্রূরহত্যা করে।

শোনামাত্রই সহসা দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল মহাতেজস্বী শোকাবেগ ; ছড়িয়ে পড়ল প্রচণ্ড ক্রোধের এক পুণ্যবান আগুন, ক্রোধে কেঁপে উঠল হর্ষের মূর্দ্ধা ; আর সেই কম্পনবেগে শিখামণি থেকে মণিখণ্ডগুলি ছিটকে পড়তে লাগল অঙ্গার-বৃষ্টির মত।

তখন থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছে ওষ্ঠাধর,

যেন রোষের অগ্ন্যুৎপাত,

যেন তেজস্বীদের আয়ুঃপান।

লাল টক্‌টকে হয়ে গেল চোখের আলোর চাহনি—

যেন দাবাগ্নি জ্বলছে।

ঘর্ম্মে সিক্ত হ'ল ক্রুদ্ধ শরীর—বর্ষার বিন্দুর মত ফুটে উঠল ঘর্ম্ম।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও ভীত হয়ে কাঁপতে লাগল ; তাদের প্রভুর এত ক্রোধ তারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নি।

সে এক ভীষণ অবস্থা হ'ল হর্ষের !

চোখ খুলে দেখা যায় না—

হরের সেই ভৈরবরূপ ;

হরির সেই নরসিংহ-মূর্ত্তি ;

সূর্য্যকান্তের পাহাড় যেন জ্বলছে,

যেন একটা প্রলয় দিন ;—দ্বাদশ সূর্য্যের রশ্মিতে জ্বলেছে আগুন ;

যেন পর্ব্বত কাঁপিয়ে জেগে উঠেছে—

প্রলয়ঙ্কর এক ঝঞ্ঝা

এ ক্রোধের ভীষণতা বর্ণনা করা কঠিন।

দেখেছ কি—দুষ্ট সাপুড়িয়ার বাঁশীতে অপমান-খাওয়া রাজগোখরোর উদ্ধত রাগ ?

দেখেছ কি কখনো—বৃকোদরের শত্রু-রক্তের তৃষা ?

নাগধ্বংসী জনমেজয়ের উদ্যম ?

ঐরাবত ক্ষেপেছে, এখনি মাড়িয়ে দেবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ?

এ ক্রোধ—

যেন পৌরুষের পূর্ব্বাগম, মন্ত্রের উন্মাথ, ঔদ্ধত্যের আবেগ, তেজের যৌবন, দর্পের অবসান,

এ ক্রোধ—

যেন রণরসের রাজ্যাভিষেক,

অসহনীয়তার নীরাজন দিন।

হর্ষের মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক ভয়ঙ্কর বাণী ;—

"এ কীর্ত্তি আর কার হবে—গৌড়াধিপ ছাড়া ! ছলহীন অশঠ দ্রোণাচার্য্যকে যিনি ফেলে দিয়েছিলেন অস্ত্র,—তাঁকে শান্ত করেছিল ধৃষ্টদ্যুম্ন—সর্ব্বলোক-বিগর্হিত মৃত্যুর মাঙ্গলিক দিয়ে। আমার মহাপুরুষ অগ্রজ সেইটিই লাভ করেছেন গৌড়াধিপের হাতে। একটা অনার্য্য ! জগতের মানসসরোবরকে পবিত্র ক'রে রেখেছিল আর্য্যের শৌর্য্য ; রাজহংসের শুভ্রতার যেন পক্ষধ্বনি।

কেবল ঐ অনার্য্য গৌড়াধিপের মন হ'ল তুষ্ট। প্রীতির সম্মান সে রাখলে না। বৈশাখের খর-সূর্য্য রূঢ়কর প্রসারণ ক'রে যেমন শোষণ ক'রে নেয় পদ্ম-দীঘির স্নিগ্ধ জল,—তেমনি গৌড়াধিপ বাড়াল তার হিংসা-হস্ত আমার আর্য্যের প্রাণ-হননের জন্যে। সে অধম জানে না—

কী গতি সে লাভ করবে,
কোন্ যোনিতে প্রবেশ করবে,
কোন্ নরকে হবে তার নিপাত!

চণ্ডালেও এমন কাজ করে না। নাম গ্রহণ করব না এই পাপীটার,—পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হবে জিহ্বা। অঙ্গীকার ক'রে শপথ ক'রে নিয়ে গেল কার্য্যের ভার। ধীরে ধীরে সেই অনার্য্য ক্ষুদ্রটা ঘৃণ্য এক ঘুণের মত ঘুনঘুনিয়ে প্রবেশ করল ভ্রাতার অন্তরে। পৃথিবীর আনন্দ একটি চন্দন গাছ, তুচ্ছ ঐ ঘুণের ঘৃণায় মুহূর্ত্তেই শেষ-ক্ষয়ে গিয়ে পৌছল? মধুলোভী এই মূঢ় ভল্লুক—মধু দেখেছিল আর্য্যের জীবনে; কী আকর্ষণ ঐ মধুর! কিন্তু সে দেখে নি, ভাবে নি;

মধুহরণ এত সহজে শেষ হয় না;—
লক্ষ লক্ষ মৌমাছি বাণের মত তাকে বিঁধবে;
তাকে পেতে হবে উপদ্রবের ক্ষতি।

কুলুঙ্গিতে দীপ রাখ, ঘরের দেয়ালে কালি লাগবেই। গৌড়াধম নিজের ঘরে আজ সঞ্চয় করেছে অন্ধকার কাজল। ত্রিভুবনের চূড়ামণি সবিতা অস্তপথে যেতে না যেতেই—বেধসের আদেশ আসে;—

"ওঠো জাগো,
ওরে শশী, গ্রহ-হরিণদের মধ্যে
তুমি একমাত্র সিংহ;
তুমি জাগো,
নিগ্রহ কর অন্ধকার;
ওরা সৎপথে নেই।"

বিনয়-শিক্ষক অঙ্কুশ আজ ভেঙে গেছে বটে, কিন্তু দুষ্ট হাতীটা জানে না—

সিংহের খরতর নখর এখনও রয়েছে,
দীর্ণ ক'রে দেবে গজকুম্ভের মধ্যস্থল।

তেজস্বী জ্বল-জ্বল রত্নকে যে পাপ-পাটোয়ার নষ্ট করে,—সে পাটোয়ার কার না বধ্য হয়! কোথায় পালাবে এখন সেই দুর্ব্বুদ্ধি?"

হর্ষের সন্নিধানে উপবিষ্ট ছিলেন সেনাপতি। নাম 'সিংহনাদ'। হর্ষের পিতার তিনি মিত্র।

শেষ হয় নি তখনও হর্ষের বাণী—

উঠে দাঁড়ালেন সেনাপতি সিংহনাদ।

কী কণ্ঠস্বর!

—শত্রুবীরদের যেন বক্ষকম্পন দুন্দুভি!

চমকিত হতেন যদি তাঁকে দেখতেন।

ত্রস্ত হতেন শত্রুদের মত।

কী অপূর্ব্ব একখানি দেহ!

যেন দাঁড়িয়ে উঠল মেজে-ঘ'সে-দেওয়া হরিতালের পর্ব্বত।

পরিণত সরল শালবৃক্ষের মত—প্রচণ্ড প্রকাশ,

যেন বয়সটিকে পাকিয়ে দিতে চায় শৌর্য্যের উষ্মা,

যেন শরশয্যা থেকে হাস্য-শুভ্রতায় দাঁড়িয়ে উঠলেন ভীষ্ম।

বয়স হ'লে হবে কি?

সটান চুলগুলিকে কি স্পর্শ করেছিল ভীতি-ভীতা-জরা?

জীবন্ত এই মানুষটির মধ্যে,—

একটি সিংহ যেন রচনা করেছিল তার

কেশর-ফোলানো পরাক্রম।

স্থগিত দৃষ্টি, বলিত-শিথিল প্রলম্ব চর্ম্ম, ভ্রূযুগ যেন ভাষায় বলছে—

"অন্য প্রভুর মুখদর্শনও মহাপাপ।"

অকাল হ'লে হবে কি?

তাঁর সেই কাশকানন-বিশদ গুম্ফা-গুচ্ছ-শুভ্রায়িত ভাস্বর মুখের প্রচণ্ড সৌন্দর্য্য থেকে যেন ছুটে বেরিয়ে আসছিল শরৎকালের বিজয়ারম্ভী বিক্রম কাল।

আর তাঁর শ্মশ্রুর শুভ্র চামর

যেন বীজন করছিল হৃদয়-বাসী মৃত প্রভুকে।

বিশাল বক্ষে অসি-আঘাতের বহু ব্রণাঙ্ক।

পূর্ব্বপর্ব্বতে এ যেন সত্যই পাদচারী সিংহনাদ।

এই পদচারণ যেন লঘু ক'রে দেয় মহাভারতের বীররসের রমণীয়তা; পরশুরামকে শিক্ষা দেয় শত্রুনাশের নির্ব্বন্ধ; তৃণের মত জ্ঞান করে পরিস্ফুরিত সবিতার প্রচণ্ড তেজ।

এই সেনাপতি যেন—

অমর্ষাগ্নির অরণি, শৌর্য্যের ঐশ্বর্য্য, মত্তের মদ,
দর্পের বিসর্পণ, হঠের হৃদয়, উৎসাহের নিঃশ্বাস।

আবার এই সেনাপতিই যেন—

শ্রেষ্ঠ মনুষ্যতার বিশ্রাম,
বীরসঙ্ঘের কুলগুরু,
শস্ত্র-গ্রামের সীমান্ত-দৃষ্টি,

এবং

যা কিছু ভাঙে
তার সংগঠন-স্তম্ভ।

মহাযুদ্ধের মর্ম্ম-জ্ঞানী এই সেনাপতি সিংহনাদ যুদ্ধ-রসটিকে বীরদের হৃদয়ের মধ্যে প্রাকর্ষণ ক'রে বললেন—

"দেব, কাপুরুষেরা কাকের মত; ম্লানা হতলক্ষ্মী তাদের ঘরে মাঝে মাঝে বাস করেন—যেমন কাকের বাসায় কোকিলা। সেই ভীরুগুলো নিজেরাই বুঝতে পারে না, কী নিদারুণ তারা ঠকছে। তারা রাত্র্যন্ধ হয়, কমলা-রোগে রুগ্ন হয়ে ওঠে। ছত্রতলে সুখী থেকে মূর্খগুলো ভুলে যায়—যে, আকাশে রয়েছেন প্রচণ্ড-রশ্মি রবি। কপোলের কপিল-পল্লব কোপানলের দিকে চোখ তুলে চাইবার সাহসও যাদের নেই, সেই ভীরু হতভাগারা করবেই বা কি? তারা জানে না, অপমান-বিদ্ধ বীর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কুলধ্বংসী প্রলয় নিয়ে আসতে পারে,—অভিচারের মত।

জলেও বিদ্যুৎ জ্বলে।

আজ সেই এক হতভাগ্য বীরগোষ্ঠী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তার কীর্ত্তি তাকে নিপাতিত করবে অনুত্তার নরকের বিভীষিকায়। যুদ্ধের প্রধান-ধন ধনুক যখন মুষ্টির মধ্যে ধৃত থাকে, নীল পদ্মবনের মত একখানা নীল তলোয়ার চম্‌কাতে থাকে আকাশে, সমুদ্র-মথিত লক্ষ্মীদেবীকেও তখন বাধ্য হয়ে হেঁটে চ'লে আসতে হয় বীরের স্কন্ধবারে।

জেনে রেখো বীররস বিকাসী; বর্ষার মত ঝরিয়ে দেয় অপরিমিত যশঃ। জয়শ্রীকে যদি অনুরাগিণী করতে চাও, তা হ'লে পৃথ্বী রাঙিয়ে ঝরিয়ে দিতে

হবে, শত্রু-শোণিতের শোণ-বিন্দু রক্ত। তবেই আসবে রাজশ্রীকতায় উজ্জ্বলতা, শত্রুমুখে শ্যামতা, পট্টিকাবদ্ধ দেহের মত শুভ্র হবে যশঃ।

হানো তোমার নিষ্ঠুর তলোয়ার। শত্রুর বর্ম্ম-বক্ষ কবাটে জ্ব'লে উঠবে শ্রী, অগ্নি-শিখার মত। শত্রুবধূর মর্ম্ম-হত্যা কর।

হে দেব হর্ষ, তেজস্বী অসহিষ্ণুতার এবং প্রাণবন্তের তুমি অগ্রণী, বিপুল তোমার প্রজ্ঞা, সমর্থদের এবং অভিজাতদের তুমি শ্রেষ্ঠ। এই ব'লেই তোমাকে চিনি।

আর এই দেখ, আমার সম্মুখে উপবিষ্ট রয়েছে—বিশাল-বক্ষভিত্তি, স্বায়ত্ত-বীরদের সমারোহ। অগ্নিধূম উদ্গার করছে ওদের ক্রোধ। খড়্গ কৃপাণ তৃপ্ত হতে চায় রক্তপানে। তবুও দেখ, ওদের শৌর্য্যোন্মাদ অমানুষিক ধীরতার স্নিগ্ধ বনচ্ছায়ায় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

সেই জন্যেই আমার বলা ;—কী করতে পারে সামান্য একটা গৌড়ের রাজা! গৌড়াধিপ !! এমন আদেশ, এমন ব্যবস্থা হোক যাতে পুনর্ব্বার আর কোনো ভ্রষ্টচিত্ত এমন আচরণ করতে না পারে।

উচ্ছেদ করো ঐ অন্ধ শকুনিদের মণ্ডল। তারা ভাবে, তাদের রক্তগন্ধী পক্ষচ্ছায়াই যেন রাজছত্র। শিরা-বেধ করো ঐ চণ্ডালগুলোর।

তারপরে আসুক তোমার তীক্ষ্ণ আজ্ঞা, কর্ণসুখ তোমার জয়ধ্বনি ;

শেষ হোক স্তিমিত মস্তিষ্কের বিকার, ক্ষণগর্ব্বিত ভ্রূকুটির অন্ধকার।

যে পথ ধ'রে তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ চলেছিলেন, ত্যাগ ক'রো না সেই ত্রিভুবন-স্পৃহণীয় পথ। পুরুষ কখনো শোক করে না। কেশর-ফোলানো সিংহের মত ধরো গিয়ে কুরঙ্গী ঐ রাজলক্ষ্মীকে।

হে দেব, নরনাথ দেবভূমিতে প্রয়াণ করেছেন। তাঁর পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন দুষ্ট এক গৌড়-ভুজঙ্গের গরলদংশনে ইহলোকে আজ নেই। এই মহাপ্রলয়ের সময় আপনিই একমাত্র রয়েছেন,—শেষনাগের মত ধরণী-ধারণের লিপ্সায়। প্রজাসঙ্গ অশরণ। তাদের দেওয়া কর্ত্তব্য বিশিষ্ট আশ্বাস। রাজ-পর্ব্বতদের শিরঃশেখরে শরৎ-সবিতার মত ললাটতাপি হোক্ পদধারণ। গ্রহণ করুন ধনুক।

ধনুকের জ্যা-জালের গুঞ্জন-ঝঙ্কারে জনিত হবে জগতের জ্বর ;—যেমন একদা পরশুরামের চণ্ডচাপে, একবিংশতিবার ক্ষাত্রবংশের উৎখাতে,—কেঁপে উঠেছিল অরণ্য এবং পর্ব্বত।

সেই ধনুকের অগ্রে থাকবে দণ্ড-যাত্রার চিহ্নধ্বজ; বিদ্যুতের মত ধ্বংস হয়ে যাবে গৌড়াধিপের প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরক্ষয়।
শত্রু-রক্তের চন্দন ছাড়া শান্ত হয় না দারুণ দুঃখের দাহজ্বর। অপমানের অবসান আনে শত্রু-রক্তের অমৃতপান।"

প্রতিভাষণ করলেন শ্রীহর্ষদেব :—

"আপনি আমার মাননীয়। যা করণীয় তা আপনি বলেছেন। এই যদি না হ'ত—তা হ'লেও আমি বলব—আমার এই দুখানা ঈর্ষ্যালু বাহু আমার দায়াদের অংশীদার হতে দেবে না—কোনও মনুষ্যকে;—হোন্ না কেন তিনি পৃথ্বী-স্বামী শেষনাগ! যারা তা নয়, তাদের কথা অবাচ্য।
গ্রহগণ যখন ঊর্দ্ধাকাশে প্রয়াণ করতে থাকে, তখন আমার মনে হয়, তাদের নিগ্রহ করবার উদ্দেশ্যেই বুঝি চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমার ভ্রূলতা।

মৃগরাজের "রাজ" শব্দকেও সহ্য করতে পারে না আমার রুষ্ট চরণ; তার কেবল মনে হয়, কখন সে পাদপীঠ করবে সিংহশির।

স্বেচ্ছাচারী লোকপালেরা যখন একটি একটি ক'রে দিক্‌দেশ গ্রহণ করে, তখনই আদেশ-প্রচারের জন্যে স্ফুরিত হতে থাকে আমার অধর।

আর আজ এখন—এই দুঃখে-গড়া আপদের সময়ে—জানি না, কী কঠোর বাণী উচ্চারণ করবে সেই অধর।
আমার অমর্ষ-নির্ভর চিত্তে আজ শোকপ্রকাশের বা শোকের ক্রিয়াকরণের অবকাশ নেই। যতক্ষণ—এই জাল্ম,—আমার হৃদয়ের এই বিষম শল্য,—মুসলের আঘাতে যাকে বধ করা উচিত,—সেই জগৎ-গর্হিত চণ্ডাল, গৌড়কলঙ্ক জীবিত থাকে, ততক্ষণ নপুংসকের মত শোক-প্রকাশ করতে আমি লজ্জিত বোধ করছি।

> কে ভাবতে পারে—প্রতিকারশূন্য এক শোক?
> এই দুখানা হাত শত্রুবধূদের চোখের জলে যতদিন না সিক্ত হয়, ততদিন কেমন ক'রেই বা হবে স্বর্গতের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি-দান!

গৌড়াধমের চিতায় ধূমোদ্গার না দেখলে কেমন ক'রেই বা ঝরবে আমার দু নয়নের ধারা!

আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন।

আপনি আর্য্য, আপনার পাদপাংশু স্পর্শ ক'রে আমি শপথ করছি—

'পরিগণিত দিবসের মধ্যে যদি আমি মেদিনীকে নির্গৌড় করতে না পারি, তা হ'লে ঘৃতোজ্জ্বল অগ্নিতে পতঙ্গের মত আমি আমার এই পাতকী আত্মাকে বিসর্জ্জন দেব'।"

এই শপথ গ্রহণ ক'রেই অন্তিকে সমাসীন মহাসন্ধি-বিগ্রহিককে আদেশ দিলেন শ্রীহর্ষদেব,

"লিখুন।

উদয়াচল পর্য্যন্ত ;—

যেখানে রবিরথের চক্রনির্ঘোষে
চকিতচরণে চ'লে যায়
ত্যক্ত-সানু গন্ধর্ব্ব-মিথুন,

শৈল সুবেল পর্য্যন্ত ;—

—যেখানে ত্রিকুটের পর্ব্বতশিখরে, রাজধানীর গাত্রে কুঠার এবং কণ্টক দিয়ে লিখিত রয়েছে শ্রীরামের লঙ্কালুণ্ঠন প্রবন্ধ,

অস্তগিরি পর্য্যন্ত ;—

—যেখানে কুহরকুক্ষিগুলি নিত্য মুখরিত হয় বারুণী-মত্তস্খলিত বরুণ-বরনারীদের নূপুরের নিক্কণে,

গন্ধমাদন পর্য্যন্ত ;—

—যেখানে গুহ্যক-গেহিনীরা গন্ধপাষাণে সুবাসিত রাখেন গুহাগৃহ,—

সেই পৃথ্বীচক্রবালে যে সব মহারাজন্যেরা পরিচালন করেন রাজকার্য্য,

হয় তাঁরা সজ্জিত হোন করদানের অভিপ্রায়ে,
নয় গ্রহণ করুন শস্ত্র ;—
হয় দিক্‌জয়ী হোন,
নয় গ্রহণ করুন চামর ;—
হয় নত করুন শির,
নয় ধনুক ;—
হয় কর্ণপূর করুন আমার আজ্ঞা,
নয় মৌর্ব্বী ;—

হয় পদধূলি গ্রহণ করুন শিরে,
নয় শিরস্ত্রাণ ;—
হয় বদ্ধ করুন হস্তাঞ্জলি,
নয় সঙ্ঘবদ্ধ করুন যুদ্ধহস্তী ;—
ত্যাগ করুন ভূমি,
নয় বাণ ;—
অবলম্বন করুন প্রতিহারীর বেত্রযষ্ঠি,
নয় বীরের কুন্ত প্রাস ;—
হয় আমার চরণের নখবে,
নয় নিজেদের কৃপাণ-দর্পণে,
— সুদৃষ্ট করুন নিজেদের আত্মা।

কারণ আমি এসে গেছি, আমি পরাগত।
ততদিন নিবৃত্ত হবে না আমার পঙ্গুত্ব, যতদিন না আমার পাদপ্রলেপ হবে দ্বীপান্তরচারী নরপতিদের মুকুটমণির জ্যোতিঃ।”
এই প্রতিজ্ঞার অবসানে রাজলোককে বিদায় দিয়ে স্নানারম্ভের আকাঙ্ক্ষায় সভা ত্যাগ করলেন মুক্তাসন শ্রীহর্ষ। উঠে পড়লেন আস্থানমণ্ডপ থেকে। তারপরে ধীরে ধীরে সুস্থ মানুষের মত আহ্নিকাদি করলেন সমাপন।

দেখতে দেখতে শান্ত হয়ে গেল দিবসের উষ্মা ;—যেমন ক'রে প্রতিজ্ঞা শ্রবণের পর ধীরে ধীরে গ'লে গেল ত্রিভুবনের সমগ্র মানীর দর্প-প্রসার। কোথায় যেন অস্ত-প্রয়াণ করলেন ভগবান শ্রীসূর্য্যদেব—বোধ করি, স্বাধিকার অপহৃত হওয়ার আশঙ্কায়! কী এক শঙ্কিত নিবেদনে

সঙ্কুচিত হয়ে গেল রক্তকমলের কানন, নীরব হয়ে গেল ভ্রমরের গুঞ্জন,
নিশ্চল হয়ে গেল পাখীদের পক্ষ-বিক্ষেপ।

নেমে এলেন ভুবন-ব্যাপিনী সন্ধ্যা ;—যেন মূর্ত্তিমতী রাজপ্রতিজ্ঞা!
সেই সন্ধ্যার ঘনায়মান তিমিরটিকে দেখে মনে হ'ল, দিক্‌পালেরা যেন পদচ্যুতির শঙ্কায়, ক্ষিপ্রহস্তে দিক্‌বিদিকে নির্ম্মাণ ক'রে রাখছেন অভ্রংলেহী লৌহপ্রাকারের কৃষ্ণবলয়।

কিন্তু মহারাজ হর্ষদেব প্রদোষ-আস্থানে অবস্থান করলেন না অধিকক্ষণ। প্রণাম-নত রাজন্যদের উত্তরীয়-পবনে কেঁপে উঠল দীপিকা-চক্রবালের শিখা। সেই শিখাগুলিরও যেন প্রণাম গ্রহণ করতে করতে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন হর্ষদেব। তাঁর আদেশে নিবারিত হ'ল পরিজনদের প্রবেশ।

উপর দিকে মুখ ক'রে পালঙ্কে অঙ্গ এলিয়ে দিলেন হর্ষদেব। বিজন কক্ষে একমাত্র জ্বলতে লাগল একটি দীপ। অবসর বুঝে তস্করের মত হর্ষের চিত্তকে গ্রহণ করল ভ্রাতৃশোক। নিমীলিত-লোচনে শ্রীহর্ষদেব জীবন্ত দেখতে পেলেন তাঁর অগ্রজকে। বারম্বার বাহির হতে লাগল দীর্ঘনিঃশ্বাস, যেন তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে,—কোথায় রয়েছে ভ্রাতৃজীবন। তারপরে মুখখানিকে আবৃত ক'রে, নিঃশব্দে রোদন করতে লাগলেন—বহুক্ষণ। অশ্রুবিন্দুগুলি যেন শুভ্র উত্তরীয়ের ঝালর।

কেবল মনে হতে লাগল—

"কী এমন পাপ করেছি যার জন্যে এই রকম হ'ল পরিণাম! পর্ব্বতের মত আমার পিতৃদেব, পাথরের মত তাঁর শরীর। সেই পাহাড় থেকে লোহার শরীর নিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন দাদা। সেই হেন অগ্রজের বিরহে আমার এই বেঁচে থাকার কি কোনও অর্থ হয়! একেই কি বলে—প্রীতি? ভক্তি, না, অনুরক্তি? এমন কোন্ মূর্খ আছে, যে হাসবে না—আমার এই বেঁচে থাকাটা দেখে? বা বলবে না,—কোথায় হঠাৎ লুপ্ত হ'ল ঐক্য? নিষ্ঠুর বিধাতার এ কেমন-ধারা পৃথক্-করার বিধান! একটা প্রচণ্ড রোষ আমাকে দগ্ধাচ্ছে; এত নির্ম্মম ক'রে দিয়েছে, যে মুক্তকণ্ঠে কাঁদব তারাও উপায় নেই। হায় রে, লূতাতন্তুর মত ভেঙে ভেঙে ঝ'রে প'ড়ে যায় প্রাণীদের প্রীতি। সংসার-যাত্রাই কি বান্ধবতার একমাত্র অবলম্বন! তা না হ'লে আর্য্য হয়েছেন স্বর্গস্থ, আর আমি হয়ে রয়েছি আত্মস্থ! সুস্থ একটা ইতরের মত! অভিন্নপ্রীতি ভ্রাতৃমিথুনের আনন্দ এবং সুখের সংসারে প্রলয় ঘটিয়ে দিয়ে কী এমন আনন্দ লাভ করলেন দৈব! রাজ্যবর্দ্ধনের যে গুণগ্রাম চন্দ্রের মত আহ্লাদিত করত জগৎ, তাঁর লোকান্তরের পর সেই গুণগ্রামই চিতার আগুনে জ্ব'লে জগৎটাকে পোড়াচ্ছে।"

শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের মনখানিকে পীড়িত করতে লাগল বহু-বিভিন্ন চিন্তা। প্রভাত হ'ল শর্ব্বরী। ভোরেই প্রতীহারকে আদেশ দিলেন,

"মহাগজ-নায়ক স্কন্দগুপ্তকে সংবাদ দাও, তাঁকে দেখতে চাই।"

রাজাদেশ শিরোধার্য্য ক'রে অনেক রাজপুরুষ যুগপৎ প্রধাবিত হ'ল স্কন্দগুপ্তের উদ্দেশ্যে। একজন সংবাদ দেয় অন্যকে, তারাও ছুটে চলেছে।

প্রভাতেই রাজাহ্বান লাভ ক'রে স্কন্দগুপ্ত আর অপেক্ষা করলেন না স্ব-বাহিকা করেণুর। স্বীয় মন্দির থেকে পদব্রজেই বাহির হয়ে পড়লেন। দণ্ডীরা অতিসম্ভ্রমে উৎসারিত করতে লাগল জনতা।

স্কন্দগুপ্ত এক পা এক পা ক'রে চলেন, আর প্রণামনত গজবৈদ্যবিশারদদের জিজ্ঞাসা করেন—গজশ্রেষ্ঠদের বিভাবরী-বার্ত্তা, সুখে কেটেছে তো তাদের রাত!

দেখতে দেখতে তাঁর চলার পথে হস্তিকটকের লোকেরা রীতিমত এক কোলাহলের বাঁধ সৃষ্টি ক'রে ফেলল।—

> তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিল বারণদের বন্দীর উদ্দেশ্যে; শিখি-পিচ্ছ-লাঞ্ছিত দীর্ঘ বংশলতা তাদের হাতে, যেন কাননের গহনতা নিয়ে নগরে চ'লে বেড়াচ্ছে বিন্ধ্যবন। বংশলতা তো নয়, যেন বিন্ধ্যাটবীর পরিমাপ-যন্ত্র!

আর একদল এসে উপস্থিত হ'ল; পান্নার মত হরিদ্বর্ণ ঘাস-মুষ্টি তাদের হাতে; প্রতিক্ষণ তারা দেখে, হাতীরা কী আহার করছে বনে!

দৌড়তে দৌড়তে এল হস্তীপার্শ্ব-রক্ষকেরা এবং মাহুতেরা; তাদের মধ্যে কেউ চায় নূতন-ধরা গজপতিদের দেখা-শোনার ভার; আবার কেউ লাভ করেছে মনের মত মত্ত মাতঙ্গের রক্ষণভার,—দূর থেকে আনন্দে তারা প্রণাম দিতে লাগল।

কেউ নিবেদন করল আত্মীয়-মাতঙ্গের মদাগমের সংবাদ, কেউ জানাল হাতীর হাওদায় একটা ডিণ্ডিম বসানোর প্রয়োজনীয়তা। আবার কেউ এসেছে—দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ির বহর নিয়ে, কী যেন ভুল করেছিল, সেই অপরাধে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে হাতী;—তাই তাদের এই দুঃখের দাড়ি! কেউ কেউ ছিন্ন বস্ত্র প'রে সামনে এসে দৌড়ে দাঁড়াল—তারা নিযুক্ত হতে চায় হস্তী-সেবায়। অনেকদিন পরে দর্শনের অবকাশ পেয়ে তাদের মধ্যে অনেকে দু হাত নেড়ে প্রভুকে জানতে লাগল, কোথায় কোন্ বনে কোন্ হস্তীগণিকারা ভুলিয়ে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলে বন্দী করেছে হাতীদের দল।

এদের ভিড়, এদের কোলাহল কি থামতে চায়!

তাদের পরে এল—

সারি সারি অরণ্যপাল,

—তাদের চিহ্ন, উল্লসিত পল্লব ;

হাতী-ধরার দল এল,—

তাদের চিহ্ন, ঋজু ঋজু তুঙ্গ অঙ্কুশ ;

মহামাত্রেরা এল,—

তারা দেখাতে লাগল কর্ম্মনৈপুণ্য ;—

হাতীকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার অভিপ্রায়ে তারা তৈরি ক'রে এনেছে চামড়ার হাতী ;

দূতবৃন্দেরা এল—

নাগবনবীথিপালেরা তাদের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছে নূতন হস্তী-যূথের সঞ্চরণ-পথের বার্ত্তা ;

আবার একদল এল—

তারা নিবেদন করতে লাগল, কোন্ গ্রামে কোন্ নগরে কোন্ হাটে, হাতীরা কী কী ক্ষতি ক'রে পালিয়েছে,—লুঠ করেছে শস্য।

কিন্তু স্কন্দগুপ্ত তাঁর মহাধিকারের স্বাভাবিক মহিমা নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। আদেশবিষয়ে উদাসীন হ'লেও তিনিই যেন মূর্ত্তিমান আদেশ।

যেন আজ্ঞা দিচ্ছেন সমুদ্রদের ;—

হস্তীকর্ণের অসংখ্য শঙ্খ-সম্পৎ-সম্পাদনার আজ্ঞা।

যেন আজ্ঞা দিচ্ছেন পর্ব্বতদের ;—

হস্তীদের শৃঙ্গারের জন্য যেন সেখানে সংগ্রহ ক'রে রাখা হয় গৈরিকপঙ্কের অঙ্গরাগ।

দুলে দুলে উঠছিল তাঁর আজানুলম্বিত বাহু।

বাহু তো নয়, যেন আলানের দুটি শিলাস্তম্ভ। আর তাঁর দুখানি চরণ, যেন সংহৃত করেছে পৃথিবীর শশাঙ্ক-পদ-ভর-গ্রাহী গর্ব্ব।

করেণুকার প্রিয় নবপল্লবের মত অমৃতরসস্বাদু তাঁর অধর। যাঁরা দেখেন, তাঁদের লোভ জন্মায়। কী সুন্দর তাঁর নৃপবংশদীর্ঘ নাসাবংশ! কী স্নিগ্ধ তাঁর শুভ্র বিশাল দিক্‌দর্শী চোখ! মেরুতটের চেয়েও ললাট প্রশস্ত।

অবিচ্ছন্ন ছত্রচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত হয়েই যেন তাঁর কোমল বালবল্লরী-বেল্লিত কুঞ্চিত কুন্তলে লেগেছে নীলশ্রী। কী কেশের ঘনতা! নিরালোক ক'রে দেয় সূর্য্যকে।

অরিপক্ষ নিঃশেষ;—তাই তিনি ছিলেন কার্ম্মুক-কর্ম্মহীন; কিন্তু হ'লে হবে কি? দিগন্ত শুনতে পেত তাঁর গুণধ্বনি।

মদমত্ত মাতঙ্গ নিয়ে যার খেলা

মদ তাঁকে কিন্তু ছোঁয় নি।

সেই হেন আমাদের গজ-সেনাপতি স্কন্দগুপ্ত;

তিনি শরণাগতের অবৈতনিক ভৃত্য,

বিদগ্ধদের নিষ্কারণ বান্ধব,

কুলাঙ্গনাদের মত অনন্যগম্য।

স্কন্দগুপ্ত পদব্রজে প্রবেশ করলেন রাজকুলে। তারপরে নিবেদন করলেন নমস্কার। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল করদ্বয়ের পুষ্প-ফোটা পদ্ম।

স্কন্দগুপ্ত অদূরে করলেন উপবেশন। দেব হর্ষ তাঁকে বললেন—

"আর্য্যের বিস্তারিত পরাজয়-সংবাদ তোমার শ্রুতিগোচর হয়েছে এবং আমার প্রতিজ্ঞা, আশা করি, তুমি শুনেছ। সেই হেতুই আমি আদেশ দিচ্ছি,—আমার গজবাহিনীকে প্রচার থেকে ফিরিয়ে আনার দ্রুত ব্যবস্থা কর। যুদ্ধ-যাত্রার বিলম্ব আমার অসহ্য। আর্য্যের এই নৃশংস হত্যার পর কিছুতেই নিববে না আমার হৃদয়ের হলাহল-দাহ।"

স্কন্দগুপ্ত প্রণাম ক'রে নিবেদন করলেন—

"মহারাজ যা আদেশ করেছেন তা পালিত হয়ে গেছে ব'লে জানবেন। কিন্তু আমি প্রভুভক্ত, আমার অল্প কিছু বিজ্ঞাপ্য রয়েছে।

হে দেব, শুনুন—

আপনি আমার কাছে দেবতাবিশেষ। আপনি পুষ্পভূতিবংশ-সম্ভূত, অভিজাত এবং মহাজাত তেজস্বিতার অধিকারী। দিক্‌হস্তীর শুণ্ডের মত বিশাল বাহুর অসাধারণতায় আপনি যে আপনার সোদর-স্নেহের তর্পণ করবেন, তা আপনার পক্ষেই সম্ভব, তুল্য-কর্ম্ম আপনাকেই সাজে। আপনি কেন সহ্য করবেন এই নৃশংস অত্যাচার? কৃপণ কাকোদর, কৃমি-কীটগুলোও সহ্য করে

না অপমান বা আঘাত। দেব রাজ্যবর্দ্ধনের প্রবন্ধে আপনি কেবল একটুখানি দেখতে পেয়েছেন দুর্জ্জনদের দৌরাত্ম্য। এই রকম হচ্ছে লোকস্বভাব; প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, প্রতি বিষয়ে, প্রতি দেশে, প্রতি দ্বীপে, যেখানেই যাবেন, সেখানেই দেখবেন জনপদদের বিভিন্ন বেশ, বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন আহার; এমন কি তাদের ব্যবহারও ভিন্ন।

কিন্তু মহারাজ, আপনার দেশের আচার হচ্ছে—সর্ব্ব-বিশ্বাসিতা; হৃদয়ের সারল্য থেকে সেই বিশ্বাসের জন্ম হয়। সেই দেশাচারটিকে আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

একটা প্রমাদ, একটা সামান্য ভুলের জন্য, কত বিচিত্র হৃদয় গৌরবান্বিত, কত মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়,—এ রকম বহু বার্ত্তা আপনি শুনে থাকেন প্রতিদিন। আমি আরও কতকগুলি আপনার কাছে বলছি, স্মরণপথে মাত্র উদিত করিয়ে দিচ্ছি। সাবধান-বাণী ব'লে জানবেন।

নাগকুলে জন্মেছিলেন রাজা নাগসেন; একদা তাঁর গুপ্তমন্ত্রণা শুনতে পায় সারিকা; সারিকা সেটি বটনা করে; মহারাজ, তার ফল আপনি জানেন—পদ্মাবতী-দেশে নাগসেনের হয় বিনাশ।

শুকপাখীর মুখ থেকে রাজরহস্য জানতে পারে শত্রুরা, ফলে শ্রাবস্তীতে রাজা শ্রুতিবর্ম্মার শীর্ণ হয়ে যায় শ্রী। মহারাজ, পশুপক্ষীদেরও বিশ্বাস করা চলে না।

যারা আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় তারাও বিশ্বাসঘাতকতা করতে ছাড়ে না। একদা যবনেশ্বরকে বাতাস করছিল স্বর্ণ-চামর-গ্রাহিণী; গুপ্তমন্ত্রের প্রতিবিম্ব পড়েছিল রাজার চূড়ামণিতে, মন্ত্রাক্ষর বুঝতে পারে ধূর্ত্তা চামরগ্রাহিণী; ফলে রাজা লাভ করলেন যমালয়।

রাজাদের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার সুযোগ নেয় শত্রুপক্ষ সর্ব্বদাই।

মথুরার রাজা বৃহদ্রথ ছিলেন অতিলোভী; কৃষ্ণপক্ষের একটি কৃষ্ণরাত্রে যখন তিনি খনন ক'রে সংগ্রহ করছিলেন গুপ্তধন, তখন বিদূরথের সেনানী মুক্ত তরবারির আঘাতে তাঁকে কি গুপ্তহত্যা করে নি?

নাগবনে বিহার করতে ভালবাসতেন বৎসরাজ উদয়ন; মায়া-মাতঙ্গ থেকে নির্গত হয়ে তাঁকে কি বন্দী করে নি মহাসেনের সৈনিকেরা?

অতিদয়িত-লাস্য ভালবাসতেন অগ্নিমিত্রের পুত্র সুমিত্র; নটের সাজে নাচতে নাচতে মৃণালের মত এক অসিলতা দিয়ে তাঁর কি শিরচ্ছেদ করেন নি মিত্রদেব? তন্ত্রীবাদ্য-প্রিয় ছিলেন অশ্মকেশ্বর শরভ; গান্ধর্ব্ব-ছাত্রদের ছদ্মবেশে তাঁকে বধ করে শত্রুপুরুষেরা; অলাবু-বীণার অভ্যন্তরে তারা গোপন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল শাণিত তরবারি।

যা কিছু আশ্চর্য্য তার জন্যেই সদা কুতূহলী ছিলেন চণ্ডীপতি; দণ্ডোপনত হয়ে জনৈক যবন তাঁকে জানায়—সে নির্ম্মাণ করেছে আকাশগামী যন্ত্রযান; কুতূহলবশে তাতে আরোহণ করেন চণ্ডীপতি—তারপরে তিনি নিরুদ্দেশ।

মহারাজ, নিজের সেনাপতি, এমন কি মন্ত্রীকেও, বিশ্বাস করা যায় না।

প্রজ্ঞাদুর্ব্বল মৌর্য্য বৃহদ্রথকে—নিজের প্রভুকে—সেনাপতি অনার্য্য পুষ্পমিত্র সৈন্য-শক্তি দেখানোর ছলনায় অপরিমিত সৈন্য নিয়ে গিয়ে পেষণ ক'রে ফেলেছিল।

শৈশুনাগ-বংশীয় রাজা কাকবর্ণ কণ্ঠহীন হন নগরের উপকণ্ঠে।

অত্যন্ত অনঙ্গপরবশ ও স্ত্রী-সঙ্গরত ছিলেন শুঙ্গাধিপতি দেবভূতি; দাসীর দুহিতাকে মহিষী সাজিয়ে তাঁকে কি হত্যা করায় নি অমাত্য বসুদেব?

খনি-র কাজ ভাল জানতেন মেকলের অধিপতি; গোধনগিরির ভিতরে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করেন মন্ত্রীরা; অপরিমিত রমণীর মণিনূপুরের ঝন্‌ঝন্ ঝঙ্কারে প্রলুব্ধ ক'রে সেইখানে নিয়ে আসে নরপতিকে; তারপরেই তাঁর শেষ।

প্রদ্যোতরাজের কনিষ্ঠকুমার পুণক-গোত্রীয় কুমারসেন মহাকাল-উৎসবে মহামাংস-বিক্রয়ে বাধা দিয়েছিলেন; তাঁকে বাতুল সাব্যস্ত ক'রে বধ করেছিল তালজঙ্ঘ বেতাল।

রসায়ন-রসে প্রগাঢ় অভিনিবেশ ছিল বিদেহরাজপুত্র গণপতির; ঔষধের গুণ দেখিয়ে তাঁকে ছলনা করেছিল হাতুড়ে কতকগুলো বৈদ্য; সংক্রামিত ক'রে দিয়েছিল রাজযক্ষ্মা।

মহারাজ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করবেন না, এমন কি মহিষীকেও না।

প্রগাঢ় আস্থা ছিল স্ত্রীর উপর কলিঙ্গরাজ ভদ্রসেনের; সেই হেন মহাদেবীর গৃহে গূঢ়ভিত্তিতে প্রবেশ করে রাজভ্রাতা বীরসেন,—নিপাত যায় ভদ্রসেন।

করূষদেশের অধিপতি দধ্র তাঁর অন্যতম তনয়কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন; তাঁর আর একটি পুত্র মাতৃ-পালঙ্কের তোষকের তলদেশে লুক্কায়িত থেকে পিতাকে হত্যা করে।

মহারাজ, দূতদের বিশেষ ক'রে সাবধান

চকোরনাথ চন্দ্রকেতুর একটি বিলাস ছিল;—নগরের তোরণে দৌবারিক-রূপে গোপন-বিরাজ; এই গূঢ় তত্ত্বটি জানতে পারে শূদ্রকের দূত; সেই পদে তিনি স-সচিব নিহত হন।

মৃগয়া-বিলাসী চামুণ্ডী-পতি পুষ্কর একদিন গণ্ডকের তীরে গণ্ডার-শিকারে বেরিয়েছিলেন; উদ্দণ্ড নলবনের ঘন অন্তরালে নিলীন থেকে, চম্পাধিপের চমূ-চরেরা কি তাঁকে বধ করে নি?

চারণদের গান শুনতে ভালবাসতেন মৌখরী মূর্খ ক্ষত্রবর্ম্মা; শত্রু-নিযুক্ত ভাটেরা,—জয়শব্দ উদ্‌গান করতে করতে তাঁকে কি উৎখাত করে নি?

শত্রুপুরীতে প্রবেশ ক'রে কামিনী-বেশ-গুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত—পরদারাসক্ত শক-পতিকে কি শাতন করেন নি? সে ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

স্ত্রীলোকেরা মাতাল হয়ে, কী যে না করতে পারে, জানি না। মহারাজ, নিশ্চয়ই আপনি সে সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন।

'পুত্রকে রাজ্য দিতে হবে'—এই আকাঙ্ক্ষাটির পরিতৃপ্তির লালসায় মহাদেবী সুপ্রভা কাশীরাজ মহাসেনকে হত্যা করে;—খইয়ের সঙ্গে মদ্য ও মধুরক-বিষ মিশ্রণ ক'রে। কন্দর্প-দর্পিতার ভাণ ক'রে, ক্ষুরধার দর্পণের আঘাতে অযোধ্যাপতি জারুথকে হত্যা করেছিল রত্নাবতী। নিদারুণ হত্যা!

কর্ণের নীলপদ্মে বিষমধু মিশিয়ে কী প্রাণঘাতী প্রেম-নিবেদনই না করেছিলেন সৌম্ভ্য দেবসেনের কাছে,—দেবরের প্রেমমুগ্ধা দেবকী!

সপত্নীর হিংসায় অন্তর্জ্বলা হয়ে, বৈরন্তী নগরীতে মহারাণী 'বল্লভা'—চরণের মণি-নূপুর থেকে যোগ-পরাগ-বিষ বর্ষণ ক'রে, কী প্রাণান্তক নৃত্যই না দেখিয়েছিলেন রাজস্বামী রতিদেবকে!

কে না জানে,—বেণীর মধ্যে শস্ত্র নিগূঢ় ক'রে বৃষ্ণি বিদূরথকে বিন্দুমতীর হত্যাকাণ্ড!

মেখলার মণিটিকে মধ্য-বিষায়িত ক'রে কী সর্ব্ব-শেষ সোহাগই না জানিয়েছিল হংসবতী,—সৌবীর বীরসেনকে!

পৌরবী দেবীর ইতিহাসও আপনি জানেন; পৌরবেশ্বর সোমকের তিনি প্রাণহানি করেছিলেন; মুখের মধ্যে লেপন ক'রে নিয়েছিলেন অদৃশ্য বিষ-হর দ্রব্য এবং তারপরে মুখের মধ্যে বিষ-বারুণীর গণ্ডূষ গ্রহণ ক'রে, সেটিকে পান করিয়েছিলেন স্বামীকে; হায় রে, অপূর্ব্ব সেই বদন-রদন মোহন মদিরা!"

এই পর্য্যন্ত সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'রে ক্ষান্ত হলেন স্কন্দগুপ্ত। তার পরে রাজাদেশ-প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন রাজকুল থেকে।

শ্রীহর্ষদেব তখন ব্যাপৃত হলেন—নিখিল রাজ্যের স্থিতি এবং চালনার ব্যবস্থাপনায়।

কিন্তু আশ্চর্য্য! মহারাজের মুখপদ্ম থেকে যেমন যেমন নিঃসৃত হতে লাগল দিগ্বিজয়-যাত্রার ভ্রমরায়িত আদেশ,—তেমন তেমন বিদ্রোহী প্রতিসামন্তকদের প্রাসাদে প্রাসাদে প্রকাশ পেতে লাগল নানান বিবরণের দুর্নিমিত্ত।

> "একি! বসতির কাছে কাছেই কেন চ'রে বেড়াচ্ছে ঐ হরিণগুলো?
> —কাল-দূতের দৃষ্টির মতই কৃষ্ণশার ঐ হরিণ!
> যুদ্ধের ভূমিতে ভূমিতে ও কিসের উঠছে শব্দ! দেখ তো। চলন্ত নূপুরের মত ঝন্‌ঝন্ ঝঙ্কার দিয়ে, কেন উড়ছে মধুমক্ষিকার গোল! ওঃ, বুঝেছি, লক্ষ্মী ছেড়ে যাচ্ছেন। হায় রে—
> কী বিশ্রী চীৎকার ক'রে দৌড়িয়ে গেল আগুন-মুখো শেয়াল! না জানি কি হবে! ওদের থামাও।
> দেখেছ! মালতীলতার মাথায় বসেছে কী বীভৎস এক শকুনি! উঃ, কী কুৎসিত ওদের মড়ার-মাংস-খাওয়া শরীর, হলদে-কালো ডানা! যেন বাঁদর-বাচ্ছার গাল!

ওলো সখি দেখ্ তো, অত ফুল ফুটল কেন গাছে গাছে? আমার উপবনে? ওমা—এ যে অকালের ফুল।
ওহে অমাত্য, দেখেছ, সভার শালভঞ্জিকারা কাঁদছে, হাত দিয়ে চাপড়াচ্ছে তাদের বুক, তাদের স্তন!
হঠাৎ চেটীদের হাত থেকে কেন খ'সে যায় চামর?
মন্দির-ময়ূরদের এ কী দশা! চঞ্চল-বলয়া বাচালিকা অমন সব বালিকাদের তালিকা-ধ্বনিতে নাচে না কেন তারা?

যোদ্ধাদের মনের অবস্থা যে কী হয়েছে জানেন না, মহারাজ। দর্পণে নিজেদের মুখ দেখতে গিয়ে, দেখতে পেল, কে যেন চুলের মুঠি ধ'রে মাথাটাকে কেটে ফেলল; তারা যেন কবন্ধের ছবি। এও কি আশ্চর্য্য নয়, নরনাথ?—রাজ-মহিষীদের চূড়ামণিতে কখনও কি পড়েছিল শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-লাঞ্ছন পদাঘাতের রেখা! এসব অশুভ বিজ্ঞান!
কই! পানগোষ্ঠী বসছে না তো ভ্রমরদের,—হস্তীগণ্ডে; যবের আঁটিতে মুখ দিচ্ছে না তো ঘোড়ারা; ওরা কি তবে গন্ধ পেয়েছে যমের মোষের? প্রণয়-কলহে মানিনীদের দিকে কেন পিঠ ফিরিয়ে রেখেছেন বীরেরা?
তোরণের কাছে ব'সে কুকুরগুলো ঠায় চেঁচায় কেন—নিশিনিশি! নিশ্চয় ওরা এক-চোখা দেখতে পেয়েছে চাঁদের ভিতরকার হরিণ।

রাণীমা, দেখেছেন! দিনের বেলায় বাগানে বাগানে ঘুরঘুর করছে—নগ্নিকারা; আঙুল গুনছে, আর বলছে—এটার প্রাণ গেল, ওটার প্রাণ গেল। দূর্ব্বো গজায় কেন মেঝেতে? হরিণের খুরের মত ঢেউ-খেলানো বাঁকা বাঁকা লোম ঐ দূর্ব্বোগুলোর!

রাণীমা, শুনেছেন! চষকে ঢেলে মদিরা পান করছিল বীরনারীরা; হঠাং তারা নিজেদের মুখ দেখতে পেল মদিরায়;—সে কী মুখ! হায় হায়, তাদের বেণী যেন বাঁধা, চোখের কাজল যেন মোছা।"

ধরণী কাঁপল; অন্য রাজন্যদের হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন শ্রীহর্ষ,—এই ভয়ে ও ভাবনায় চকিতা-চকিতা হয়ে যেন কেঁপে উঠলেন ধরণী।

শোণিত বৃষ্টি হ'ল ;—বিকশিত বন্ধুকফুলের মত রক্তিম তার রঙ ;
দেখে মনে হ'ল, যেন বধ্যভূমিতে শূরদের শরীরের উপরে ঝ'রে পড়ছে
রক্তচন্দনের ছটা।

আকাশের তারাগুলোকে দগ্ধ করতে এল ঝাঁক-ঝাঁক উল্কা। ওরা কি উল্কার ডাঁটি,—না, বিনশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর মশাল !

বিপুল ঝড় যেন প্রত্যেক বাড়ী থেকে,—প্রথমেই সরিয়ে ফেলে দিল, ছত্র চামর ও ব্যজন ;—প্রতিহারদের মত।

ইতি শ্রীবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে
রাজপ্রতিজ্ঞাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসঃ ॥

সপ্তম উচ্ছ্বাস

প্রতিজ্ঞা যার স্থির, সে বীর।
তার কাছে বসুন্ধরা,—আঙিনার চাতাল,
জলধি,—যেন খাল,
পাতাল—ছোট্ট জমি,
এবং সুমেরু,—
উইয়ের ঢিপি॥ ১

পাহাড় নত হয় না,
ধনুকধারীদের টঙ্কারে;
—সেইটিই আশ্চর্য্য।
যারা শত্রু, তাদের কৃষ্ণকাক ব'লেই জানি;
তাদের কি কেউ পুনর্ব্বার নিয়ে আসে গণনার মধ্যে? ২

অতীত হ'ল কয়েকটি দিন। দিনগুলি কী দীর্ঘ!

শত শতবার বিশেষ গণনা ক'রে জ্যোতিষীরা স্থির ক'রে দিলেন—দিগ্বিজয়-যোগ্য প্রশস্ত দিবস এবং বিজয়বাহিনীর দণ্ড-যাত্রার লগ্ন।

তার পরে একদা আনীত হ'ল স্বর্ণ এবং রৌপ্য-ঘটিত শত শত কলস;—সলিল-মোক্ষ-বিশারদ যেন শরৎ-মেঘ। তাদের জলধারায় স্নান করানো হ'ল হর্ষদেবকে। স্নানান্তে হর্ষদেব ভক্তিপূজা করলেন নীল-লোহিতের। শিখাকলাপী দক্ষিণাবর্ত্তী হোমানলে আহুতি প্রদান ক'রে, ব্রাহ্মণ-সাৎ করলেন সহস্র সহস্র রত্নখচিত তিলপাত্র, এবং এক অর্ব্বুদ গাভী।

সেই গাভীর বিরাট দলটি একটি বিচিত্র-সুন্দর চিত্র;

তাদের খুরে এবং শৃঙ্গে পিনদ্ধ ছিল কনকপত্রলতার সৌম্য অলঙ্কার।

ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্তৃত ভদ্রাসনে উপবেশন ক'রে, হর্ষদেব নিজের দেহে, চন্দনবিলেপনের পূর্ব্বেই, অস্ত্রগুলিতে করলেন চন্দনচর্চ্চা; পরিধান করলেন রাজহংসের মিথুন-আঁকা সদৃশ-দুকূল; মস্তকে নিধান করলেন শুভ্র কুসুমের শিখর-মাল্য—যেন পরমেশ্বরের চিহ্নীভূত চন্দ্রকলা; কর্ণে বিন্যস্ত করলেন—গোরোচনা-চ্ছুরিত দূর্ব্বা-পল্লব; এবং মণিবন্ধের শাসনবলয়ে বাঁধলেন যাত্রার মঙ্গলসূত্র।

শুভাগত হলেন পুরোহিতেরা; হর্ষদেবের শিরোদেশে শান্তিজল বর্ষণ ক'রে পূজিত এবং প্রহৃষ্ট হয়ে নিলেন বিদায়।

সামন্তরাজদের প্রাসাদে প্রাসাদে প্রেরিত হ'ল মহার্ঘ্য বাহন, এবং দিগোজ্জ্বলা রত্নভূষণ; ক্লিষ্ট কার্পটিক এবং কুলপুত্রকদের মধ্যে কর্ম্মানুযায়ী সংবিভক্ত হ'ল প্রসাদ; বন্ধনমুক্ত হ'ল বন্দীরা।

এমন সময়ে—

'অষ্টাদশ দ্বীপ তাঁর জেতব্য'—এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রস্ফুরিত হ'ল হর্ষদেবের দক্ষিণ ভুজ। শুভ নিমিত্তগুলি আগে-আমি, আগে-আমি আসব, এই মনোভাব নিয়েই যেন সেবকদের মত এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রমুদিত হ'ল প্রজাগ্রাম, কোলাহলের মতই রণিত হয়ে উঠল জয়ধ্বনি, রাজভবন থেকে নির্গত হলেন হর্ষ,—

—সত্যযুগ সৃষ্টির সদুদ্দেশ্যে, ব্রহ্মাণ্ড থেকে যেন হিরণ্যগর্ভের নির্গমন।

নগরের নাতিদূরে সরস্বতীর তীরে, মন্দিরে প্রবেশ করলেন হর্ষ। মন্দিরের প্রাঙ্গণটি তৃণাস্তৃত ; সেখানে নির্ম্মিত হয়েছিল তুঙ্গতোরণ। নিম্নে বৃহৎ বেদী। চতুষ্কোণে পল্লব-ললাম হেমকলসের শোভা, পত্রপুষ্প ও মাল্যের সুন্দরিত আয়োজন, শুভ্র ধ্বজার সে কী সমারোহ! চতুর্দ্দিকে বিচরণ করছিল শুভ্রবসন পরিজনেরা, ব্রাহ্মণদের মুখে উঠছিল স্তোত্রপাঠ।

হর্ষদেব প্রবেশ করলেন মন্দিরে।

করণিকদের সঙ্গে নিয়ে বেদীতে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের অক্ষ-পটলিক, তিনি অগ্রসর হয়ে বললেন,—

"কভু, বিফলে যায় না প্রভুর শাসন। মহারাজের শাসন অবন্ধ্য। তাঁর উপস্থিতিতে অলঙ্কৃত হোক, ঘোষিত হোক, অদ্যকার দিবসটি, পরমদেব মহারাজের শাসনাবলীর গ্রহণ-দিবস-রূপে।"

ভাষণের শেষে গ্রামাক্ষপটলিক হর্ষদেবকে উপঢৌকন দিলেন—নব-ঘটিতা স্বর্ণময়ী একটি বৃষভাঙ্কা মুদ্রা। মুদ্রাটিকে গ্রহণ করলেন মহারাজ। সজ্জিত মৃৎপিণ্ডিকার উপর যেই সেটিকে স্থাপন করতে যাবেন, অমনি হর্ষদেবের করকমল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধোমুখে—মৃত্তিকার উপরে প'ড়ে গেল সেই মুদ্রা। সরস্বতীর স্বল্প-সিক্ত মৃত্তিকায়—ক্ষণপরেই পরিস্ফুট হয়ে প্রকাশ পেল মুদ্রার বর্ণাক্ষর। অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে পরিজনেরা বিষণ্ণ হয়ে পড়ল ; কিন্তু তখন মহারাজের মানস-মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে অন্য একটি ভাব।

"যারা অবিদগ্ধ,—তাদের বুদ্ধি তত্ত্বদর্শী নয়।—নিঃসন্দেহ। কারণ—
ঐ নিমিত্তটির নিবেদন হচ্ছে 'তুমি লাভ করবে একক-শাসিতা মুদ্রাঙ্কা
পৃথ্বী' ;—কিন্তু গ্রামবাসীরা করেছে অন্য অর্থ-গ্রহণ।"

এই মহানিমিত্তটিকে অভিনন্দনের মত গ্রহণ করলেন মহারাজ,—হৃদয়ে।

তারপরে দ্বিজেদের দান ক'রে দিলেন শত-গ্রাম,—সানন্দে।

সেইরূপ গ্রাম! হাজার হালে যার পরিমাপ হয় সীমা।

সেইখানেই দিনাতিপাত ক'রে, শর্ব্বরীর সমাগমে, সমগ্ররাজলোকের সম্মিলিত সম্মানে পুষ্ট হয়ে, শয়নীয়ের অঙ্কশায়ী হলেন হর্ষ।

দেখতে দেখতে—

জল-ঘড়িতে গ'লে প'ড়ে গেল তৃতীয় যাম। চতুর্দ্দিক সুপ্ত, প্রাণীরা নিস্তব্ধ

এমন সময়

গম্ভীরধ্বনি বেজে উঠল প্রয়াণ-পটহ—
যেন দিক্কুঞ্জরের জৃম্ভা।
ক্ষণান্তে পুনর্ব্বার বেজে উঠল—অষ্ট প্রহরা।—পটহ-পটীয়ানরা প্রহার করছে পটহ। প্রয়াণ-ক্রোশের সংখ্যা-নিয়ামক রাজকীয় পটহ।

প্রয়াণ-কালটির বর্ণনা না করা,—অবিধেয়।
পটহের রটনার সঙ্গে সঙ্গে নন্দিত হয়ে উঠল মঙ্গল-পটাহী নান্দীক;
গুঞ্জন ক'রে উঠল তূরীগুঞ্জ,
আরাব ক'রে উঠল বৃহৎ-দুন্দুভি ও কাহল,
ধ্মাত হ'ল শঙ্খ-গ্রাম।
বাহিনী-কটকের সর্ব্বত্র, ক্রম-ধীরতায় জেগে উঠল বিচিত্র এক কলরাবী রব।
অনুচরেরা ব্যাপৃত হয়ে পড়ল—পরিজনদের ঘুম ভাঙাতে।
ঘুম কেন ভাঙে না?
সময় হয়েছে যাত্রার, ভাঙাতেই হবে ঘুম।
ঘন্টাতে পড়ছে লোহার কণ্টিকা;—
ঠং ঠং ক'রে বাজছে—
ভাঙাতেই হবে ঘুম।
কী করবে তারা, এই অনুচরেরা!
আবার ঐ দেখ জাগরণী-মন্ত্রে জেগে উঠেছেন সেনাপতিরা,—বধ্যমান পাটী-পতিদের হত্যা-বিধান হস্তে নিয়ে।
প্রভাতের আলো-আঁধারিতে জ্ব'লে উঠল সহস্র সহস্র তমোলোপী মশাল।
যাম-চেটীদের পদধ্বনিতে শয্যায় উঠে বসল কামী আর কামিনী।
যেখানে গজবাহিনী আর অশ্ববাহিনীর নৈশ শিবির স্থাপিত ছিল; সেখানেও তুমুল হয়ে উঠল কলরব।
মাহুতদের কটু আদেশে নিদ্রানাশ ক'রে চোখ মেলতে বাধ্য হ'ল নিষাদীরা;
শূন্যিত হ'ল হস্তীদের শয্যাগৃহ;

হাতীবাঁধা জিঞ্জীরগুলো খোলা হতে লাগল ; তালা, চাবি এবং কণ্টকের ঝন্‌ঝন্‌
শব্দে চতুর্দ্দিক চৌচির ; ঘাসের চাপড়া দিয়ে দলাই-মলাই,
হাতীদের পিঠ থেকে ধূলো-ঝাড়ার শব্দ উঠতে লাগল।
সে কি সামান্য শব্দ ? সহস্র হস্তীর বৃংহিতি-ব্যবহার।
আবার ওদিকে লক্ষ অশ্ব নাড়ছে তাদের স্কন্ধকেশ ;
তাঁবুর খুঁটিগুলোকে খন্তা দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে উঠিয়ে ফেলা হচ্ছে, কী
তার খন্‌খনে আওয়াজ ! পায়ের কড়া খোলার আওয়াজে চমকিয়ে
লাফাতে লেগেছে সহস্র সহস্র তুরঙ্গ ; একেই কি বলে খুরধ্বনি !

গৃহ-চিন্তক চেটকেরা গোছাতে লাগল ;—প্রথমে পটকুটী,—যাকে বলে ছোট ছোট তাঁবু ; তারপরে কাণ্ড-পট-মণ্ডল,—সেই সব বৃহৎ শিবির যাদের মধ্যে কানাৎ দিয়ে পৃথক করা থাকে অনেক কক্ষ ; তারপরে শিবিরের পটবস্ত্র ; সব শেষে সরিয়ে ফেলল বিতানক,—তাঁবুতে ঢোকার পরদা।

চামড়ার চ্যাপ্টা থলিতে ভর্ত্তি হতে লাগল মণ মণ লোহার কাঁটা। এ সব ব্যাপারে কী বিরাট ধ্বনি জাগে, ভেবে দেখো।

ওদিকে—

ভাণ্ডা-গারীরা,—নীলিবাহকদের দিয়ে বহন করাতে লাগল কোশ, কলস, পীড়িকা ইত্যাদির সংগ্রহ ; এবং তারপর সেগুলি যখন লাখে-লাখে বোঝাই হতে লাগল নিশ্চল হাতীদের পিঠে, তখন মনে হ'ল, সামন্তকদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়েছে সঙ্কট।

দাসেরকেরা,—দূর থেকে দক্ষ এবং ক্ষিপ্র হস্তে ছুঁড়তে লাগল উপকরণের সম্ভার ;—তুষ্ট হাতীদের পৃষ্ঠ তাদের লক্ষ্য।

জাঘনিকেরা,—যখন নুয়ে বেঁকে হিঁচড়ে টানতে লাগল চুন্দী হস্তিনীদের, তখন পরতন্ত্রা তুন্দিলা সেই হস্তিনীরা কেবল দাঁড়ায় আর বিলম্ব করে, বিলম্ব করে আর পিছু হাঁটে। কী মুস্কিল ! দৃশ্য দেখে জনতার মধ্যে ওঠে হৈ-হৈ হাসি ! ধ্বনি-বৈকট্যের বিরাম নেই !

মদহস্তীদের পেটীবন্ধ দিয়ে সাজানো হচ্ছে ; গাত্র-বিহারের সুবিধার অভাবে, তাদের শুণ্ড থেকে বিনিন্দিত হতে লাগল পীড়িত বৃংহিত ; ঘণ্টার টঙ্কারে কান বুঝি ফাটে।

করভিণী উটগুলোও বিকট চীৎকার করতে লেগেছে, তাদের সুশোভন পৃষ্ঠে কণ্ঠালক রাখা হচ্ছে ; অত বড় বড় বোঝা, এসব কি ভাল লাগে ?

অভিজাত রাজপুত্রেরা এত ঝামেলা সামলাতে পারলেন না ; বাহনে বসিয়ে কুলীন-কুলদের আর পুত্র-কলত্রদের—আহা, আনাড়ী তারা, আকুল ভাবাপন্ন, —পাঠিয়ে দিতে লাগলেন নগরে।

যাত্রার সময়ে নতুন ভৃত্যেরা ঠিক-সময়টি ভুলে যায় ;—মাহুতেরা তাদের চীৎকার ক'রে ডেকে ডেকে হায়রাণ।

প্রসাদবিত্ত পত্তিরা রাজপ্রিয় বার-বাজিদের নিয়ে পৌঁছতে লাগল রাজাদের শিবিরে। চারভট সৈনিকেরা—কী সুন্দর তাদের চেহারা,—কর্পূরের স্থাসক' আঁকতে লাগল বক্ষে। স্থানপালেরা—ঘোড়ায় জয়িন থেকে ঝুলিয়ে, বুকের তল-সারিকাতে বেঁধে দিতে লাগল অন্তর-ফাঁপা কিঙ্কিণী ;—সেই কিঙ্কিণীর ক্বণৎকার যেন লক্ষ লক্ষ লাবণকপাখীর ডাক।

ঘোড়ার মুখে মুখে কুণ্ডলী পাকিয়ে যেতে লাগল লাগামগুলো (অবরক্ষণী) ; সেই হেন জটিলতার মধ্যেও কেমন ক'রে যে সাদীরা সন্নিবিষ্ট করছে বাঁদর, তা বোঝা দায় ; বলছে, এরা সৌভাগ্য-শকুন। সে এক দেখবার জিনিস।

প্রাভাতিক আহারের উপযোগী শ্যামল শষ্পে মুখশুদ্ধি করছিল অশ্বেরা,— এমন সময় কিনা বেজে উঠল যাত্রার দুন্দুভি! মুখে ঐ মধুর মত ঘাস—তাও আধ-খাওয়া অবস্থায় টেনে বের ক'রে দিল সইসেরা! আচ্ছা, আহারের সময় এ রকম ব্যবহার কি অবিচার নয়? আবার ওদিকে ঘাসিকদের চীৎকারে গগন ফাটছে।

এই বিপুল গণ্ডগোলের বার্ত্তা লেখা অসম্ভব। তবু দু-একটা বলি ;—
প্রয়াণ-বেলার ভিড়ের মধ্যে জোয়ান জোয়ান ঘোড়া, লাগাম ছিঁড়ে, মুখ উঁচু ক'রে লাফাতে লেগেছে। কত যে, তার ইয়ত্তা নেই ; তাদের পদটীকার দাপটে মন্দুরায় মন্দুরায় সে এক প্রলয়ের বিভ্রাট।

করেণুকাদের সাজ পরানো হচ্ছে ;—

কিন্তু সেখানে কখনো শুনেছ কি কর-কঙ্কণের ঝঙ্কার? মাহুতদের আহ্বানে শিবির-কক্ষ থেকে নির্গত হয়ে করেণুকাদের মুখে লেপন ক'রে দিয়ে গেল,— চন্দন,—হাজার হাজার সুন্দরীদের ঝঙ্কার-মুখর হস্ত। সে সৌন্দর্য্য কি ভোলা যায়! বিপুল কলরবের মধ্য দিয়ে, মন্দুরা থেকে বিনিষ্ক্রান্ত হয়ে রণোদ্যমে প্রস্থান করল মাতঙ্গ এবং তুরঙ্গের সজ্জিত বাহিনী।

সময় এবং সুযোগ বুঝে পথের এবং প্রদেশের প্রতিবেশীরা এল—তারা কেবল লুট করতে চায়। ঘোড়াগুলোর মুখের ঘাসগুলোও, ঐ সামান্য আঁটিগুলোও লুট হয়ে গেল। তাদের পিছনে ছুটেছে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেদের দল; আবার তাদের পিছনে হাজার হাজার গাধা, গাঁট গাঁট বোঝা নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরছে। গাড়ির চাকাগুলোর কী অসম্ভব কঁ্যাচকোঁচ আওয়াজ! হাজারে হাজারে চলেছে। রাস্তার বুকের উপর বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে গভীর দাগ।

বেচারী ষাঁড়েরা! হঠাৎ তাদের পিঠের উপর অত তৈজসপত্র চাপিয়ে দেওয়া হ'ল কেন? আগেই চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল সার ষাঁড়গুলোকে, তাদের কী দৌরাত্ম্যি! তাদের যে মাঝে মাঝে দাঁড়াতেই হবে, দেরি করতেই হবে! রাস্তার ধারে যদি সবুজ ঘাস প'ড়ে থাকে, সেগুলোকে কি মুখের মধ্যে না নিয়ে চ'লে যাওয়া যায়!

প্রাগ্র-মুখে চলতে লাগল মহাসামন্তদের পতাকাবাহিনী মহানস। লোক-ঠাসা ক্ষুদ্র কুটীরের অন্তরাল থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে লাগল সৈন্যেরা;—শত শত গ্রাম্য সুহৃদেরা তাদের প্রশংসায় মুখর।

হস্তীর পদতলে কত যে গ্রাম, কত যে কুটীর, কত যে আস্থান দলিত হয়ে গেল, তার ইয়ত্তা নেই; নিজেদের সামলে নিচ্ছে গৃহস্থেরা, কিন্তু মারছে মাহুতদের; আর মাহুতেরা পাড়ার লোকদের মানছে সাক্ষ্য।

সে এক রৈ-রৈ ব্যাপার!

এই মারামারির হট্টরোলে ব্যাঘ্রপল্লীর খড়ের ছাউনি ছেড়ে পালাতে লাগল গ্রামিণেরা। উপদ্রুত হয়ে ভয়ার্ত্ত বলীবর্দ্দগুলো মালপত্র পিঠে নিয়েই দিয়েছে দৌড়;—আর বণিকেরা চীৎকার করছে "গেল রে, গেল রে, আমাদের সর্ব্বস্ব ভাঙ্‌ল রে!"

তারপরে নিষ্ক্রান্ত হ'ল অন্তঃপুর-করিণীদের কদম্ব। তাদের আগে আগে চলছে দীপিকা-হস্ত অসংখ্য অনুচর। সেই আলোকে বিরল হ'ল লোকেদের ভীড়। ঘোড়-সোয়ারেরা ডাক দিতে লাগল, "আঃ, বড্ড দেরি করছে, চল।" খটখটে বৃদ্ধেরা সুখী হয়ে বাহবা দিতে লাগল।

ঐ দেখ,—তঙ্গণ-দেশীয় তুঙ্গ তুরঙ্গ! কী তাদের পা-ফেলার কায়দা! হ্যাঁ, একেই তো বলে দুলকি-চাল!

গাধার পিঠে চড়ার অভ্যাস না থাকায়, দক্ষিণী সাদীরা গাধার পিঠ থেকে ঝুপঝাপ ক'রে প'ড়ে যেতে লাগল। আর কী ধূলো! সেই ধূলোর লাবণ্য যেন গ্রাসে গ্রাসে খেয়ে ফেলতে চায় ধরণীকে।

সেই-হেন প্রয়াণ-সময়ে রাজদ্বারে রাজন্যদের আগমনখানিকে দেখতে হ'ল, অতি স্নিগ্ধ এবং রমণীয়। চোখে না দেখলে, আঁকা যায় না, সে রমণীয়তার চিত্র। প্রত্যেক দিক থেকে রাজারা আসছেন ;—গজবধূদের পৃষ্ঠে তাঁরা সমারূঢ় ;—

হৈমপত্রাঙ্কিত শার্ঙ্গ-ধনু ঊর্দ্ধে ধারণ ক'রে রয়েছে মাহুতেরা ; অন্তরাসনে অন্তরঙ্গেরা সমাসীন, তাদের হস্তে অসি। পশ্চিম আসনিকায় ভস্ত্রাবরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে—গুচ্ছ গুচ্ছ ভিন্দিপাল। তাম্বূলিকেরা দোলাচ্ছে চামর।

পর্য্যাণে সন্নদ্ধ রয়েছে রৌপ্য-ঘটিত নালক-অস্ত্র। পর্য্যাণের দুই পাল্লায় পট্টিকা দিয়ে নিশ্চলভাবে বাঁধা রয়েছে—রেশমের গদি ; পাদ-ফলিকাগুলি ন'ড়ে ন'ড়ে উঠছে ; আর সঙ্গে সঙ্গে স্ফায়মান হচ্ছে পদবন্ধের মণিশিলার ধ্বনি।

স্বস্থানে নিষণ্ণ রয়েছে রাজাদের জঙ্ঘাকাণ্ড এবং তাকে আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছে এক-একখানি অতি সুকুমার চিত্র-বাহার নেত্রবাস। জঙ্ঘিকাটির উপর পঙ্ক-পিশঙ্গতা। নীলবর্ণের সৌভাগ্য নিয়ে মসৃণ স-তুলার উপর সুন্দর দেখাচ্ছিল রাজাদের শুভ্র পরিচ্ছদ, এবং সেই শুভ্রতার উপরে আরও-সুন্দর দেখাচ্ছিল রাজাবর্ত্ত-কৃষ্ণহীরক-খচিত সুন্দর কঞ্চুক।

কোন কোন রাজার অঙ্গে ছিল চীনদেশীয় চোলক ; কারো বা বারবাণের স্তবরক-বস্ত্রে গ্রথিত ছিল তার-মুক্তার স্তবক ; কারো বা অঙ্গে ছিল শুভ্রশ্যাম সত্রী ; কারো বা আচ্ছাদনে শুকপাখীর পিচ্ছ-ছায়া।

রাজারা চলেছেন ;—

কারোর চঞ্চল হার-লতা জড়িয়ে পড়ছে দোলায়িত লোলকুন্তলে ;—
পরিজনেরা দৌড়ে এসে সেগুলিকে খুলে দিয়ে যায়।

কারোর কানের পাশাখানি বাচাল হয়ে উঠছে, হৈমপত্রাঙ্কুর কর্ণ-পূরের আঘাতে ;—পরিজনেরা দৌড়ে এসে কর্ণোৎপলটিকে আটকিয়ে দিয়ে যায় উষ্ণীষ-পট্টিকায়।

কারোর মস্তকে উড়ছে কুঙ্কুম-কোমল উত্তরীয়।

কারোর শিরস্ত্রাণে জ্বলছে পদ্মরাগের চূড়ামণি।

কারোর বা শিখরে ময়ূর-ছত্রের ভ্রান্তি-জাগানো ভ্রমরদের উড়ন্ত শোভা।

রাজারা আসছেন ঃ—

কারো সঙ্গে, আসছে তৈজস-বাহী দূরগামী বেগবান তরুণ হস্তীর দল;

কারো সঙ্গে,—যেন উড়তে উড়তে আসছে দুর্দ্ধর্ষ চার-ভট সেনা,— কার্দিরঙ্গী ঢাল আর চামর তাদের হাতে, মুখে হর্‌রার হুঙ্কার।

কারো সঙ্গে, দেখ, নাচতে নাচতে আসছে শত শত কাম্বোজী বাজি, তাদের স্বর্ণাভরণের শিঞ্জারবে মুখর হ'ল দিগন্ত।

কারো সঙ্গে, শত সহস্র দামামা ও দুন্দুভির নির্ম্মম সঙ্গীত।

রাজাদের শুভাগমনে পরিপূর্ণ হ'ল রাজদ্বার।

উন্মুখ পাদাৎ-রা এক এক ক'রে ঘোষিত করতে লাগল রাজাদের নাম, এবং তৎপর, সদা-প্রস্তুত হয়ে আজ্ঞাপালনার্থ দণ্ডায়মান রইল দ্বারে।

যখন উদিত হলেন দিনকর—

তখন

—"মহারাজের সমাযোগ-গ্রহণ, সৈন্য-সন্নিবেশ-সময় উপস্থিত"—

এই সংবাদ ঘোষণা ক'রে মুহুর্মুহুঃ বেজে উঠল সংজ্ঞা-শঙ্খ।

শ্রীহর্ষদেবের এই প্রথম প্রয়াণ;

এবং প্রথম-প্রয়াণই দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে।

তিনি আরোহণ করলেন করেণুকার পৃষ্ঠে।

অন্য হস্তীরা কর্ণতালের দোলা-বিলাসে তাঁর সিদ্ধ-যাত্রার সম্বর্দ্ধনা করতে লাগল; যেন তারা দেখেছে এক নবীন ঐরাবত।

তাঁর শিরোদেশে ধ্রিয়মাণ ছিল বৈদূর্য্যমণির বৃহদ্দণ্ড মঙ্গলছত্র;—পদ্মরাগ মণির খণ্ডসৌন্দর্য্যে খচিত;—আতপত্রখানি লোহিতবরণ,—যেন সূর্য্য-দর্শনের কোপে লোহিত হয়ে গিয়েছিল সে।

তাঁর শ্বেতাম্বর শরীরে সংলগ্ন ছিল—দ্বিতীয় বাসুকীর মত—নেত্রবাসনির্ম্মিত অভিনব কঞ্চুক; কদলীর গর্ভপত্রের চেয়েও অধিকতর তার ম্রদিমা। বাল্যবয়স হ'লে হবে কি? তাঁকে দেখাচ্ছিল—যেন ইন্দ্র-ভূমি-লালিত বালক একটি পারিজাত।

চারিদিকে ঢুলছে চামর ; চামরের বাতাসে দুলে দুলে উঠছে কর্ণপূরের কুসুম-
মঞ্জরী ;—বশীকরণ-চূর্ণের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে মঞ্জরীর পরাগ।
তাম্বূল-রাগরঞ্জিত সিন্দূর-বরণ কী সুন্দর ঠোঁট ! যেন ওষ্ঠ-মুদ্রা অঙ্কিত ক'রে,
অনুরাগের হাতে মহারাজ-চক্রবর্ত্তী তুলে দিচ্ছেন দ্বীপান্তরগুলির
পাঠ-নামা।
বক্ষের উপরে মহা-হারের সে কী জ্যোতির্ম্ময়ী স্ফূর্ত্তি !
—যেন দিগ্বধূরা চামরগ্রাহিণী হয়ে জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তিতে এসে দাঁড়াল।
তাঁর ভ্রূলতার ত্রিভাগ উৎক্ষিপ্ত ;—
"কর-দান করো" এই সবিভ্রম আজ্ঞা পেল যেন ত্রিভুবন।
ক্ষীরোদ সাগরের মাধুর্য্য সংগ্রহ ক'রে তাঁকে যেন আলিঙ্গন করছিলেন লক্ষ্মী।
সেই অমৃতময় রূপকে গূঢ়-পান করতে লাগল স্কন্ধাবারের লক্ষ লক্ষ নয়নের
উত্তানিত কুতূহল।
শ্রীহর্ষদেব অগ্রসর হতে লাগলেন,—
রাজন্যদের স্নেহার্দ্র হৃদয়ের অভ্যন্তরে গুণগৌরবে মগ্ন হয়ে,
এবং, দর্শক-জনতার মজ্জাকে যেন সৌভাগ্য-দ্রবে নিমগন ক'রে।
শ্রীহর্ষদেব অগ্রসর হতে লাগলেন—
যেন তিনি ইন্দ্র, যেন পৃথু,—
অগ্রজ-বধের কলঙ্ক-ক্ষালনের পরিকল্পনায়—নিতান্ত আকুল ;
পৃথিবী-পরিশোধনের উদ্দেশ্যে উৎসারিত করছেন মহীভৃৎদের।

তাঁর সম্মুখে চলেছে 'আলোকয়, আলোকয়',—
জয়শব্দকারী আলোক-কারদের সহস্র সংখ্যা। এ কি অর্ক-দেবের স্তব ?
তাঁর সম্মুখে চলেছিল দণ্ডীরা ;—
তাদের চঞ্চলচরণে চতুর নৃত্য ; তাদের নির্ম্মম ব্যবস্থায় শঙ্কায়
স'রে যেতে লাগল জনতা ;
চঞ্চল কদলিকার মত, পতাকার পীত আন্দোলনে, পবনদেবও যেন
শিক্ষিত হলেন বিনয়-ব্যবহারে ;
হস্তের হৈমবেত্রিকার আস্ফালিত আলোকে যেন দূরিত হ'ল দিন।
করেণুকা-পৃষ্ঠে অগ্রসর হতে লাগলেন নরপতি।

কত যে রাজচক্র শ্রীহর্ষদেবের সম্মুখে এসে অবনত করলেন শিরঃ—তার সংখ্যা নেই।

বপুগুলি কারো,—বিনয়ে সন্মিত,
মনগুলি কারো,—শঙ্কায় চকিত,
কারোর মাথায়,—চলন-শিথিল মণি,
কারোর মুকুটে,—সোনার বরণ বিভা,
শেখর-মালিকা থেকে আবার কারো ঝ'রে পড়ছে
লোল ফুলের রেণু।

চূড়ামণিতে থরথর ক'রে কেঁপে উঠছে আলোক ;—শুভ্র এবং মাঙ্গলিক।
সেই আলোকের বিচ্ছুরণ ছুটে চলল দিকে দিকে।
অবাক্, তির্য্যক, উদঞ্চ :—

যেন ঐ উড়ে গেল চাষপাখীর ঝাঁক ;
যেন ঐ মিলিয়ে গেল মন্দির-ময়ূরের উড়ন্ত শোভা,—
আহা,—রেণু-মেদুর মেঘায়মান আকাশের পটভূমিকায়!
যেন দিগন্তের দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা হয়ে গেল
কল্পপাদপের কোমল পল্লব,—চন্দনের বন্দন-মালিকা।

দিক্‌পালেরা প্রণাম করতে লাগল মহারাজকে ; এবং বীর হর্ষদেবও—

কখনো—নেত্রত্রিভাগের, কখনো—কটাক্ষের,
কখনো—চাহনির স্পষ্টতায়, কখনো—ভ্রূর বঙ্কিমতায়,
কখনো—আধো-মুচকিত হাস্যের, পরিহাস্যের, বিদগ্ধ আলাপের,
কুশল প্রশ্নের, প্রতি-প্রণামের, আজ্ঞাদানের,—
দাক্ষিণ্য উপহার দিয়ে,

কখনো বা যেন প্রণয়ের মাধুর্য্যেই প্রবীণদের মানসর্ব্বস্ব প্রাণগুলিকে ক্রয় ক'রে নিয়ে—রাজন্যদের মধ্যে যথানুরূপ বিভাগ ক'রে দিলেন—রাজ-অনুগ্রহ।

রাজার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে, চতুর্দ্দিকের আশাতটে তীর্ণ হ'ল সহস্র তূর্য্যের তারস্বর প্রতিধ্বনি ;—যেন ত্রস্ত দিঙ্‌নাগের শূৎকার।

দিগ্‌গজেদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েই যেন রাজহস্তীরা ত্রিধারায় ঝরিয়ে দিল মদস্রাব ;—সেই মদপ্রস্রবণ-বীথি মসীবরণ গ্রহণ করল কৃষ্ণভ্রমরদের সৌজন্যে ;—

যেন ঐ ব'য়ে গেল কালিন্দী নদীর সহস্র সহস্র বেণিকা।

সিন্দূরবর্ণ ধূলি-জালের অন্তরালে,—ম্লানারুণ হ'ল সূর্য্য। পাখীরা আশঙ্কা করল, —সময় এসেছে সূর্য্যাস্তের।

বিরাম নেই ভ্রমরদের বিপুল গুঞ্জনের,

বিরাম নেই হস্তীদের মাংসল কর্ণতাল-ধ্বনির ;

এদের গুঞ্জনে ও ধ্বনিতে—

দুন্দুভির ধ্বনিও ম্লান হয়ে যায়।

আন্দোলিত চামরের ঘন-সংঘাত—

আচমন করতে চায় স-চরাচর বিশ্বকে।

লক্ষ লক্ষ অশ্বের নিঃশ্বাস—! আর তাদের মুখের ও গাত্রের পিণ্ড পিণ্ড ফেনা,—!

মনে হ'ল যেন সেই সফেন শুভ্রতা অন্তরীক্ষের কণ্ঠে পরিয়ে দিচ্ছে—

সিন্ধুবার ফুলের নিরন্তর মাল্য।

মনে হ'ল—

সে যেন এক চক্রবাল-বিলোপী "ছত্ররাজ"-ছত্রের অরণ্য ;

তাদের স্বর্ণদণ্ডের প্রভায় ম্লান হয়ে যায় দিন ;—

যেন তারা একটি বেল-টগরের তোড়া।

ধূলি-যামিনীর নীতিতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে বাসর,—সেই বাসর পুনর্বার বিকসিত হয়ে উঠল অগণিত মুকুট-মণিকার শিশুপ্রভায়। লক্ষ লক্ষ অশ্বের হৈম-রাজত অশ্বাভরণ, এবং সেই আভরণের পরিকম্পিত বর্ণ এবং ধ্বনি, পরিবেশের সাকুল্যকে বধির ক'রে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে গেল পান্নার আভা। করীদের সে কী মদস্রাব! শীকরিত হ'ল দিগন্ত। সেই ধারা যেন শীতল ক'রে দিতে চায় শত্রু-প্রতাপের অনল। চক্ষুর উন্মেষখানি চুরি করতে চায় চূড়ামণি-মণ্ডলের বিদ্যুৎ-চঞ্চলা জ্বালা। সৈন্যবাহিনীর ভূপালও স্বয়ং বিস্মিত হয়ে গেলেন।

নিজের আবাস-স্থানের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠমান সেই বিজয়বাহিনীর প্রয়াণটিকে তিনি দেখতে লাগলেন ; বিক্ষিপ্ত হ'ল চক্ষুঃ।—

যেন কল্পারম্ভে বিষ্ণুর কুক্ষি থেকে নিষ্পতিত হচ্ছে জীবলোক ; অগস্ত্যের ঋষি-মুখ থেকে এ যেন এক বিশ্বপ্লাবী সমুদ্রের জন্ম-মাহাত্ম্য ; যেন সহস্রার্জ্জুনের সহস্রবাহুর কারা-বলয় থেকে সহসা মুক্তিলাভ ক'রে সহস্র-মুখে প্রবর্ত্তমান হয়েছে নর্ম্মদার দুর্ম্মদ প্রবাহ।

শিবিরের অনুচর ও সৈন্যদের মধ্যে যে সংলাপ চলেছিল, তার সমগ্র-বর্ণনা অসম্ভব।—কিছু বলি :—

"ওহে বাছা, এগোও না বাবু। ও মশায়, অত দেরি করছেন কেন ? চোখ থাকতেও কি দেখতে পাচ্ছেন না ? তুরঙ্গটা যে তম্‌তম্ ক'রে ছুটে আসছে, লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে।"

"ও ভাল মানুষের ছেলে, খোঁড়ার মত ন্যাঙ্‌ন্যাঙ্ ক'রে বেড়াচ্ছ কেন ? ঘাড়ের উপর সোয়ারী কষবে যে আগুয়ানরা।"

"কেমন ধারা তোর উট-হাঁকানো বাপু! তোর প্রাণে কি দয়ামায়া নেই ? দেখছিস না পথের উপর শুয়ে পড়েছে শিশু।"

"রামিল, কাছাকাছি থাকিস, দেখিস যেন ধুলোর ঝ'ড়ে না হারিয়ে যাস।"

"কাণা নাকি! দেখেও দেখতে পাচ্ছে না—ওর ছাতুর বস্তাটা ফুটো হয়ে গেছে।"

"পথ তো সকলেরই। তবে, ও কি রকমের তড়বড়ে চলা আপনার মশাই!"

"গরু-হাঁটার পথ ছেড়ে, ঐ দেখ বেটা ধরেছে,—ঘোড়-সোয়ারী-পথ, এবার মরবে।"

"বলি, ও জেলের বউ, এই পথে যাবি নাকি ?"

"ওরে বেটী মাতঙ্গী, মাতঙ্গ-মার্গে না ঢুকলে বুঝি তোর চলে না ? না ?"

"সামাল সামাল ওরে ভাই ;—ছোলার থলেগুলো যে বেঁকে গেছে—ফুটো থলে গ'লে যাবে।"

"বলিস না ভাই, আমি এ কথাটি রটাচ্ছি। তবে এ দেখছি, অতট থেকে তোর অবটে পড়া।"

"আচ্ছা তো ক্ষ্যাপা মেয়ে, স্বৈরিণী! মুখ বন্ধ ক'রে একটু সুখ কর্ না লা ?"

"ওহে সুবীরের পো, কাঁজির কলসী যে ভাঙল।"

"সাধে কি ওর বাপ নাম রেখেছে 'মন্থরক', আখ চিবোচ্ছেই তো চিবোচ্ছে ; গ্রামে পৌঁছে বেটা চেবানো শেষ করবে। বলদগুলো হাঁকিয়ে চল্ না বাপু।"

"এই চেট, ডুমুর পাড়তে হবে না, নেমে আয়। অনেক দূরের পথ।"

"দ্রোণক, হন্‌হনিয়ে চলছ কেন ? এটা দণ্ডযাত্রা, দৌড়বার সময় অনেক পাবে।"

"বুঝেছ হে, লোকটা বড় নিষ্ঠুর, ঐ একটা লোক ছাড়া সারা কটকের একই তো হচ্ছে ধারণা।"

"এই বেটা, মাংসের পাহাড়, ওরে স্থাবরক, দেখে চলিস, সামনে রাস্তা বড় এবড়ো-খেবড়ো, দেখিস যেন আমার চিনির জালা না ভেঙে যায়।"

"ওরে বুড়ো গণ্ডক, অত চালের বোঝাই কি এঁড়ে বলদে টানতে পারে ?"

"এই বেটা দাসীর ছেলে ! সামনের ঐ মাস-কলাইয়ের ক্ষেত থেকে ঝট্ ক'রে দা দিয়ে কেটে নিয়ে আয় তো, এক বোঝা ঘাস। এখানে জানছে কে ?—ঘাস গেল, কি জৈ গেল,—জানছে কে ?"

"ওগো, শুনছ, ছেলের বাপ, বলদগুলোকে একটু শানাও। দেখছ না, বাহীকদের কড়া পাহারা রয়েছে ক্ষেতগুলোর উপর।"

"শকটটা পিছিয়ে পড়েছে, সাদা রঙের ঐ ধুরন্ধর ষাঁড়টাকে এবার জোয়ালে জোতা যাক।"

"ওহে যক্ষপালিত, প্রমদারা যে শীতলা হয়ে গেল, চোখ দুটো কি তোর খোলা আছে ?"

"এই বেটা হতভাগা মাহুত, এগিয়ে চল। কাজের বেলায় নাম নেই, এখন হাতীর শুঁড় নিয়ে করছেন খেলা !"

"এই সমদ্ ! কাদায় পা পিছলে পড়বি যে ! সামাল্ সামাল্ ! পড়েছে রে, হাতীটা পা পিছলে পড়েছে রে। ও ভাই, ও ভালমানুষের ছেলে, ও মশাই, ও বিপদের বন্ধু,—একবার পাঁক থেকে উদ্ধার করুন হাতীটাকে।"

"ও হে মাণবক, এদিকে আইস-হ। গজের ঘন-ঘটায় সংঘট্ট-সঙ্কটের মধ্য দিয়া পলায়নের পথ দেখিবার পাই না যে !"

হর্ষদেব দেখতে পেলেন—

কোথাও যেন মহানন্দে মহান্ কলকল রবে সৈন্যকটকের স্তব ক'রে চলেছে—

সুখান্নপুষ্ট মেণ্ঠরা (হস্তি-জাগরিকাঃ),

বণ্টরা (অকৃত-বিবাহাঃ তরুণ-পত্তয়ঃ),

বঠরেরা (মূর্খাঃ), লম্বনরা (গর্দ্দভ-দাসাঃ)

লেশিকেরা (সইস-সাদীরা),

লুণ্ঠকেরা, চেটেরা, চাটেরা (প্রতারকাঃ),

অশ্বপাল, চণ্ডালেরা, এবং বাচাল রণ্ডাপুত্রেরা।

কোথাও দেখতে পেলেন—

সৈন্য-কটকের নিন্দা ক'রে চলেছে দুর্গত কুলক্রমাগত সেবকেরা। তারা বড় অসহায়। ক্লেশার্জ্জিত ধন, রেখে এসেছে কুগ্রামের কুটুম্বীদের কাছে; সে সবই তারা হারিয়েছে; এখন তাদের নিজেদের হাত দিয়ে টানতে হচ্ছে তৈজসপত্র-সমেত গরুর শকট; জুতছে বলীবর্দ্দ, বইতে হচ্ছে ঘরকন্নার জিনিসপত্র! সেই কুলপুত্রকেরা চেঁচাতে চেঁচাতে চলেছে—

"এই দণ্ডযাত্রাটি একলাই বা কী ক'রে যায়! যাক গে রসাতলে যাক গে। তৃষ্ণার শেষ হয়ে যাক। যাক গে। আমাদের মঙ্গল হোক। সেবা চলুক। সমস্ত দুঃখের কূট ঐ কটকটার স্বস্তি হোক।"

কোথাও মনে হ'ল—

স্কন্ধাবারটি যেন ছুটে চলেছে।

গ্রন্থিবদ্ধ জনতার সে কী পংক্তিবদ্ধ দ্রুত-চলন! যেন এক তীক্ষ্ণ জলস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে ছুটেছে নৌগতদের।

দলে দলে ছুটেছে জনতা।—

কৃষ্ণকঠিন স্কন্ধগ্রামে গুরুভার লগুড় নিয়ে ছুটেছে একদল;

একদল—

সোনার পাদপীঠ, সোনার পর্য্যঙ্ক, সোনার করঙ্ক, সোনার পিকদান, সোনার স্নান-দ্রোণী নিয়ে ছুটে চলেছে;

একদল;—গর্ব্বে তারা ফেটে পড়ছে; তারা দুর্ব্বারগতি; তারাই তো নিয়ে চলেছে প্রত্যাসন্ন পার্থিবদের মহার্ঘ্য উপকরণের সম্ভার! জনতাকে বহিষ্কৃত ক'রে দিচ্ছিল তাদের সমগতির তিরস্কার।

আর একদল চলেছে—তারা ভূপতিদের ভারবাহী ভৃত্য ;
মহানসের উপকরণ নিয়ে ছুটেছে আর একদল ;—
শূকরের চামড়ার চাম্‌তি দিয়ে বেঁধে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে হাজার হাজার নাক-ফোঁড়া পশু ; হরিণদের লম্বমান চটুকের নির্লজ্জ জটিলতা ; ভোজ্য-পক্ষীর সহস্র সংগ্রহ ; শিশু-শশকের অগণ্য সঞ্চয়।
আর একদল চলেছে—ভারিকেরা—
শাক-পাত্র এবং বেতসগাছের কচি ডগা নিয়ে ;
দুধ নিয়ে চলেছে,
ঘি (গোরস) নিয়ে চলেছে,
বাঁকে বাঁকে, ছানা, মাখম, ক্ষীর, ননী নিয়ে চলেছে ;—
পাত্রের মুখগুলি শুভ্রার্দ্র বসন দিয়ে সঙ্কিত,
—শীলমোহর-লাগানো।
ভারে ভারে তারা নিয়ে চলেছে
তলক (অগ্নি-শাটিকা), তাপক (উনান), তাপিকা (কাকপালিকা), হস্তক (শূলম্), তাম্র চরুকটাহ, পিটক (ভাণ্ডম্) ইত্যাদি।
অগ্রসরী জনতাকে তারা উৎসারিত করতে করতে চলেছে।

এত লিখলুম—তথাপি
দর্শন এবং বর্ণনের শেষ হবে না সেই বিপুল স্কন্ধাবারের,—
যদি না আরও কিছু লিখি :—
মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজকীয়-চক্ষে সব কিছুই যেন অভিনব।
খেট-চেটক চলেছে,—হাজারে হাজারে ; তারা নিযুক্ত হয়েছে দুর্ব্বল বলীবর্দ্দদের খেটনে ; বলীবর্দ্দগুলো পদে পদে প'ড়ে যাচ্ছে ; আর কৃষাণেরা কুলপুত্রদের উষ্মা জাগিয়ে চীৎকার করছে—
"কষ্ট ওঠানো! সে তো আমাদের কপাল! আর ফল খাবার বেলায় বড় বড় কর্ম্মাধ্যক্ষ হাজির হবেন হুজুরদের দরবারে।"
কোথাও দেখতে পেলেন—
রাজদর্শনের কুতূহলে দলে দলে দুদিক দিয়ে এসে সম্মিলিত হচ্ছে গ্রামিকেরা। তাদের মধ্যে কত রকমের মানবতা, কত রকমের ব্যবহার!

ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করছে জালিয়াৎ অগ্রহারিকেরা ;—তারা এল ; ভেট নিয়ে এল গ্রামের বৃদ্ধ মহত্তরেরা ; জলপূর্ণ কলস তাদের হাতে। অন্যদের সঙ্গে ছিল—দই, গুড়, মিশ্রী ; ফুল এবং রৌপ্যমুদ্রার পেটিকা। প্রচণ্ড দণ্ডীরা তাদের হাঁকিয়ে দিল ; তারা পালাল, পালাতে পালাতে পিছলে পড়ে ; পড়তে পড়তে তবু চেয়ে দেখছে,—নরেন্দ্রের চক্ষুর কটাক্ষ। নিজেরা অসৎ হ'লে হবে কি, চীৎকার ক'রে জানিয়ে দিচ্ছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভোগপতিদের দোষাবলী। অপূর্ব্ব তাদের উদ্ভাবনী শক্তি! দোষ নেই, অথচ প্রচার করছে দোষ। আবার পরক্ষণেই—শত শত প্রাক্তন আযুক্তকদের প্রশংসায় এবং চিরন্তন ধূর্ত্ত চাট-সৈনিকদের অবমাননায় তারা মুখর। কী ধূলোই না উঠছে সেই জালিয়াৎদের শ্রীচরণে!

কোথাও দেখতে পেলেন,—

একান্তে ব'সে অশ্ববার-চক্র বিচার-চর্চ্চা ক'রে চলেছে,—শস্য-সংরক্ষণের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে ; তাদের একমাত্র ভয়, যদি গৌড়ের অগ্রগামী সেনা সহসা উপস্থিত হয়ে শস্য-লুণ্ঠন ক'রে নেয়।

কোথাও দেখতে পেলেন—

রাজাদিষ্ট শস্য-পরিপালকেরা তুষ্ট হয়ে, রাজস্তুতি ক'রে চলেছে,—"ধর্ম্মই প্রত্যক্ষ দেবতা, ইনিই ধর্ম্ম, ইনিই দেবতা।"

আবার কোথাও দেখলেন—

গ্রামিনেরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে ; তাদের মুখে প্রারব্ধ হয়েছে নরপতি-নিন্দা। তাদের পাকা ধান উঠিৎ করা হচ্ছে ; "ক্ষেত খামার না থাকলে জ্ঞাতি-কুটুম্ব নিয়ে আমরা খাব কি? বৌ ছেলে নিয়ে যে মরতে হবে!" তাদের মুখে ফুটে উঠছে পরিতাপের ভয়হীন বিষণ্ণ বাণী—"কোথাকার এ রাজা! কোথা থেকেই বা এ এল! ওরে কপাল, এমনও কি রাজা হয়!"

আবার কোথাও দেখতে পেলেন—

দলে দলে কাতারে কাতারে খরগোস দৌড়চ্ছে, পালাচ্ছে ; তাদের পায়ে পায়ে পিছনে পিছনে দৌড়ে চলেছে দণ্ডপাণি চণ্ডেরা। লোষ্ট্র আর ইষ্টকের আঘাতে খরগোস মরছে—যেমন ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায় গেরিমাটির ঢেলা। কত মারবে? তবুও খরগোস পালায়।

কী তাদের কুটিলিকা গতি! দেখবার মত। জন্তু, জানোয়ার, সাদী, আর কুকুরদের পায়ের তলা দিয়ে তীরবেগে তারা এঁকেবেঁকে পালাচ্ছে। লোষ্ট্র পড়ছে, লগুড়, কুড়াল, কোদাল, কোণ, কীল, খন্তা, দা—সব কিছু তারা এড়িয়ে পালাচ্ছে। মরছে, তবু পালাচ্ছে।
যারা বাঁচবার, যাদের আয়ু আছে, তারা পালাবেই, বাঁচবেই।
কী মর্ম্ম-বিদারণ সেই শৃঙ্গানিক্বণ, সেই কোলাহল।

অন্যত্র দেখতে পেলেন—

জটলা ক'রে ব'সে রয়েছে সহস্র সহস্র ঘাসিক-সঙ্ঘ। বুষের ধূলোয় ধূসরিত হয়ে গেছে ঘাসের জঞ্জাল, এবং জালকিত হয়ে গেছে ঘাসিকদের জঘন; তাদের পুরাতন পর্য্যাণের একান্তে দুলছে—দাত্র; এবং তাদের কাঁধের উপর শিথিল হয়ে ঝুলছে, মলিন পশমের গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা কম্বলের মল-কুথা; সূতো স'রে গেছে, জীর্ণ হয়ে গেছে প্রভুদের দেওয়া প্রসাদী পিরাণ।
হাজার হাজার ঘাসিকেরা দৌড়চ্ছে, ধূলোয় ধূলো ক'রে দিচ্ছে স্কন্ধাবার।

আবার কোথাও দেখতে পেলেন—

তৃণ-পুলকের সংগ্রহে ভরাট করা হচ্ছে পঙ্কিল প্রদেশগুলি;
বেত্রিদের বেতের ভয়ে গাছের মগ-ডগায় আরোহণ ক'রে ব'সে রয়েছেন ব্রাহ্মণেরা; সেখানেও থামছে না তাঁদের শাস্ত্রকলহ।
গ্রামিণেরা খাদ্যের লোভ দেখিয়ে জিঞ্জির দিয়ে বাঁধছে গ্রাম্য কুক্কুরগুলোকে; এবং ঐশ্বর্য্য-স্পর্দ্ধী রাজপুতেরা এ ওর ঘোড়ায়,—ও এর ঘোড়ায়, বাজির টক্কর লাগিয়ে ধাক্কাধাক্কি ক'রে দৌড়চ্ছে।

সর্ব্বদর্শন শ্রীহর্ষদেব প্রবেশ করলেন স্কন্ধাবারে। তাঁর নয়ন-সম্মুখে এই কটক-টি যেন—

একটি বহুবৃত্তান্ত কৌতুক,
যেন একটি প্রলয়-পয়োধি—
গ্রাসে গ্রাসে গ্রাস করছে জগৎ;

অথচ এটি যেন—

ক্লেশবহুল তপশ্চরণের মত,—কল্যাণের বিজয়-পরিণাম।

স্কন্ধাবারের অভ্যন্তরে বাহুশালী কুমারেরা স্তুতি-নিষণ্ণ হলেন শ্রীহর্ষের। কৌমারিক জনতার মুখকমল থেকে নিঃসৃত হতে লাগল ওজস্বিনী বাণীর অন্তহীন সৌরভ।

একজন।—

আমাদের প্রথম পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন মান্ধাতা। তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন দিগ্বিজয়ের পথ। মহারাজ রঘু অত্যন্ত লঘুকালের মধ্যেই পশ্চিমাদি চতুর্দ্দিকের প্রসাধনকে খড়্গের আঘাতে প্রসাদন ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর রথের গতিকে কি কোনো নরপতি রোধ করতে পেরেছিল? জনমদ এবং ধনমদের গর্ব্বে যারা সর্ব্বদা স্ফীত থাকে, সেই হিংস্র রাজচক্রকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে করদ সাম্রাজ্য কি সৃষ্টি করেন নি শরাসন-দ্বিতীয় নরনাথ পাণ্ডু? পাণ্ডুর বংশেই দেখুন, সব্যসাচী অর্জ্জুন অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সম্পদ বর্দ্ধন করেছিলেন। সুদূর চীনপ্রদেশও শঙ্কিত-কর্ণে শুনেছিল তাঁর গাণ্ডীবের টঙ্কার; চৈনিক-সাম্রাজ্য অতিক্রম ক'রেও ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব্বদের হেমকূটপর্ব্বতের কুঞ্জে কুঞ্জে পরাজয়ের বাণী বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল সেই টঙ্কারের ঘোষণা।

দ্বিতীয়।—মহারাজ, সঙ্কল্পের তড়িৎ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দিগ্বিজয়ের কল্পনা।

তৃতীয়।—কিম্পুরুষের অধীশ্বর দ্রুমের কথা সকলেই জানেন: হিমমৌলি হিমালয়ের মহাবাধাকেও অতিক্রম ক'রে তাঁকে কিঙ্কর করেছিল,—কৌরবেশ্বর দুর্য্যোধনের খড়্গ-মহিমা।

চতুর্থ।—প্রাচীন চক্রবর্ত্তী সম্রাটদের প্রবন্ধ যদি বাদ দেওয়া যায়, তা হ'লেও দেখতে পাবেন দ্বাপরের রথীদের; যেমন—মহারাজ ভগদত্ত, দন্তচক্র, ক্রাথ, কর্ণ, কৌরব, শিশুপাল, সাল্ব, জরাসন্ধ, সিন্ধুরাজ, জয়দ্রথ, প্রভৃতি। তাঁদের অন্তরে অতি-জিগীষা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা রচনা করেছিলেন ভূমি-ভাগ সাম্রাজ্য।

পঞ্চম।—দেখুন, রাজসূয়-যজ্ঞের পর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন রাজা যুধিষ্ঠির; তাঁর আর বিজয়ের বাসনা ছিল না। অথচ যখন ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী কিম্পুরুষরাজ্য ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবের জগৎ-কম্প ঝঙ্কারে তাঁর হস্তগত হল, তখন তাঁকে সুশাসনের জন্য গ্রহণ করতে হয়েছিল সেই বিধ্বস্ত রাজ্য;—অপূর্ব্ব সহনীয়তায়।

একদা সম্রাট চণ্ডকোশ বলেছিলেন—পৃথিবী স্ত্রী-লোক ; কিন্তু তিনি কি জয় করেন নি পার্শ্ববর্ত্তী স্ত্রী-রাজ্য ?

ষষ্ঠ।— মহারাজ! বিজয়ের দণ্ড-যাত্রা অগ্রাহ্য ক'রে চ'লে যায় দূরত্ব বা সামীপ্যের বাধা। যে উৎসাহী তার কাছে, সমস্তই গ্রাহ্য।—ঐ যে দূরে দুই বিরাট পর্ব্বত—হিমাচল আর গন্ধমাদন রয়েছে তাদেরও সীমানা সংলগ্ন হয়ে যায়। কিষ্কু এবং তুরস্ক মনে হয় যেন একটি মহকুমা (বিষয়), পারসিক দেশ যেন একটি প্রদেশ, শকদের রাজ্যপদ যেন একটি গণ্ডগ্রাম (অংশতঃ স্থান) ; ভারতবর্ষের অতবড় পারিজাত্র পর্ব্বতে প্রবেশলাভ করা যেন একটি শিথিল চরণের কর্ম্মপদ্ধতি ; শৌর্য্যের শুল্ক দিয়ে যেন সহজেই লাভ করা যায় দক্ষিণাপথ ; এবং ঐ যে দক্ষিণ সাগরের কল্লোল-ধ্বনি শুনছে—অনিল-বিকম্পিত চন্দন-সুরভিত সুন্দরীকৃত গুহামন্দির-বিনিন্দিত দর্দ্দুর পর্ব্বত—সেটি যেন আপনার বিজয়-যাত্রায় নিয়ে আসে দক্ষিণ-সমীরবিকম্পিত মাহেন্দ্র-বিজয়ের শোভা এবং আশীর্ব্বাদ।

স্পর্দ্ধিত ভাষার শ্রবণ-সুখকর আলাপের মধ্য দিয়ে হর্ষদেব প্রবেশ করলেন নিজের আবাসে। দুইবার দৃষ্টিপাত করলেন মন্দির-দ্বারের দক্ষিণে এবং বামে। ভ্রূলতার কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জিত হ'ল রাজলোক। তারপরে প্রবেশ করলেন বহিঃস্থিত আস্থান-মণ্ডপে। উপবেশন ক'রে কিছুকাল দর্শন করলেন স্বীয় দিগ্বিজয়-বাহিনীর সমাবেশ এবং সমাযোগ।

এমন সময়ে প্রবেশ করল প্রতীহার। পৃথ্বীপৃষ্ঠে নিজের পাণি-পল্লব প্রতিষ্ঠাপিত ক'রে নিবেদন করল,—

"হে দেব, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর কুমার নিজের অন্তরঙ্গ হংসবেগকে দূতরূপে নিযুক্ত ক'রে প্রেরণ করেছেন। তিনি প্রতীক্ষা করছেন তোরণে।"

সাদর আদেশ এল—

"দূতকে সত্বর প্রবেশ করাও।"

দক্ষ প্রতীহার ক্ষিতিপালের প্রশ্রয়ে যেন অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হয়েই স্বয়ং প্রস্থান করল আদেশ পালনে।

অনন্তর রাজমন্দিরে বিনয়-প্রবেশ করলেন হংসবেগ। তাঁর আকৃতিটি সুধীজনের নয়নে যেমন আনন্দ ভ'রে দেয়, তাঁর সৌজন্যের ভদ্র ব্যবহার তেমনি লঙ্ঘন করতে চায় গুণের গৌরবকে। তাঁর অনুগামী হয়ে এল রাজপুরুষদের সঙ্ঘ; তারা বহন ক'রে নিয়ে এল অপর্য্যাপ্ত উপঢৌকন।

দূর থেকেই পঞ্চাঙ্গ দিয়ে অঙ্গনটিকে আলিঙ্গন ক'রে মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করলেন হংসবেগ। তার পরে যখন শ্রীহর্ষের মুখকমলের "আসুন আসুন" এই সবহুমান আহ্বানটি শ্রবণ করলেন স্বকর্ণে, তখন তিনি সানন্দে প্রধাবিত হয়ে হর্ষদেবের পাদপীঠিকায় লুণ্ঠিত করলেন নিজের ললাট-রেখা। ততঃপর তাঁর পৃষ্ঠদেশে যখন ন্যস্ত হ'ল পার্থিবের স্নিগ্ধ হস্ত, তখন তিনি নিবেদন করতে লাগলেন বারং-নমস্কৃতি। নরেন্দ্রের সম্ভ্রান্ত দৃষ্টির ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে উপবেশন করলেন অদূরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট আসনে।

শ্রীহর্ষদেব তখন নিজের তনুখানিকে ঈষৎ বঙ্কিম ক'রে চামরগ্রাহিণীর দিকে চাইলেন। নিমেষে সে হ'ল অন্তরাল-বর্ত্তিনী। সম্মুখীন হংসবেগকে জিজ্ঞাসা করলেন "হংসবেগ, কুশলে আছেন তো আমাদের শ্রীমান্ কুমার?"

দূত হংসবেগের উত্তর এল—

"অদ্য নিশ্চয়ই কুশলে আছেন কুমার; যেহেতু স্নেহে স্নাত এবং সৌহার্দ্দে সিক্ত হয়ে, আপনার শ্রীমুখ থেকে বর্ষিত হয়েছে এই সগৌরব কুশল-জিজ্ঞাসা।"

মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থেকে পুনর্ব্বার আরম্ভ করলেন সুচতুর দূত :—

"হে দেব, চতুঃসমুদ্রের সীমাশাসন আপনার কীর্ত্তি। আপনার চিত্তবৃত্তি সদ্ভাবে গর্ভিত। আপনার অনুরূপ মানব ত্রিভুবনে দুর্লভ। অতএব আপনি এই সংবাদটি শুনে সুখী হবেন যে আমার প্রভু,—আপনার হৃদয়ের মতই,—সুদুর্লভ একটি অশূন্য উপহার আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। সেটি তাঁর পূর্ব্বজদের উপার্জ্জিত। যোগ্য স্থানে ন্যস্ত ক'রে আমার ঈশ্বর কুমারদেব নিজেকেই কৃতার্থ করলেন। সেটির নাম "আভোগ"—বারুণ-ছত্র। এই রৌদ্রবারী ছত্রটিতে অনেকগুলি বিস্ময়কর গুণ এবং কৌতুক দৃষ্ট হয়। এই ছত্রের ছায়ায় প্রতিদিন শৈত্য-স্নিগ্ধতা প্রবিষ্ট করিয়ে দেয় চন্দ্রদেবের একটি হিম-কিরণ। কিরণটি প্রবিষ্ট হ'লে ধ্যানমাত্রেই লাভ করবেন—স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এবং সুন্দর জ্যোৎস্না-জলের ধারা; মণিশলাকা-নিঃসৃত সেই ধারাটি এত শীতল, এবং এত

স্বাদু, যে তার আস্বাদনে মানবের দন্তে বাজতে থাকে বীণা। প্রচেতা বরুণের মত যিনি চতুঃসমুদ্রের ভূত-এবং-ভাবী অধিপতি, কেবলমাত্র তাঁরই উপরে ছত্রটি দান করেন এই অনুগ্রাহিণী ছায়া, অন্য কারোর উপর নয়।

এই ছত্রটিকে দহন করতে পারেন না—সপ্তার্চ্চিঃ;
হরণ করতে পারেন না—পৃষদশ্ব বায়ু;
আর্দ্র করতে পারেন না—উদক;
মলিন করতে পারেন না—কোন প্রকার ধূলি;
এবং জর্জ্জরিত করতে পারে না জরার কোন নিবেদন।

মহারাজ, দৃষ্টিদানে অনুগৃহীত করুন 'আভোগ'টিকে। অন্যান্য সংবাদ আপনার বিশ্রামের অবকাশে নিবেদন করব।"

সমীপস্থ রাজপুরুষদের প্রতি দেহটিকে আবর্ত্তিত ক'রে তখন আদেশ দিলেন হংসবেগ, "সেটিকে নিয়ে এস, দেবতাকে দেখাও।"

সুসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান ক'রে, শুভ্র অংশুকাবৃত নিচোলকটির কোষ উন্মুক্ত ক'রে, রাজপুরুষটি তখন শালীন হস্তে ঊর্দ্ধে তুলে ধরল—

আভোগ-নামা সেই বরুণাতপত্র,
কুমার-দত্ত সুন্দর সেই প্রাভৃত উপায়ন।

আতপত্রটি যেন রাজসভায় শুভ্র-শোভায় হাস্য ক'রে উঠল।

এ কি ধূর্জ্জটির দক্ষিণ মুখের শুভ্রায়মান হাস্য? এ কি রসাতলভেদী বাসুকীর শুভ্র ফণার উল্লাস? ক্ষীরোদসাগর কি অস্থায়ী চক্রাকারে আকাশ-প্রাঙ্গণে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল?

পবন-সমারোহের মধ্যে এ যেন শরৎ-দিনের শুক্ল সৃষ্টি; যেন পক্ষবিস্তার বিমান-হংসে অধিরোহণ ক'রে অকস্মাৎ আকাশে বিশ্রাম নিতে এলেন পিতামহ ব্রহ্মা; যেন এটি অত্রিমুনির নেত্রজন্মা কুমুদ-বান্ধব চন্দ্রের জন্মদিবস।

আহা:—

এই ছত্রটি কি নারায়ণের প্রত্যক্ষ নাভিদণ্ড?
কৌমুদী সন্ধ্যার আনন্দতৃপ্তির রক্ষণ-পাল?

এই ছত্রটি কি—

মন্দাকিনীর তীরসেবী নীর-সিক্ত চন্দ্রের প্রকাশ ?
পৌর্ণমাসী নিশার জ্যোতির্দিবসের প্রণাম-প্রবর্ত্তন ?

বারুণ ছত্র-দণ্ডের প্রত্যেক পর্ব্ব-সোপানটিকে অনুসরণ ক'রে উর্দ্ধে উত্থিত হতে লাগল আসন্নবর্ত্তী রাজন্যমণ্ডলীর দৃষ্টি। চিত্রিত হয়ে গেল তাদের চেতনা।

এ যেন :—

অসার জীবনের একমাত্র সার, ত্রিভুবনের তিলক, শ্বেতদ্বীপের শৈশব, রাজচক্রবর্ত্তীত্বের শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্যের দন্ত-কৌমুদী, ধর্ম্মের হৃদয় এবং দিগন্তের মুক্তাময়ী কল্পনা।

প্রতি-সামন্তেরা ভাবলেন—

ঐ কি জ্যোৎস্নাবিন্দুর প্রদেশ-পরিধি ? এ কি শ্বেতগঙ্গার শুভ্র আবর্ত্ত ? এ কি বরুণ-মুকুটের জ্যোতির্মণিকার ঝঙ্কার ? চামরিকার শিখার মত অগ্নি-আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে মানস-পদ্মের মৃণাল-খানিকে ? এর শ্বেতবিতানের মধ্যে, ঐ যে অঙ্কিত রয়েছে হংস, সে কি কেবল জগৎকে শোনাচ্ছে চক্রবর্ত্তী-লক্ষ্মীর নূপুরের নিক্বণ ?

শ্রীহর্ষদেব সেই মহা-ছত্রটিকে উন্নতদৃষ্টিতে একবার দেখলেন—

যেন সর্ব্বমঙ্গলের উপস্থিতি, যেন নক্ষত্রপথের কুণ্ডলীকৃত মহিমা,
যেন মেঘমেদুর দিনের প্রভার প্রথিমা,
বিশ্ব-ইতিহাসের যেন পাপ-নাশনী স্ফূর্ত্তি, শ্রীর শ্বেত-মণ্ডপ, কীর্ত্তির শুভ্র লাস্য, খড়্গাধারা-জলের শুভ্র হাস্য, শৌর্য্যের যশ,
ব্রহ্মস্তম্ভের স্তবক।

"আভোগ"-উপঢৌকনের অব্যবহিত পরে, হংসবেগের আদেশ অনুসারে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কর্ম্মশ্রমিকেরা অবশিষ্ট উপঢৌকনগুলি ধীরে ধীরে শ্রীহর্ষদেব ও রাজসভার বিস্মিত নয়ন-সম্মুখে উদ্ঘাটিত করতে লাগল। যথা—

(১) একটি রক্তবরণ পদ্মরাগ-রত্ন, যার মূল্য এক পরার্দ্ধের ন্যূন হবে না ;
(২) ভগদত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃপকর্ত্তৃক হস্তগত অমূল্য অলঙ্কারের পেটিকা ;

(৩) কারুশিল্পের উৎকর্ষ—এক খণ্ড প্রভালেপী শিখরমণি ;

(৪) বক্ষঃহার ;—ক্ষীরোদসমুদ্রের হেতু-ভূত যেন শুভ্রতার চন্দ্র ;

(৫) রঞ্জনবর্ণে বিচিত্রিত, রুচি-অঙ্কিত একটি বেত্রময়ী পেটিকা ;—তার মধ্যে রক্ষিত ছিল মানব-শুচি ক্ষৌমবস্ত্রের শ্বেতসঞ্চয়,—যেন কুণ্ডলিত জ্যোৎস্না ;

(৬) কুশল-শিল্পী-কর্তৃক উল্লিখিত, শুক্তিশঙ্খ ও গন্ধর্ক স্ফটিকের অসংখ্য পানপাত্র ;

(৭) সোনার-পাত-দিয়ে-মোড়া কার্দ্দরঙ্গ-চর্ম্মের একটি খেটক-ঢাল,—সুন্দর নীচোলকের মধ্যে নিপুণ-ভাবে রক্ষিত ;

(৮) অশ্বারোহীর জঘন-গ্রন্থনের জন্য নির্ম্মিত একটি জাতীপট্টিকা,—ভূর্জ্জপত্রের মত কোমল ;

(৯) সমূরুক হরিণের বিচিত্রণা-সংযুক্ত কোমল চর্ম্মোপাধান ;

(১০) প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের মত পিঙ্গলগাত্র কতকগুলি বেত্রাসন ;

(১১) অগুরুর সুবাসিত বল্কলে গ্রন্থিবদ্ধ কতকগুলি সুভাষিত পুস্তক ;

(১২) মাত্র কয়েক-ছড়া সুপারী ;—তার এক-একটি ফল, এক-একটি পাতা দ্রষ্টব্য ; পরিণত পটোলের ছালের মত লাল তার রঙ—যেন হারীত পাখীর কৌমারটিকে হরণ ক'রে ক্ষরিত হচ্ছে হরিৎবরণ ক্ষীর ;

(১৩) সহকার-লতার রস, কৃষ্ণাগুরুর তৈল, এবং কপোতিকা পলাশের কবচ দিয়ে রঞ্জিতাঙ্গ—একটি মূলী-বেণুর মুরলী ;

(১৪) গরদের পট্ট-সূত্রনির্ম্মিত একটি বিরাট আধার-পাত্র ;—তার উপর চূড়া-প্রমাণে সুরক্ষিত ছিল ভিন্নাঞ্জনকৃষ্ণ অগুরু, গুরুতাপহারী প্রসিদ্ধ গোশীর্ষক-চন্দন, তুষার-শিলার মত শিশির-স্বচ্ছ কর্পূর-কক্কোলের পল্লব, লবঙ্গ-ফুলের মঞ্জরী, জাতীফলের স্তবক, এবং কস্তুরীমৃগের উগ্রগন্ধ নাভিকোশ ;

(১৫) উল্লক-ফলের সরস কলস ;—ছড়িয়ে পড়ছে অতিমধুর মদিরার সৌরভ ;

(১৬) শুভ্রাতিশুভ্র চামরের সংগ্রহ ;

(১৭) আলেখ্য-লেখনের জন্য কতকগুলি ফলক ; এবং অলাবু-গর্ভ-নিহিত তূলিকার সম্ভার ;

(১৮) কণ্ঠায় সোনার-শিকল-বাঁধা ছুটি কিন্নর ; ছুটি বন-মানুষ ; ছুটি জীবঞ্জীব পাখী ; ছুটি কস্তুরিকা কুরঙ্গ ; এবং ছুটি জল-মানুষ ;

(১৯) ঘরে-ফিরে-আসে এমন একটি চমরী গাভী ;
(২০) সোনার পিঞ্জরের মধ্যে বহু-জাল্পিক শুক এবং সারী ;
(২১) প্রবালের পিঞ্জরের মধ্যে চন্দ্রচকোর পক্ষী ;
(২২) গণ্ডার-খড়্গের একটি কুণ্ডল ;—তাতে জলহস্তীর কুম্ভ-মোতির মাল্যখানি দুলছে।

দিগ্বিজয়-যাত্রার প্রথম-পদপাতেই আভোগনামা এই বরুণাতপত্রটিকে দর্শন ক'রে শ্রীহর্ষদেব ভাবলেন—

"এটি শুভ মুহূর্ত্ত, এটি শুভ নিমিত্ত।"

তারপরে প্রীতহৃদয়ে হংসবেগকে আহ্বান ক'রে বললেন—

"ভদ্র, এই ছত্রটি মহার্ণবের অবদান। মনে হয় পরমেশ্বর মহাদেবের এটি কুমুদবান্ধব চন্দ্রছত্র। তোমাদের কুমারের নিকট থেকে এটিকে লাভ ক'রে আমি বিস্মিত হই নি। পরোপকার করাই হচ্ছে মহৎ ব্যক্তির প্রাথমিক শিক্ষা (বালবিদ্যা)।"

উপঢৌকনগুলি যখন রাজসম্মুখ থেকে ধীরে ধীরে অপসারিত হ'ল, তখন তিনি বললেন—

"হংসবেগ, তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে, আশা করি সুখী হবে।"

প্রতীহার-ভবনকে বিসর্জ্জন দিয়ে গাত্রোত্থান করলেন শ্রীহর্ষ। সমাপন করলেন স্নান। পূর্ব্বমুখী হয়ে আকাঙ্ক্ষা করলেন জাগতিক কল্যাণ।

তার পরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন বরুণাতপত্রের ছায়ায়।

ছায়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ-মাত্রই প্রথমে অনুভব করলেন—অপূর্ব্ব শৈত্য-জড়িমার শ্রদ্ধা।

যেন সোম-দেব রূপান্তরিত হয়ে এলেন তাঁর চূড়ামণির রশ্মিতে ;

যেন পৃথিবী-ছাড়া দুটি বিন্দু জল, তাঁর চোখ দুটিকে ধৌত ক'রে, চুম্বন করল মুখ ;

যেন ললাটখনিতে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল চন্দ্রকান্তের মণিশিলা।

তার পরে মনে হ'ল :—

কর্পূরের রেণু দিয়ে কে যেন নয়ন দুটিকে মার্জ্জিত ক'রে দিচ্ছে—তৌষারিক প্রসন্নতায়; গলায় দুলিয়ে দিচ্ছে তুহিনের নীহারভরা হার; হঠাৎ হৃদয়ে ফুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শীত-কুমুদের ফুল; আর হিম-পাহাড়ের শিলার মত বিলুপ্ত ক'রে দিচ্ছে অঙ্গ।

অশেষ বিস্ময়ের মধ্যেও চিন্তায় উদিত হতে লাগল একটি কথা;—

"পরাজয় স্বীকার ক'রেও যে অপরাজিত থাকে, তার কৌশলভরা কুশল-উপহারের উত্তরে, কী পাঠাব আমার প্রতি-কৌশল ?"

তার পরে আহারকালে আদেশ দিলেন—

"রাজদূত হংসবেগের কাছে নিয়ে যাও—

১। আমার অঙ্গের চন্দন-মাখা দুখানি শুভ্র-বাস,—একটু নারিকেলের বারি দিয়ে ধুয়ে দিও;

২। শারদীয় নক্ষত্রের মত আমার ঐ মুক্তাগুচ্ছের কটিসূত্র,—নাম যার 'পরিবেশ';

৩। আমার কর্ণাভরণ 'তরঙ্গক';—দেখো, যেন তার পদ্মরাগমণির জ্যোতিটি ঠিক লোহিত থাকে;

৪। আর স্কন্ধাবার থেকে পাঠিয়ে দিও কিছু আহার্য্য।"

এই রকম ক'রে কেটে গেল সূর্য্যের আলোক-লাগা সেই দিনখানি।

দিনের শেষে দেখা দিলেন—দিবস-ভানু সূর্য্য;—

ধীরে নেমে চলেছেন পশ্চিম মহাসমুদ্রে,—বিজয়বাহিনীর ধূলি-মহোৎসবের কৌলিন্য ক্ষালন করবার উদ্দেশ্যে;

যেন পশ্চিমদেব বরুণকে নিবেদন করতে চলেছেন—'আভোগ'-ছত্র-প্রদানের বার্ত্তা।

তখন,—পদ্মহস্তের পাপড়িগুলি দিয়ে সেবাঞ্জলি বিরচন ক'রে, দ্বীপ-সমন্বিতা ধরিত্রী যেন শ্রীহর্ষের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জগদ্বান্ধবের পাণি-গ্রহণ করল সন্ধ্যার অনুরাগ। শ্যাম হয়ে গেল প্রাচী—গৌড়ের অপরাধের আশঙ্কায়। তিমির-পুষ্পের মাল্য দুলিয়ে ধীরে ধীরে বিচরণ করতে লাগলেন মসীবর্ণা মেদিনী। আহা, কী সুন্দর সেই নির্ব্বাণ-পথের পরিক্রমা! সঙ্গে সঙ্গে নিভে যেতে লাগল ভ্রষ্টমতি নৃপদের প্রতাপের অগ্নিপ্রদীপ।

আকাশে ফুটে উঠল বন্ধ-বিরল পুষ্পস্তবকের মত নাক্ষত্রিক মঞ্জরী। কী উদার সেই অক্ষত পুঞ্জ-বিস্তার। দেখে মনে হ'ল—যেন আকাশপথে উত্থিত হয়েছে ঐরাবতের শ্বেত-চরণের ধূলি।

তারপরে দেখা দিলেন রোহিণীরমণ চন্দ্র-বৃষ। নৃপব্যাঘ্রের আঘ্রাণ পেয়ে ঐন্দ্রীদিক্ ত্যাগ ক'রে, যেন ছুটে আসছেন ক্রুদ্ধ সেই গন্ধবৃষ।

ধীরে ধীরে আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল জ্যোৎস্নার অনুরাগ:—
মানিনীদের হৃদয় ভেদ ক'রে যেন জানিয়ে দিতে চায় একটি কথা—
'আমি চ'লে যাচ্ছি।'
নবজাগ্রত মহারাজ শ্রীহর্ষের প্রথম দণ্ডযাত্রার ত্রাসে আতুর হয়েই যেন তরল-প্রাণে গ'লে যেতে লাগল বাহিনী-প্রবাহিণীর সরিৎ-প্রভুরা। চিন্তা সংক্রামিত হ'ল তিমির-সন্ততির হৃদয়-গহ্বরে। প্রতি-সামন্তদের চক্ষুর মতই যেন,—প্রণষ্ট হয়ে গেল কুমুদবনের প্রিয়গন্ধী নিদ্রা।

সন্ধ্যাবেলায় নক্ষত্রবিতানের তলদেশে উপবেশন ক'রে অবসরগ্রাহী অনুজীবিদের
বললেন, "যাও, হংসবেগকে পাঠিয়ে দাও।"
ক্ষণপরেই প্রবেশ করলেন রাজদূত হংসবেগ।
হর্ষদেব তাঁকে আদেশ দিলেন, "আপনার মনের ভাষ্য আমাকে জানান।"
প্রণাম-শেষে হংসবেগ আরম্ভ করলেন প্রস্তাব—

"হে দেব! আপনি বিদিত আছেন, পুরাকালে মহাবরাহ-গর্ভিতা লক্ষ্মীদেবী রসাতলে প্রবেশ ক'রে প্রসব করেছিলেন নরক-নামা একটি পুত্র। এই বীরের পদপ্রণয়ী হয়েছিল অসংখ্য মুকুটধর রাজা। আদেশ না পেলে অস্তে যেতে পারতেন না সূর্য্য, এই হেন রবি-প্রতাপী ছিলেন চক্রবর্ত্তী নরক। ইনি হরণ করেছিলেন বরুণের বহিঃপ্রাণশ্চর ঐ 'আভোগ' ছত্রটি। এই মহাত্মার বংশাবলীতে অন্বয়সূত্রে দেখা যায় কয়েকটি মহীপাল,—যেমন ভগদত্ত, পুষ্পদত্ত, বজ্রদত্ত। তাঁদের পরে যে সকল মহীপালদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁদের সূত্রে, প্রপৌত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন মহারাজ ভূতিবর্ম্মা, তারপরে পৌত্র চন্দ্রমুখবর্ম্মা, তার পরে পুত্র কৈলাস-স্থির স্থিতিবর্ম্মা। তাঁদের পরে আসেন মহারাজাধিরাজ

সুস্থিরবর্ম্মা।—এঁরই শৌর্য্য এবং প্রতাপে আনন্দিত হয়ে জনগণ তাঁর নাম দিয়েছিলেন—মৃগাঙ্ক। তাঁর কীর্ত্তির কথা কারো অবিদিত নেই ;—অহঙ্কারের যেন অনুজভ্রাতা। কিশোর বয়সেই তিনি প্রীতির দ্বারা দ্বিজাতিকে এবং অপ্রীতির দ্বারা অরাতিকে, একত্র-গ্রহণ করিয়েছিলেন শ্রদ্ধা-বারি। তাঁর সুশাসনে মুগ্ধ হয়ে একদা লবণ-সমুদ্রজাতা লক্ষ্মীদেবীও মধু-মাধুর্য্যের উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্যামাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ভাস্করবর্ম্মা। ভীষ্মের মত তিনি চিরকুমার, এবং সূর্য্যের মত প্রিয়-সুন্দর।
এঁর আধুনিক নাম—'কুমার'।
আমার মহারাজ 'কুমারে'র অশৈশব দেখতে পাই—প্রণামে বিরক্তি। মহাদেবের মত একমাত্র আপনার পদারবিন্দেই নিবেদিত হ'ল তাঁর প্রণতি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা—আপনার মত একটি মিত্র-লাভ। বিজয়ের প্রবাহ, মৃত্যুর অনিবার্য্যতা, এবং দিক্‌দহন প্রচণ্ড প্রতাপের মাধ্যমেই পরিচয় পাওয়া যায়—মৈত্রীর।
জানেনই তো মহারাজ, কার্য্যকে অপেক্ষা ক'রে লাভ করতে হয় মৈত্রী। কথায় বলে—'যেমন কাজ, তেমন সাজ'। কার্য্য এখানে তো কারণের অপেক্ষা রাখে নি। আমার প্রভুর মৈত্রী-সঙ্কিতার মূলে রয়েছে আপনার যশের প্রতিভা, এবং তাঁর ঐশ্বর্য্যের সহায়তা। সাহায্য-বিধানই তাঁর মানসিক আকাঙ্ক্ষা।
চতুঃসমুদ্র যাঁর কাছে একটি নগণ্য গ্রাম, তাঁর কাছে কি প্রাদেশিক সভ্যতার প্রদর্শনী বহন ক'রে নিয়ে আসতে পারে সন্তুষ্টি? শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর শুভদৃষ্টি যাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে দুর্ল্ললিত করতে পারে না, তাঁদের কাছে কি অকিঞ্চিৎকর নয়—কন্যকাপুরের লীলাবিলাসিনীদের কটাক্ষের প্রলোভন? সেই হেতুই কন্যকা-উপঢৌকন আপনার সম্মুখে প্রেরিত হয় নি। প্রার্থনাই হয়েছে শেষ নিবেদন। আপনি সুনিশ্চিত জানবেন প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর আপনার সহ-সঙ্গতির মধ্য দিয়েই লাভ করতে চান স্বাধীনতা।—

এ যেন অনঙ্গবিদ্বেষের মধ্য দিয়ে পিঙ্গলেশ্বরকে লাভ ;
পুষ্করাক্ষের মাধ্যমে ধনঞ্জয়কে লাভ ;
দুর্য্যোধনের পক্ষে বৈকর্ত্তনকে লাভ।

বসন্তের বাতাস যেমন মলয়-পাহাড়ের প্রীতি নিয়ে আসে, তেমনি হোক :—
আমার প্রভু এবং প্রভুর দেবতার মধ্যে মৈত্রীর সম্বন্ধ। দাস্য-সম্পর্কহীন হৃদয়ের বন্ধন যেন চিরদিন রাজমান থাকে। সুহৃদ-সম্পর্ক প্রার্থনীয়। আপনি

গ্রহণ করুন কামরূপ-অধিপতির পার্ব্বতীয় আলিঙ্গন, আপনি কামনা করুন প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরের শ্রীমুখদর্শন। সুধার নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে।
আমার এই ভাষণ যদি অনুমোদন না পায়, তা হ'লে আমাকে দান করুন আপনার কথনীয় ভাষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদায়।"

পূর্ব্ব সম্রাটগণের রাজকীয় আদেশ এবং অনুজ্ঞা অবগত ছিলেন শ্রীহর্ষ। ভারতবর্ষের এক সুদূর প্রান্ত থেকে এই সৌহার্দ্দ্যের বিনিময় এসেছে—এই সংবাদটি, তাঁকে প্রথমে মুগ্ধ করল এবং পরে দিল লজ্জা। অলক্ষিতে কেমন যেন একটি স্নেহরসের জন্ম দিয়ে গেল ঐ পার্ব্বতীয় কুমারের প্রীতি।
সাদরে বললেন হর্ষদেব,—

"হংসবেগ, তোমার প্রভুকে আমি প্রত্যক্ষ দেখি নি, কিন্তু সে হয়ে গেছে আমার পরোক্ষ-সুহৃৎ। স্বপ্নেও স্নেহকে বাধা দেওয়া যায় না। কমলবনকে জিজ্ঞাসা ক'রো, সে বলবে—'সূর্য্যের প্রতাপ আমার কাছে শীতল।' সখ্যের প্রবন্ধে আমরা কে? সেখানে আমাদের ক্রয় ক'রে নেয় অনন্তগুণের গরিমা। দল মেলে যখন কুমুদ ফুল ফোটে, তখন চন্দ্রের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রেই সে ফোটে। তোমার প্রভু কুমারের মনের মধ্যে এই যে রাজনৈতিক সঙ্কল্প এসেছে, এই সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠতায় আমি প্রীত। কেশরস্ফীত সিংহের দম্ভকে যেমন আমি মান্য করি, তেমনি আমার সুহৃদ্‌কে জানাচ্ছি সবহুমান নমস্কার। রাজদূত, তোমার প্রভুকে ব'লো, মিত্র-দর্শনের উৎকণ্ঠা আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে।"

হংসবেগ নিবেদন করলেন,—

"যারা সাধু, তারা সেবা-ভীরু। আমার প্রভুর বৈষ্ণব-বংশের মূলে রয়েছে অহঙ্কার-ধন। কিন্তু সে বিষয়ে রাজদূতের কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। মহারাজ, দেখুন,—রাজপুরুষের সংসার অতিবিচিত্র :—

অতিবৃদ্ধা দুঃখিতা জননীর মত, তারা কেবল দুর্গতির মধ্য দিয়ে সেবা ক'রে চলে; এদের গৃহিণীদের কণ্ঠে সর্ব্বদা বিরাজ করে অর্থের তৃষ্ণা, অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাড়না দিয়ে স্বামীদের করে ঘরছাড়া; সর্ব্বদাই দেখবেন, এদের গৃহে গৃহে গ্রহের মত দুর্বন্ধু দুঃস্থিত আত্মীয়দের

আক্রমণ এবং শেষ-পর্য্যন্ত অভিমান ও অভিযোগ; এদের জীবনে সদা লগ্ন থাকে ভৃত্যের মলিন প্রবৃত্তি;

ঘুঁটের আগুনের মত এদের সংসারে জ্বলতে থাকে একটি স্থির ক্রোধ। মহারাজ, আমরাই হচ্ছি সেই রকমের সেবাদাস। আমাদের সারা জীবনের চিন্তা—

কী প্রকারে প্রবেশ করব রাজকীয় কর্ম্মের প্রবাহে, এবং প্রবেশের পরে অন্যের হানি ক'রেও, বৃদ্ধি করব নিজের মর্য্যাদা এবং বিষয়-সম্পত্তি।

এই সব রাজপুরুষদের চরিত্র অতিবিচিত্র। প্রাথমিক কর্ম্মজীবনে এরা রাজতোরণে দাঁড়িয়ে থাকে,—যেন শুষ্ক এক-একটি আম্র-পল্লব। রাজদ্বারে প্রবেশের সময় এদের ভোগ করতে হয় দ্বারী-হস্তের দণ্ড-পীড়ন। অনেক সময়ে মৃগ-লক্ষ্মী পলায়ন। প্রতিহার-মণ্ডলের প্রহার সুখ-ভোগ্য নয়, তাদের হাত যেন গণ্ডারের চামড়া। কিন্তু নিধিপাদপের তলায় দাঁড়িয়ে, তারা ভুলে যায় অপমান ও লাঞ্ছনা, কেবল খোঁজে দাস্য। ফিরিয়ে দিলেও তারা ফিরে আসে; বর্জ্জন করলেও তারা ভ্রূকুটি তুলিয়ে করতে আসে অর্জ্জন। মহারাজ! একেই বলে—সংসারের উদ্বেগ।

কণ্টক-শোধন হ'ল ভাবছেন—কিন্তু পরক্ষণেই দেখবেন, এরা পায়েতে বিঁধে আছে কাঁটার মত। সর্ব্বদাই এরা চিন্তা করে—রাজদর্শন, কিন্তু সময়ে অসময়ে রাজকীয় আদেশ, প্রলয় ঘটিয়ে দেয় এদের জীবনে।

রাজবংশের সুদৃষ্টি এবং সন্তুষ্টিতে যদি এরা প্রবেশাধিকার লাভ করে কর্ম্ম-জীবনে, মহারাজ, তখন দেখবেন এরা অচঞ্চল—রক্তগণ্ড বানরের মত—বিকৃতিহীন মুখ, দৃষ্টিটি অধোমুখী। এরা যেন এক-একটি আকাশীয় ত্রিশঙ্কু। প্রাত্যহিক বন্দনা এবং তোষামোদের প্রকোপে স্ফীত হয়ে যায় কপাল এবং কপোল। যেন এরা এই-মাত্র লিপ্ত হয়ে এসেছে ব্রহ্মহত্যার পাপে।

পরান্নের গ্রাসে এরা পুষ্ট করে নিজেদের শরীর—যেন অশ্ব।

প্রয়োজন-বিধায় পদাঘাত সহ্য করে—যেন অনশন-ব্রতী।

পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতিও জঘন্য অত্যাচার করতে কুণ্ঠা বোধ করে না —যেন কুক্কুর।

এরা যেন প্রেত,—শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং পিণ্ডদানে পরাঙ্মুখ।

দগ্ধবিভূতির আভরণ-স্নেহ দিয়ে এই সব নিশাচরেরা শ্মশানের অশ্বত্থ-গাছের মত ঐ সব রাজবল্লভদের সাজায়।

এদের সভ্যতা! স্থবির তোতাপাখীর সভ্যতা। ওষ্ঠের নৃত্যে, মৌখিক বাচালতায়, জিহ্বার পরিবৃত্তিতে এদের আসে মাধুর্য্যবোধ। প্রভাব এবং প্রতাপের এদের অন্ত নেই। রাজ-পরিবার-চক্রে এরা যেন তাল এবং বেতালের সংক্রান্তি।

চিত্র-ধনুকের মত এরা নিত্য-নত, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে গুণ টানলেই ছিন্ন হয়ে যায় জ্যা।

এরা কপর্দ্দকহীন; কিন্তু নিজেদের বিজ্ঞাপনের জন্য বৈরাগীদের মত কাষায়-বস্ত্র পরিধান ক'রে সামনে এসে দাঁড়ায়,—যেন এক-একটি সৌগত বুদ্ধ।

মানদণ্ডের সঙ্গে এদের তুলনা চলে; তোষামোদের জল উঁচু, কি নীচু,—সে বিষয়ে এরা পাল্লাদার।

কোনো কাজই এদের মনঃপুত হয় না। অসম্ভব এদের প্রকৃতি-গত কার্পণ্য। অথচ দেখবেন, এদের কার্য্য-ভঙ্গীতে রয়েছে মস্তকের পাদ-স্পর্শী প্রস্তুতি, এবং অধরেতে রয়েছে বচন-শৈলীর বদান্যতা।

এই সব দাসদেরও আবার অন্নদাস থাকে। কিন্তু ভিন্নবর্ণ হয় না তাদের স্বভাব। এদের মধ্যে সর্ব্বদা থাকে নির্দ্দয় বেত্রপ্রহারের ভীতি; কিন্তু মুখে এবং চোখে, থাকে না লজ্জা এবং শ্লীলতার বাধা। অসময়ে অন্তর্হিত হবার প্রণালী এরা বিশেষভাবে জানে। প্রথমে এদের কর্ম্মমুখী করে বিত্ত-শ্রদ্ধা, কিন্তু অবসানে এরা উপার্জ্জন করে ক্লেশ, দুর্গতি। ধনবৃদ্ধির বুদ্ধি এদের আছে, কিন্তু শেষে পুরস্কার পায় সামাজিক অপমান।

মহারাজ! আপনার কুসুম-বনে যখন ফুল-ফোটার অধিবাস হয়, তখন এই দাসেরাই অঞ্জলিভরে আপনাকে দিতে আসে সেই-তোলা-ফুল, কিন্তু নিজেরা নিতে চায় অঞ্জলি-ভরা তৃষ্ণিত অর্ঘ্য।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নিষ্ফল সংসারের এরা হস্ত এবং চক্ষু। হিংসার আগুনে এরা সর্ব্বদাই পোড়ে; কে বড়, কে ছোট, সে বিষয়ে এদের বিচার-বুদ্ধি থাকে না। নীচলোক যদি উচ্চপদ প্রার্থনা করে, তা হ'লে নিজেরাই আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করে।

সাংসারিক অভিনয়ে এই ভৃত্যেরা যেন বিদূষক; নিজেরা দগ্ধমুণ্ড, কিন্তু দিবারাত্র নেচে-কুঁদে সংসারকে দেয় ভাসিয়ে।

এরা একমাত্র জানে—পেট, অর্থাৎ জঠরের পরিপূরণ ; যেন জন্ম নিয়ে
এরা মাতার গর্ভ-রোগ-বিনাশের লাভ করেছে প্রশংসা।

আমি ঘৃণা করি এই নিদারুণ 'দাস'-শব্দটিকে।

এই কি তাদের প্রায়শ্চিত্ত, প্রতিক্রিয়া, সর্ব্বশেষ শান্তি? এই কি দাসত্বের অভিমান, বিলাস, ভোগ? শ্রদ্ধা? প্রবল পঙ্কের মধ্যে যদি পা পড়ে, মহানদীর প্রবাহ এলেও উদ্ধার পায় না সেই পা-দুখানি।

মহারাজ, ভগবান শিবশঙ্কর এবং ভগবতী লক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার ক'রে জীবনের উচ্ছ্বাস নিবেদন করলুম আপনার কাছে।

ধনদান করুন নির্ধনকে, দাতাকে দিন করুণা,
বসন-শুভ্রতার মত রচিত হোক ঐশ্বর্য্যের অঞ্জলি।

যারা ক্লীব, যারা মুখপ্রিয়,—মাংসময় কৃমিময় এই হেন সংসারের একটি নূতন দাস্যকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে আমি ঘৃণা বোধ করি। সেই দাসত্ব—পদধূলির পাদপীঠ,—নরক।

সেই দাস্য যেন—

কাকের বাসায় কোকিলের জন্ম-নেওয়া, সুখের আঙিনায় শিখীর নৃত্য,
গৃহ-কার্য্যে বারাঙ্গনার বৃত্তি, চাটু-বিদ্যায় কুক্কুরের ধর্ম্ম।

দাস-ধর্ম্মে মূর্চ্ছনা নেই, সে একটি কাঠের বাঁশী। প্রয়োজন হ'লে এরা বিড়াল-বৃত্তিও অবলম্বন করে। নিজেদের সঙ্কুচিত এবং ক্ষুদ্র করতে এদের বাধে না। প্রয়োজন হ'লে এরা লগ্ন থাকে—পায়ের তলায় যেমন পাদুকা। প্রয়োজন-কালে—প্রভুহস্তের পীড়নকে বলে—পুষ্পপ্রহার ; পীড়ন নয়—বীণার ঝঙ্কার।

অথচ প্রভুর দুঃসময়ে এরাই ফণাধর হয়ে ওঠে—শঙ্খচূড়ের মত ; আর প্রভুকে মনে করে দুগ্ধ-শস্য।

মহারাজ! মানীরাই চিনতে পারে মানবতাকে। যারা মাথা নত করে না, তারাই মনস্বী।

আশা করি, রাজ-পরিবারের সঙ্গে আমার এই প্রণয়-সম্বন্ধ আপনি অভিনন্দন করবেন, এবং আরও আশা করি, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর আমার 'কুমার' আপনার হাতে বেঁধে দেবেন প্রীতির এবং মৈত্রীর মঙ্গল-সূত্র।"

এই ভাষণের পরে ক্ষণকাল স্তব্ধ রইলেন হংসবেগ এবং ক্ষণপরেই নতিবাদন জ্ঞাপন ক'রে গ্রহণ করলেন বিদায়।

রাজকীয় রজনীটি শ্রীহর্ষদেব অতিবাহিত করলেন—কুমার-সন্দর্শনের ঔৎসুক্য নিয়ে।

"কুমারকে বশীকরণ করতে কোনো মন্ত্রণার প্রয়োজন ঘটল না!
স্বেচ্ছায় এই হল তার আত্ম-নতি।"

চিন্তাতে পেলেন সুখ।—

পরের দিন প্রভাতে শুভাশীর্ব্বাদ-সহ প্রভূত উপঢৌকন—প্রতিদূতের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করলেন হংসবেগের হস্তে। প্রসন্ন-বিদায় নিয়ে প্রস্থান করল হংসবেগ। শ্রীহর্ষদেব বিজয়-যাত্রার উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার নিয়োগ করলেন নিজেকে। দিকে দিকে মিলন-পরামর্শী মিত্ররাজদের নিকটে প্রেষিত হতে লাগল সাম্রাজ্যীয় দূত।

লেখহারকের মুখে কয়েকদিনের মধ্যেই অবগত হলেন যে—শিবিরাবাসের সন্নিধানেই সমাগত হয়েছেন (মাতুলপুত্র) শ্রীভণ্ডিদেব; এবং তিনি নিয়ে আসছেন রাজ্যবর্দ্ধনের বাহুবল-অর্জ্জিত মালবরাজের সমস্ত সম্পদ।

সংবাদটি শোনামাত্রই নবরূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ভ্রাতৃশোকানলের প্রচণ্ড দাহ। হৃদয়কে কে যেন আতুর ক'রে দিয়ে গেল! কে যেন চোখদুটিতে ঘনিয়ে নিয়ে এল মূর্চ্ছান্ধকারের অন্ধতা! ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন, তার পরে প্রতিহারকে স্নিগ্ধকণ্ঠে আদেশ দিলেন—

"সভ্য সুজনদের বিদায় দাও, বরেণ্য কর অভ্যাগত-সমাগম;
কেউ যেন এখানে না আসে,
কেউ যেন পদধ্বনি না করে।"

মন্দিরের নিভৃতির মধ্যে নিজেকে ভ্রাতৃশোকের হস্তে নিবেদন ক'রে দিয়ে শ্রীহর্ষ রোদন করতে লাগলেন।

রাজস্কন্ধাবারে অশ্বে সমারূঢ় হয়ে মন্থর-গতিতে প্রবেশ করলেন ভণ্ডি। সঙ্গে এল কয়েকটি কুলপুত্র। ভণ্ডির আকৃতিটি যেন এক প্রলয়-সংবাদের ভগ্নদূত।

মলিন বসন; মুখে শ্মশ্রুর অসংস্কৃত সঞ্চয়—প্রকাশ করে দিচ্ছে প্রভু-শোকের পরিচয়।
ব্যায়ামপুষ্ট বিপুল বাহুতে, মাত্র একখানি বলয়;—যেন অমঙ্গল-সূত্র।
গ্রীবাদেশে অশ্রুস্নাত উত্তরীয়।

দ্রোহীর মত, দস্যুর মত, পাতকীর মত, অপরাধীর মত, রাজসভায় হল শ্রীভণ্ডির প্রবেশ।

যূথপতি মহাগজের পতনে যেন রোদন ক'রে উঠল অরণ্যের বিষণ্ণ হস্তী-সংসার;

সূর্য্যাস্তের শেষে যেন অবসন্ন-পদ্মের প্রতিধ্বনি।

মানসিক বৈক্লব্যের মধ্য দিয়ে হর্ষদেব ভণ্ডিকে দেখতে পেলেন—
দেখলেন—

সাগর এসেছে, তার মধ্যে রত্ন নেই।

দূর থেকে চীৎকার ক'রে হর্ষদেবের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন ভণ্ডি।

বিরল-চরণে অগ্রসর হয়ে ভূমি-শয্যা থেকে নিজের বুকে উঠিয়ে নিলেন ভণ্ডিকে। তারপরে তাঁর কণ্ঠ জড়িয়ে হর্ষদেবের সে কী মুক্তকণ্ঠ ক্রন্দন! অধীর শোকের বেগ যখন শিথিল হয়ে এল, তখন সভামধ্যে ধীরপদে রাজাসনে উপবেশন করলেন হর্ষদেব। প্রতীহার-নীত গঙ্গোদকে প্রথমে ধৌত করলেন নিজের অশ্রুকাতর মুখ; তার পরে স্বহস্তে মুছিয়ে দিলেন ভণ্ডির চোখের জল। কেটে গেল কয়েকটি মুহূর্ত্ত। ভণ্ডিকে প্রশ্ন করলেন ভ্রাতৃমরণের বৃত্তান্ত।
অহিত-হত্যায় যা কিছু ঘটেছিল—সমস্তই আর্দ্রকণ্ঠে নিবেদন করলেন ভণ্ডি।
নরপতি তখন বললেন—

"এই দুঃখের ইতিহাসের মধ্যে আমার ভগ্নীর—রাজ্যশ্রীর—
শেষ-অবস্থান আমাকে জানাও।"

উত্তর দিলেন ভণ্ডি—

"যখন দেবতাভূত হলেন রাজ্যবর্দ্ধন, তখন গুপ্তনামীয় জনৈক ব্যক্তি গ্রহণ করেছেন কুশস্থল; কারাগার থেকে কোনরূপে নিজেকে পরিভ্রংশন ক'রে, এবং বন্ধনমুক্ত হয়ে, সুদূর বিন্ধ্যাটবীতে দেবী রাজ্যশ্রী সপরিবারে পলায়ন করেন; যত দূর আমি লোকমুখে অবগত হয়েছি, তাতে আমি বুঝেছি, বিন্ধ্যাচলের গহনতার মধ্যে কোথাও না কোথাও তিনি আত্মগোপন ক'রে রয়েছেন। মহারাজ! দেবীর অনুসন্ধানের জন্য আমি একে একে চর, অনুচর, গুপ্তচর প্রেরণ করেছি; কিন্তু আশ্চর্য্য, তাদের মধ্যে কেউ এখনো ফেরে নি।

ধ্বীর কণ্ঠে এল মহারাজের প্রতিবাণী,—

"সখা, যাদের পাঠিয়েছ তাদের ফিরিয়ে আন। সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে আমি নিজেই সেখানে যাব, যেখানে রয়েছেন আমার ভগ্নী দেবী রাজ্যশ্রী। আদেশ দাও বাহিনীর সঞ্চালনা; এবং তুমি নিজে বাহিনীর একাংশের পরিচালনা-ভার গ্রহণ ক'রে প্রস্থান কর গৌড়-বিজয়ে। সভার বিরতি হোক। আমি স্নানে যাচ্ছি।"

তার পরে মহা-প্রতিহারের ভবনে ভ্রাতৃশোক-জনিত শ্মশ্রু করলেন মোচন। নিজের অঙ্গবাস, অঙ্গরাগ, পুষ্পমাল্য এবং অলঙ্কার খুলে ফেলে, পাঠিয়ে দিলেন ভণ্ডির নিকটে। অভুক্ত অবস্থায় সমস্ত দিন তাঁর অতিবাহিত হ'ল—বাহিনী-পরিচালনার পরামর্শে।

পরের দিন প্রভাতে ভণ্ডি ভূপালের নিকটে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞাপন করলেন—

"হে দেব! আপনার সম্মুখে উপস্থিত করছি মালবদেশবিজয়ী দেব রাজ্যবর্দ্ধনের স-পরিবর্হ বিজয়সাধন। এ ঐশ্বর্য্য—আঙ্গিক অনুষ্ঠান নিয়ে একদা তাঁর কাছে উপঢৌকনরূপে এসেছিল। সেই উপঢৌকনের তালিকা আপনার সম্মুখে প্রেষণ করছি।"

শ্রীহর্ষদেব বললেন—

"তাই কর।"

প্রদর্শিত হ'ল উপঢৌকন :—

১। এক-একটি গণ্ড-শৈলের মত সহস্র হস্তীর পুঞ্জ।—তাদের মদপঙ্কিল মধুকর-বাচাল শুণ্ডগুলি গম্ভীর গর্জ্জনের ধ্বনি-অঞ্জলি বিরচন ক'রে, উন্নত-প্রণামের অভিবাদন জানাল হর্ষদেবকে। দর্শনীয় সেই হস্তী-সঙ্ঘের সৌন্দর্য্য! যেন এক-একটি সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, শরৎদিনের শোভা নিয়ে এসে দাঁড়াল,—রাজছত্ররূপে।

২। হরিণ-গতি এক লক্ষ অশ্ব।—স্বর্ণ-চিত্রণ পুচ্ছের কী দ্যুতি!—যেন নবীনা চামরশ্রী।

৩। সহস্র পেটিকা অলঙ্কার, পেটিকার সজ্ব যখন রাজসম্মুখে উন্মুক্ত করা হ'ল, তখন মনে হ'ল যেন আকাশে খেলে গেল ইন্দ্রধনুর মহিমা।

৪। এক সহস্র সাতনহরী হার,—হারের তারাগুলি যেন মালব-মহিলাদের স্তন-শোভা বিসর্জ্জন দিয়ে সম্রাটের পদতলে এসে মিনতিভরে জানাচ্ছে "একদিন তার ছিলুম, আজ আমরা তোমার।"

৫। সহস্র শ্বেত চামর;—চন্দ্রের মত রজত-কান্তি তাদের দণ্ড; কীর্ত্তি এবং যশের যেন শুভ্র প্রতীক্।

৬। সহস্র শ্বেতাতপত্র;—এক-একটি যেন শুভ্র-পদ্মের মালঞ্চ।

৭। এক সহস্র বারবিলাসিনী;—অনুরাগ-সংগ্রামের মৈথুনপুষ্প হাতে নিয়ে অপ্সরাদের মত এসে দাঁড়াল।

৮। 'আসন্দী'-নামা একটি সিংহাসন।

৯। মালব-রাজ্যের রাজ্যোপকরণ।

১০। তালিকাভুক্ত স-সংখ্য আলেখ্য-পত্র;—তারা যেন কৃষ্ণলৌহের নিগড় প'রে রাজপদতলে উপস্থিত হ'ল।

১১। স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ এক লক্ষ কলস;—অলঙ্কারের পীঠি দিয়ে কলসগুলির মুখগুলি আবদ্ধ ছিল প্রীতি-নিবন্ধে।

হর্ষদেব একবার সেগুলিকে দেখলেন।

তার পরে আদেশ দিলেন অধ্যক্ষদের—

"যথা-অধিকারে উপঢৌকন গ্রহণ কর।"

পরের দিন প্রভাত। হর্ষ আরোহণ করলেন অশ্বে। স্নেহমুগ্ধা ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধিৎসায় নিজেই করলেন প্রয়াণ।

উত্তর প্রদেশ থেকে বিন্ধ্যাটবীর পদমূল।

এই পথ-যাত্রার বৈচিত্র্য একটি মানসিক সম্ভোগের আহ্লাদ নিয়ে আসে।

সম্রাটীয় নয়নে উদ্ভাবিত হতে লাগল সমাজ এবং সাধারণ্যের নাগরিক ও অনাগরিক সৌষ্ঠব।

গ্রামের লোকেরা গমের ভূষিগুলিকে ফেলে দিয়ে, যত্নে বাছাই ক'রে রাখছে খোসাগুলো, আগুনে পোড়াবে ব'লে; বীজ ধানগুলোকে আগুনের ধোঁয়ায় ধূসর ক'রে নিয়ে, তুলে রাখছে মাচায়। ছায়াশীতল বটগাছগুলোর ডালপালা

কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে জ্বালানি তৈরি করছে লোকেরা। গোয়ালে গরু নেই। সুন্দর সুন্দর বাছুরগুলোকে বাঘমারা ফাঁদের সামনে বেঁধে রেখেছে; বাঘে মারলে তবে খাব—এই উদ্দেশ্য। কাঠ-কুড়ানি ও কাঠুরেরা কাঠ কাটতে গিয়েছিল বনে, বনরক্ষকেরা তাদের কাছে উৎকোচ না পাওয়াতে তাদের যথা-সর্ব্বস্ব—ঐ কোদালগুলোও কেড়ে নিয়ে চ'লে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও ভগ্ন অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে চামুণ্ডা-মণ্ডপের ভাঙা দেউল; তাতে শিকড় গজিয়েছে, মণ্ডপটিকে মনে হচ্ছে একটি অরণ্যের অংশ। কৃষাণরা পতিত জমির উপরে কোদাল পাড়ছে, হালের বলদ নেই—ছেলেপিলেদের ও কুটুম্বদের ভরণপোষণের ভাবনায় তারা আকুল। মুখের চীৎকার দিয়ে নিজেদের গতর খাটাচ্ছে; শালীধানের খামারগুলোর ভাগবাটোয়ারা নিয়ে চেঁচাচ্ছে; আর বলছে, "আমার জমির মাটির রঙ কালো, সেখানে কি আমি কাসিয়া বুনব?"

বৃক্ষের কাণ্ডগুলি মাটিতে শুয়ে আছে, শাখা-প্রশাখা নেই, দু-একটি মাত্র নূতন পাতা গজিয়েছে। কোকিলাক্ষের চারায় ফুল ধরেছে; খয়ের গাছের শুকনো পাতার মধ্যে যেন নিভে গেছে সূর্য্যের আলো। শ্যামাকধানের নবমঞ্জরী আর অলম্বুফলের মধ্যে আভা পড়েছে কীটদষ্ট দুর্গতির। ক্ষেতের ভিতর মাচান রচনা ক'রে ব'সে রয়েছে রাতপ্রহরীর দল। সাপেদের উপদ্রব হয়েছে গ্রামে। গ্রামের পর কত গ্রাম এই রকম অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে দেখতে পেলেন মহারাজ শ্রীহর্ষ।

এই সবই দুর্ভিক্ষের সূচনা।

যখন তিনি আবার অন্য গ্রামে পৌঁছলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন, দুর্ভিক্ষের বিপরীত আকৃতি—সুভিক্ষ।

প্রতি পথের দুটি পার্শ্বে বিন্যস্ত রয়েছে পথিক-পাদপের নবপল্লবিত ছায়া; অটবীর বীথিতে বীথিতে শালফুলের শ্বেতমঞ্জরী; কুটিরে কুটিরে নাগপুষ্পের রন্ধ্রহীন শোভা। নব-খনিত কূপ থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্য বালিকারা।

সমাপ্ত হয়ে গেছে মৃৎ-পাত্রিকায় শক্তুভোজন, তাতে লগ্ন হয়ে রয়েছে কুটিল কীটের বেণী। জাম খেয়েছে পথিকেরা, পথে ছড়িয়ে আছে জামের আঁটি। ধূলিকদম্বের স্তবকে জেগেছে গ্রাম্য দেহের পুলক।

আর একটি গ্রামে দেখতে পেলেন গ্রৈষ্মী উষ্মা ;—

বালির ঘড়ার গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে রৌদ্রে রেখে ঘড়ার জল শীতল করা হচ্ছে ; জালার গায়ে শৈবালের প্রলেপ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হচ্ছে জল ; ছোট ছোট ঘড়ার ভিতর পারুল ফুল, কিছু লাল চিনি, কর্পূরের মেশানি দিয়ে রাখা হয়েছে। জল-ঘটিকার মুখগুলিকে বাঁধা হয়েছে ক্ষৌমবস্ত্রের মধ্যে পাটল ফুলের সঞ্চয় দিয়ে ;—হবে সুখপান!

অন্য গ্রামে যেতে যেতে চোখে পড়ল—

পথের ধারে রয়েছে অনেক জলসত্র, প্রপা, অনেক পানীয়শালা। সেখানে বিশাল বিশাল জলশালার শিখরগুলি আবৃত রয়েছে আম্রের শিশুপল্লবের সরস সমারোহে। রৌদ্রক্লান্ত পথিকেরা সেখানে পান করে শীতল জল এবং আর্দ্র ক'রে নেয় শ্রান্ত মস্তকের চীরবাস।

এই বিজয়াভিযানের পথে কত যে গ্রাম, গণ্ডগ্রাম, দুর্ভিক্ষের ইতিহাস, সুখের সংসার, আনন্দিত শোভা শ্রীহর্ষদেবের চক্ষে পড়ল তার ইয়ত্তা নেই। এ যেন একটি আরণ্য এবং গ্রাম্য দিগন্ত-দর্শন।

একটি গ্রাম লোহারদের অধিকারে ছিল। সেখানে উঠছিল সহস্র সহস্র হাতুড়ির বিকট টাঙ্কার এবং জঙ্গল-কাটা কাঠের গুঁড়ি পুড়িয়ে ঢেরী দেওয়া হচ্ছিল ;—ধূমায়িত কাঠকয়লার স্তূপ।

আর একটি গ্রাম ছিল কাঠুরিয়াদের অধিকারে। সেখানে নিদারুণ দারু-বহনের ক্লেশে সহস্র সহস্র লোকের দেহ থেকে ঘাম ঝরছে। অনেকের স্কন্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুঠার। তারা কুঠারের কণ্ঠে বেঁধে নিয়ে চলেছে সমস্ত দিনের আহার্য্য খাদ্য। নিকটস্থ গ্রামের বুড়ো বুড়ো মণ্ডলেরা তাদের কাছ থেকে

আদায় ক'রে নেয় পথের মাশুল। এই কাঠুরিয়াদের পিছনে আর একদল চলেছে কাঠুরিয়া—কালো কালো লাঠি তাদের হাতে, গরুর গাড়ীতে জলের জালা, আর চোরের মত ছেঁড়া পোষাক। জালাগুলোর মুখ পাতা দিয়ে বাঁধা। জালার ভিতর রয়েছে পানীয় জল এবং ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রচুর অর্থের গোপনসঞ্চয়।

এর পরে এল বনগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।—

শ্বাপদ-হত্যার উদ্দেশ্যে ব্যাধেরা কুটীকৃত করে পেতেছে অগণ্য জালের ফাঁদ, মৃগতন্তুর তন্ত্রী দিয়ে রচনা করেছে হাজার হাজার জাল। গ্রামের বাইরে বাইরে লক্ষ্য রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে বহির্ব্যাধ। শ্বাপদভীতি থেকে রক্ষা করছে অগণ্য গ্রাম, অসংখ্য শস্যক্ষেত্র। এই সংরক্ষণের মধ্যে অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টা চলেছে অনেকের। শাকুনিকেরা পিঠের উপর পিঁজরা ঝুলিয়ে গ্রাহক খুঁজে বেড়াচ্ছে; আর পিঞ্জর-মধ্য থেকে চীৎকার করছে তিত্তির, হারিল, কপিঞ্জল, বাজপাখী, বনকুক্কুট, মাদী-ময়ূর, বউলট্বুর দল। এদের পিছনে দৌড়চ্ছে পাশিকদের আর ধানুকদের ছেলেরা, তারাই এই সব পাখী ধরেছে। তারাও কিছু চায়। তাদের পিছনে রয়েছে একদল জোয়ান শিকারী। তাদের এক হাতে ধনুক আর-এক হাতে বাঁশী। ধনুক দিয়ে মারে আর বাঁশীর সুর শুনিয়ে হরিণদের ভোলায়।

একদল ভারীক চলেছে :—

তাদের বাঁকে রয়েছে সিধুয়াগাছের বাকল; কী সুন্দর তাদের রঙ, যেন চক্রবাকের কণ্ঠরোম চমকাচ্ছে!

আর একদল ভারীক চলেছে :—

তাদের ভারে রয়েছে সদ্য-তোলা ধাতকী ফুলের সম্ভার, আর তুলার চাষের জন্য গাঁট-বাঁধা অসংখ্য তুলার চারা।

আর একদল ভারীক চলেছে :—

তাদের মাথায় শোণের মূল
এবং অতশী পাটের গাঁট।

আর একদল চলেছে ঃ—

তাদের বাঁকে মাক্ষিক মধুর কলস, লক্ষ লক্ষ মৌমাছি কলসীর মুখগুলিতে বসেছে ; দূর থেকে দেখলে মনে হয়—এরা যেন এক-একটি উড়ন্ত ময়ূরপুচ্ছের নীল সোনালী রাজত্ব।

আর একদল ভারীক চলেছে ঃ—

তাদের বাঁকে—মৌচাকের মোমের মালা। বাঁক থেকে ঝুলছে লামঞ্জক ফুলের জটিল জটা, খরিদ গাছের বাকল-ছাড়ানো ছোট ছোট' ডাল, প্রগন্ধি কুষ্ঠলতার আর লোধ্রফুলের সমারোহ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়—কপিশবর্ণ কেশর ফুলিয়ে ঐ বুঝি ছুটে আসছে অরণ্যের সিংহ।

তার পর হর্ষদেবের চোখে পড়ল ঃ—

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গ্রাম্য এবং বন্য ফলের পেটি বহন ক'রে ছুটে চলেছে সহস্র সহস্র মস্তক ;—তাদের লক্ষ্য—একমাত্র বিক্রয়।
এবং ব্যগ্র গ্রামিকেরা বন্যফলের পেটিকা খরিদ করবার উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্ধাবী হয়েছে।
ফলের সৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত।

ভিন্নগ্রামে যখন পৌঁছলেন শ্রীহর্ষদেব, তখন তাঁর বিস্মিত নেত্রে প্রস্ফুটিত হ'ল বিরুক্ষ ক্ষেত্রের অনুর্ব্বর দুর্ব্বল রূপ। 'আরক্ষ'-নামক রাজকর্ম্মচারীরা সেই সব উষর জমির সংস্কার-কার্য্যে দণ্ড-হস্তে ব্যাপৃত। শঙ্কিত-চরণে অন্তর্দ্ধান করছে অরণ্য-হরিণেরা। হেলাভরে পালিয়ে যাবার কী সুন্দরী তাদের গতিলীলা! অত বড় বড় উচু বাঁশের বেড়াগুলোও উদ্দাম উল্লম্ফনে টপকিয়ে পালাচ্ছে। পথ জুড়ে চলেছে সহস্র সহস্র শকটের শ্রেণী, আকাশ অন্ধকার ক'রে উঠছে শকটের ধূরের ধূলি। ক্ষেত্র-সংস্কারের জন্য গাড়ি বোঝাই ক'রে সার চলেছে। সার-সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে—

পুরাতন পাঁশ, পচা পাতার সার এবং কালো ঘুঁটের সার।

সৈরিকেরা সরোষে চীৎকার করছে, আর ভারবাহী শাক্কর বলদগুলো ভার টানতে না পেরে শিং দোলাচ্ছে।

শকটশ্রেণীর চক্রের সে কী বীভৎস ধ্বনি!

দেখতে পেলেন :—

গ্রামবাসীদের খড়ের ঘর। তার পাশে নিম আর অশ্বত্থগাছের ছায়া। উপকণ্ঠে সযত্নে রচিত হয়েছে ইক্ষুর ক্ষেত্র,—দেখাচ্ছে যেন এক-একখানি বাঁধানো পান্না।

গৃহগুলির অবস্থান কিছু দূরে দূরে। মাঝে মাঝে রয়েছে মরকতবর্ণের স্নুহি-পাদপ এবং কার্ম্মুক-কর্ম্মকারী বংশবিটপের বেড়া। সেগুলির পাশে অনধিকার-প্রবেশে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে সজ্জিত রয়েছে,—কণ্টকিত করঞ্জমঞ্জরীর রক্তবরণ বৃতি।

গৃহবাটিকার গুল্মগহনতায় দেখতে পাওয়া গেল এরণ্ড, বচ, বঙ্গক, সুরণ (শুষণী শাক), শেগট (শীগ্রু), গ্রন্থিপর্ণ, গোধূক (কাশিয়া) এবং গর্মূৎ ঘাস। পাহারার জন্য পাশে পাশে উঠেছে ছোট ছোট উঁচু মাচান;—তাদের মাথায় অলাবুর লতা; খরিদ কাঠের খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে বাহুড়ের দল। মাচানের পাশে ফলন্ত ডুমুরের উজ্জ্বল শোভা। দূরের একটি কুটির থেকে হঠাৎ উঠল কুক্কুটের আরটন। কুটিরের আঙিনাটি অগস্তিগাছের স্তম্ভ দিয়ে রচিত। তার মধ্যে ছিল ক্ষিপ্র বাজপাখী ও গ্রহবাজ কপোতের ছোট্ট ছোট্ট কুঠ্রি। আঙিনার পাশে ছোট্ট একটি পুষ্করিণী, তাতে ফুটে রয়েছে পদ্মফুল।

এই সব গ্রামগুলির শোভাখানি সুন্দরিত ছিল :—

কোথাও কিংশুক ফুলের অগ্নিমান্ সমারোহে,
কোথাও শাল্মলীফুলের তুলার সঞ্চয়ে,
কোথাও নল শালি-ধানের এবং বেণুকুঞ্জের শ্যামলতায়,
কোথাও মাল-বীজের স্বর্ণশোভায়,
কোথাও কুমুদ-শালুকের বীজের শর্করিত খণ্ডের তণ্ডুলে

কুসুম্ভফুলের বন্ধনী দিয়ে অপূর্ব্ব কৌশলে রাখী করা রয়েছে রাজাদান চাউলের মরাই। মদন-ফল দিয়ে স্ফীত করা রয়েছে মধুকফুলের মদ। কুম্ভে কুম্ভে সঞ্চিত রয়েছে রাজমাসা (মসুর), ত্রপুষ (শশা), কুষ্মাণ্ড, অলাবু এবং কর্কটিকার (করমচা) বীজ।

তাদের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোষা বিড়াল এবং জাতকুক্কুর।

এই বনগ্রামকগুলি উত্তীর্ণ হয়ে ভিন্ন দেশে যখন উপনীত হলেন শ্রীহর্ষদেব, তখন আকাশে লেগেছে সন্ধ্যা-সূর্য্যের অস্ত-শ্রী। অরণ্যের প্রান্তে এসে শিবির-সংস্থাপনের আদেশ দিলেন শ্রীহর্ষদেব।

ইতি শ্রীবাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে

ছত্র-লব্ধির্নাম সপ্তম উচ্ছ্বাসঃ ॥

অষ্টম উচ্ছ্বাস

মনের আশা এবং প্রার্থনার প্রাপ্তি-স্বীকার,—দৈবের কৃপায় সহসা সম্পাদিত হয় ;—ভব্যদের পূর্ব্ব-সেবার মত ॥ ১

মনীষার সম্পর্ক, প্রণষ্ট ইষ্টজ্ঞাতির দর্শন এবং তাদের অভ্যুদয়,
প্রত্যেকের ভবনে ভবনে নিয়ে আসে সুখ—
যেন মহারম্ভের সমা-লব্ধি ॥ ২

পরের দিন যখন প্রভাত হ'ল, তখন পৃথ্বীদেবীর মহাসন্তান শ্রীহর্ষদেব বনগ্রামক থেকে বিনির্গত হয়ে প্রবেশ করলেন বিন্ধ্যাটবীর গহনতায়। গভীর অরণ্যের মধ্যে চলতে লাগল দেবী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধান। বিপুল সৈন্যবাহিনীর ইতস্ততঃ-সঞ্চালনে আলোড়িত হ'ল বিন্ধ্যবন। দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকগুলি দিন।

একদা অরণ্যে ভ্রমণ করছিলেন ভূপতি, এমন সময় আটবিক-সামন্ত 'শরভকেতু'র পুত্র 'ব্যাঘ্রকেতু' সহসা উপস্থিত হ'ল—রাজনয়নের সম্মুখে। সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে একটি শবরযুবা। তার কজ্জল-শ্যাম আকৃতির দর্শনী বিস্মিত করল হর্ষদেবের চিত্ত।

সেই শবরযুবা—যেন অঞ্জনশিলার চলন্তরূপ।

> সাহসের সহচারিণী, অন্ধকারিণী, তার কপালিকায় জেগে উঠেছিল ত্রি-শাখ ভ্রূকুটির ভঙ্গ। সেই ভ্রূকুটিতে যেন ভরা ছিল হিংসার হৃদয়। একটি কর্ণে দুলছিল শুকপাখীর পাখার মত পান্নার তাড়ঙ্ক, দ্বিতীয়ে দুলছিল 'কাচরাখ্য' স্ফটিকের কণিকা।
>
> রক্তবরণ চক্ষুর পক্ষ্ম থেকে প্রকীর্ণ হচ্ছিল হিংসার জ্বালা—যেন ঘা খাওয়া নেকড়ে বাঘের বুক থেকে রক্ত ঝরছে।
>
> নাসিকায় অঙ্কিত ছিল অবনাট-ভঙ্গী, অধরের প্রহসনে চিপিটক-মুদ্রা, এবং চিবুকের চিকণতায় ঋজুতা।
>
> তার স্কন্নন্-স্কন্ধের উপরে, বঙ্কিম গ্রীবার শিখরে, বিকটভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল কপোলাস্থির উদ্ধত স্পর্দ্ধা।

তার সেই সঙ্কীর্ণ কটিভাগ, তটশিলার মত তার সেই কোদণ্ড-টঙ্কার-মুখর বিস্ফাল বক্ষঃদেশ দর্শন ক'রে হর্ষদেবের মনে হ'ল—বিন্ধ্যবন হাসছে। অজগরের মত গরীয়ান কী অপূর্ব্ব তার ব্যায়াম-বিশাল ভুজযুগ! হিমাচলের শাল এবং দেবদারু যেন সেই ভুজযুগের প্রতীক।

> তার একটি মুষ্টির গ্রহণীতে ছিল নাগদমনের লতাবলয়, অন্যটিতে ছিল অহি-রমণীর গোদন্ত-পুষ্প-সম্রিত চিত্রক সর্পের নির্ম্মোক-বলয়;
>
> কটিদেশে—শৃঙ্গময় পারদ-রসলিপ্ত মসৃণ কৃপাণ;
>
> অঙ্গে—শ্বেত ভল্লুকের কম্বল-লোমের অধোবাস; এবং

পৃষ্ঠে—ব্যাঘ্রচর্ম্মের পট্টিকাবন্ধে লম্বমান ভস্ত্রাভরণ; সেই তূণীরের
মধ্যে সংরক্ষিত ছিল কৃষ্ণবরণ ভল্ল এবং বাণ,—যেন হিংসার
আঁধার-লতায় ফুটে উঠেছে রূঢ়-পল্লব।

যারা তার অনুগমন ক'রে এসেছিল, তাদের—

কারো বাম স্কন্ধে ছিল—

খদির বৃক্ষের জটা-দিয়ে-বাঁধা, উত্তংসিত, চাষপক্ষীর পুচ্ছ-শিখর;

কারো দক্ষিণ স্কন্ধে ছিল—

ময়ূর-পেখমের ইন্দ্রনীল সজ্জার বন্ধনীতে, হরপ্রাণ-ধনু;

কারোর গ্রীবা সুশোভিত ছিল—

স্বস্তিকবন্ধ-মুদ্রায় অবাঙ্মুখী—শশক এবং তিত্তির পাখীর রুধিরের
রঞ্জনায়।

কে যেন তাদের বুকের উপর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে রূপ-বর্ণকের মুষ্টি।

মহানবমীর মহিষমণ্ডলের মত, বিন্ধ্যগিরির লৌহসঞ্চয়ের মত, মৃগরাজচক্রের ধূমকেতুর মত, কালরাত্রির কামুকের মত, কলিকালের কারণবন্ধুর মত,—যখন শবরযুবা অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে মহারাজের সম্মুখে এসে দাঁড়াল, তখন তাকে দেখে মনে হ'ল—

গিরিতটের একটি তমাল পাদপ হেঁটে আসছে,
এ যেন যন্ত্রোল্লিখিত অশ্মসারমণির চলন্ত একটি স্তম্ভ।

শবরযুবাকে অদূরে স্থাপন ক'রে ব্যাঘ্রকেতু নিবেদন করল—

"হে দেব, যিনি এই বিন্ধ্যাচলের স্বামী এবং পল্লীপতিদের প্রাগ্রহর, সেই শবর-সেনাপতির নাম 'ভ্রূকম্প'। এই শবরযুবা তাঁর ভাগিনেয়;—নাম 'নির্ঘাত'। বিন্ধ্যবনের প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি এর সুবিদিত। প্রাদেশিক ব্যবস্থার কথা বলা অবান্তর। এই যুবা আপনার আজ্ঞার যোগ্য।"

পরিচয়ের পর শবরযুবা নির্ঘাত ক্ষিতিতলে মৌলি নিহিত ক'রে প্রণাম করল এবং সযত্নে রাজপদপ্রান্তে স্থাপন করল একটি তিত্তির ও একটি শশকের উপঢৌকন।

সম্মানিত বাক্যে তাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"অঙ্গ, তুমি তো দেখছি এখানকার সব কিছুই জান। সারাদিন কান্তারে কান্তারে শিকার খেলে

বেড়াও। তোমাদের সেনাপতির কিংবা তোমার অনুচরদের মধ্যে, সম্প্রতি কি কারো চোখে পড়েছে কোন উদার-রূপা মহিমান্বিতা রমণী ?”

ভুপালের সঙ্গে আলাপের প্রসাদ লাভ ক’রে নির্ঘাত নিজেকে কৃতার্থ মনে করল। সসম্ভ্রম হ’ল তার নিবেদন—

“সেনাপতির অজ্ঞাতে বা অসাক্ষাতে বিন্ধ্যাটবীর এই অঞ্চলে একটি হরিণও সঞ্চরণ করতে পারে না। যেখানে এই ব্যবস্থা, সেখানে রমণীর কথা আপনাকে কি আর জানাব! তার উপর যে অবলার কথা আপনি বলছেন, তিনি অসামান্যা রূপবতী। তথাপি আমি বলছি, মহারাজ যখন আদেশ দিয়েছেন তখন সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ ক’রে প্রতিদিনই এই অন্বেষণের প্রতি রইবে আমার আ-মর্ম্ম চেষ্টা। এই স্থান থেকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটি আশ্রম স্থাপিত রয়েছে। মুনিরাও প্রশংসা করেন সেই আশ্রমের। এই সম্মুখীন পর্ব্বতমালার পাদদেশে গিরিনদীর তীরে, পার্ব্বতীয় বনগহন-স্কন্ধে, প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই আশ্রম। সেখানে অসংখ্য শিষ্যের সাহচর্য্যে একজন ভিক্ষান্নজীবী পারাশরী বহুদিন যাবৎ বাস করেন—নাম তাঁর ‘দিবাকর মিত্র’। হয়তো তিনি জানতে পারেন—কোন সংবাদ!”

শবরযুবার বাক্য শ্রবণ ক’রে ভাবতে লাগলেন শ্রীহর্ষ,—

“শুনেছিলুম বটে ; আমাদের স্বর্গগত গ্রহবর্ম্মার বালক-বয়সের একটি সুহৃদ্— ত্রয়ী-বিদ্যা, ব্রাহ্মণপদ্ধতি এবং মৈত্রায়ণি-শাখা পরিত্যাগ ক’রে যৌবনে গ্রহণ করেছেন সৌগত-মত এবং কাষায়বস্ত্র। হঠাৎ যদি কোন সুহৃদ্‌কে দেখতে পাওয়া যায়, তাতে প্রাণে আসে একটা আশ্বাস। মানুষের মধ্যে যেখানে গুণ-সম্পদের আবির্ভাব হয়, সেখানে গুণ-গ্রহণের জন্য অনুধাবন করাই স্থির-মস্তিষ্কের কর্ত্তব্য। যাঁর মধ্যে মুনিভাব এসেছে, তাঁর কাছে মাথা নত করতে কিসের বাধা? স্থূল-বুদ্ধিরা যখন ধর্ম্মগৃহিণী লাভ করেন, যখন গ্রহণ করেন প্রব্রজ্যা, তখনও তাঁরা নমস্য ; আর যাঁরা বিদ্বান্, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সৌরভে মনোহরণ করেন বিশ্ববাসীর, তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা—বিচার ও বিবেচনার বাইরে। আজ আমার হৃদয়ের মধ্যে একটি কুতূহল উপস্থিত হয়েছে। সহসা এ রকম দর্শন আমি আশা করি নি। এ রকম লোকের দর্শন পাওয়া যত্ন-সাধ্য।

এই প্রাসঙ্গিক দর্শনের মধ্যে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কল্যাণের অঙ্কুর।"

নেপথ্য-চিন্তার পর হর্ষদেব প্রকাশ্যে বললেন—

"অঙ্গ, সেই পিণ্ডপাতী যেখানে বিহার করছেন, সেই স্থানে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।"

শবরযুবার নির্দশিত পথে মহারাজ অশ্বসেনা সমভিব্যাহারে অগ্রসর হতে লাগলেন। দর্শনেন্দ্রিয়কে ভুলিয়ে দেয় আশ্রম-সন্নিহিত সেই পথটির সুন্দরতা। মাত্র অর্দ্ধক্রোশব্যাপী পথ, কিন্তু তার মধ্যে ফল ও ফুলের কী অনাড়ম্বর মাধুর্য্য !

কর্ণিকার ফুল ফুটেছে, তার গন্ধ নেই, কিন্তু অপূর্ব্ব তার রঙের বাহার !
প্রতি কুড্মল যেন এক-একটি বর্ণের স্তবক।
চম্পকের স্বর্ণবর্ণে ও প্রাচুর্য্যে ঢাকা প'ড়ে গেছে গাছের প্রত্যেকটি পাতা।
ফলভারে স্ফীত, আনত হয়ে পড়েছে নমেরুর পরিণত শাখার সঞ্চয়।
হঠাৎ চোখ ছুটে যায়—গিরিনদীর তীরে, সুগন্ধি নলদগাছের নীলিমায় ;
হঠাৎ চোখ ছুটে যায়—আকাশলীন নারিকেল বৃক্ষের শ্যাম সমারোহে।
অধিত্যকার কটিদেশ বেষ্টন ক'রে প্রাংশুশোভায়, কোথাও দাঁড়িয়ে ছিল কাঞ্চন, কোথাও নাগকেশর, কোথাও হরিচম্পক, আবার কোথাও সরল বৃক্ষের অজস্রতা।
কুরুবক গাছের অঙ্গে আধফোটা কোরকের রোমাঞ্চ।
দশ দিক্ লেপন ক'রে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রক্তাশোকপল্লবের লাবণ্য।

একটি জায়গায় এত ফুলের ফোটন—পূর্ব্বে কখনও চক্ষে পড়ে নি হর্ষদেবের।

উড়ছিল ফুলের কোরক থেকে, কোরকের কিঞ্জল্ক থেকে, বকুল গাছের মুকুল-খসা রেণু—রেণুর রঙে ধূসর হচ্ছিল বাসর।
অসংখ্য তিলক গাছের তলায়, সাগর-বেলায় বালুকার মত বিছিয়ে ছিল রেণুপুঞ্জের আস্তরণ।
বাতাসে দুলছিল হিঙের গাছ, দুলছিল সারি সারি সুপারী গাছের প্রাচুর্য্য, দুলছিল ফুলের সম্ভার নিয়ে পিঙ্গল প্রিয়ঙ্গু।

ভ্রমরের সে কি গুঞ্জরণি! ফুল থেকে ফুলে বেড়ায়, মধু খায়, ফুলের রেণু মেখে তাদের গায়ের নীল রঙ সোনালি হয়ে যায়; আবার পুঞ্জে পুঞ্জে তারা মঞ্জরীতে এসে বসে, চতুর্দ্দিকে উড়তে থাকে মধুপের মঞ্জু শিঞ্জা।

মুচকুন্দ গাছের স্কন্ধকাণ্ডগুলি মেচকিত হয়ে গিয়েছিল হস্তীগণ্ডের কৃষ্ণমদস্রাবে; দেখে মনে হ'ল, অরণ্যের করিযূথ এই আশ্রমে নিঃশঙ্কে আসে, এবং ঐ মুচকুন্দ গাছগুলিতে গাত্র ঘর্ষণ ক'রে আরামে বিরাম দেয় কণ্ডূতির। কৃষ্ণশার মৃগের চঞ্চল ছেলেগুলো কবলে কবলে ছিঁড়ে খাচ্ছিল কচি কচি দূর্ব্বা আর থেকে থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে যেন উড়তে উড়তে পাল্লা দিচ্ছিল বাতাসের গতি-রাগের সঙ্গে।

তমসার মত গাঢ় নীল সে কি নয়ন-ভোলানো তমাল গাছের মালা!

দেবদারু বৃক্ষগুলিতে স্তবকের সে কি দন্তুরিত মহিমা!

ক্ষিতিসিঞ্চন সে কি অপূর্ব্ব মধুমোক্ষ!

গন্ধের সে কি ঘ্রাণতর্পণ।

পুষ্পপরাগের শুভ্রতা ছড়িয়ে সে কি আকাশকে চুম্বন!

ধূলীকদম্বের সে কি সংহতি!

আবার কোথাও দেখতে পেলেন—

সেই আশ্রমের জাম এবং জামীরের বীথিগুলো জালকিত হয়ে রয়েছে তাম্বুলীদের খুঁটি-পোতার বহরে; কুটজ গাছের কোটরে কোটরে কুটি বেঁধে চুপ ক'রে ব'সে আছে কুক্কুটীরা,—তাদের ডানার নীচে ডিম-ফোটা কয়েক দিনের বাচ্চা।

চটকেরা বাচাট চাটকদের এ-গাছ থেকে ও-গাছে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; ভারি মিষ্টি লাগতে লাগল তাদের কিচিরমিচির।

চঞ্চুর (দক্ষ) চকোরেরা চঞ্চুতে ক'রে আহার্য্য এনে খাইয়ে দিচ্ছিল সহচরীদের।

ভুরুণ্ড-পাখিগুলো নির্ভয়ে ভূরিভোজন সারছিল পীলু-গাছের পাকা পাকা হলুদবরণ ফলের ভোগ খেয়ে।

সদাফল আর কট্ফল গাছের কাঁচা কাঁচা ফলগুলোকে কট্কট্ ক'রে কেটে দু টুকরো ক'রে নীচে ফেলে দিচ্ছিল শুকপাখীদের নির্দ্দয় দল।

শৈবাল-ঢাকা পাথরের সুখ-গৃহ থেকে বার বার মুখ বার করতে থাকে আধঘুমন্ত শশকের শিশুরা। শিউলিগাছের জট-পাকানো শিকড়ের মধ্যিখানে গর্ত্ত খুঁড়ে নিশ্চিন্ত আরামে খেলে বেড়ায় ছোট্ট ছোট্ট গিরগিটি।

অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল—

নিরাতঙ্ক রঙ্কুমৃগের খেলা,
নিরাকুল নকুলকুলের কেলি,
কলকোকিলের পুষ্পকলিকার ভক্ষণ।

আমবাগানের তলায় শান্ত আরামে রোমন্থন করছিল চমূরু মৃগের যূথ। এখানে সেখানে সুখে নিষণ্ন রয়েছে নীলাণ্ডজ মৃগের মণ্ডল। গবয়ধেনুরা বাছুরদের দুধ খাওয়াচ্ছে, আর নির্ব্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বৃকেরা।

দিবানিদ্রার আনন্দ উপভোগ করছিল হস্তীযূথ;—গিরিনিতম্বের নির্ঝরিণীর ঝর্ঝর পতনের সঙ্গীত শ্রবণ ক'রে মন্দায়মান হয়ে গিয়েছিল তাদের কর্ণতালের দুন্দুভি।

সমাসন্ন কিন্নরীদের গীতরবের মোহে রস্তমান হয়ে উঠেছিল রুরুমৃগের সঙ্ঘ। আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তরক্ষুরা। হলুদগাছের গোড়া খুঁড়তে খুঁড়তে নতুন নতুন বরাহপোতদের পোত্রবলয়গুলির রঙ হয়ে গিয়েছিল হলদে। গুঞ্জাফলের কুঞ্জে কুঞ্জে বনবিড়ালের সে কি হুল্লোড়! জাতীফল গাছের তলায় গোল ক'রে ঘুমোচ্ছিল শালিজাতকের দল। লালমুখো কতকগুলো কীট কামড়ে দিয়েছিল বাঁদর-বাচ্চাদের; সেই রাগে তারা ভাঙছেই তো ভাঙছে, যেখানে পাচ্ছে—লাল কীটের বাসা। লকুচ-গাছের শাখায় লাম্পট্য থামছে না গোলাঙ্গুলদের, শেষে লাফ দিয়ে উল্লঙ্ঘন করছে লবলীর লতা।

আবার কোথাও দেখতে পেলেন—

আশ্রমের আলবালগুলি বালির বাঁধ দিয়ে বাঁধা হচ্ছে; সলিলপূর্ণ কুটিল কুটাবলী দিয়ে রোধ করা হচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট গিরিনদীর বেগবতী স্রোতঃ। শাখা-প্রশাখার নিবিড়তায় লম্বমান রয়েছে কমণ্ডলুর সহস্রতা। শিকের আকারে সূত্র-জালকের ভিক্ষা-কপালগুলি লতিকামণ্ডপে ঝুলছে—দেখাচ্ছে যেন লতিকার এক-একটি মোহন পর্ণ।

আশ্রমের নিকটেই কুটিরে কুটিরে দৃশ্যমান হ'ল পাটল-মুদ্রা চৈত্যকের মূর্ত্তি এবং সেখানকার জলের রঙ কেমন যেন এক রকম রাঙা—বোধ হয় চীবরাম্বরের রঞ্জনায় কষায় এবং দূষিত হয়ে গিয়েছিল সেই প্রদেশের জল।

আশ্রমের সেই তরুবীথিটিকে শ্রীহর্ষ যেন দর্শন করলেন—নবনেত্রে।

পথটি যেন মেঘময়,—ময়ূরের কলাপিত সজ্জা!

পথটি যেন বেদময়,—শাখাভেদের গহনতায় নিগূঢ় রয়েছে তার অপরিমিত লজ্জা।

পথটি যেন মাণিক্যময়,—ইন্দ্রনীলমণির মহাবিভাস!

পথটি যেন তিমিরময়,—জনতার নায়নিক সর্ব্বনাশ!

সেই তরুবীথিটি যেন ;—

অঞ্জন-পর্ব্বতের পল্লবিত মহিমা, বর্ষাবাসরের প্রতিবেশিকার আঙিনা, বসন্তদিনের এক মরকতশ্যাম ক্রীড়াপর্ব্বত, বনদেবতাদের প্রসাদী প্রাসাদ ;

কৃষ্ণরাত্রির অংশক্ষয়, বিন্ধ্যাচলের অরণ্য-জাত নব তনয়।

এই দৃশ্য দর্শনের পর হর্ষদেবের মনে হ'ল—নিশ্চয় নিকটেই রয়েছেন মহামান্য তপস্বী। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ ক'রে গিরিনদীতে আচমন করলেন শ্রীহর্ষ। অশ্বদের বিশ্রাম-সময় সমাগত—এই বিচারের পর কানন-স্নিগ্ধ একটি শান্ত প্রদেশে সংস্থাপন করলেন অশ্বসেনা। তাঁরপরে অশ্ব-হ্রেষার হর্ষধ্বনির সৌভাগ্য সঞ্চয় ক'রে প্রবেশ করলেন তপস্বি-জনপদে।

হৃদয়ে রইল বিনয় এবং দক্ষিণ হস্তে মাধবগুপ্তের স্কন্ধ। অনুগামী রাজবর্গকে সঙ্গে নিয়ে পদচারণ করতে করতে প্রবেশ করলেন আশ্রমে।

আশ্রমের তরুগহনতার মধ্যে, মণ্ডলে মণ্ডলে সমাসীন ছিল নানাদেশীয়

কোথাও তারা ব'সে ছিল প্রোথিত-প্রস্তরে পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন ক'রে,

কোথাও তারা ব'সে ছিল শিলাসনাথ বেদীতে, পাঠরত।

লতিকা-ভবনের অধিবাসে, গুঞ্জনমুখর গুল্ম-নিকুঞ্জে, ঘনবল্লরীর প্রচ্ছায়ে, তরুমূলের স্নিগ্ধতায়,—উত্থিত হচ্ছিল এক বিপুল বিদ্যাপীঠের শ্রবণসুখকর ধ্বনি।

শ্রুত হচ্ছিল স্ব-স্ব সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তের অভিযোগ, অভিযোগের চিন্তা।
উঠছিল সংশয়-প্রশ্ন, চিহ্নিত প্রশ্ন, তারপরে আসছিল ব্যুৎপত্তি,
বিবদন, তর্ক, মীমাংসার শেষে অভ্যাস এবং সর্ব্বশেষে বিচক্ষণতা।

বীতরাগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল, অর্হৎ, মস্করী, শ্বেতাম্বরী, পাণ্ডুরভিক্ষু, ভাগবতবর্ণী, কেশলুঞ্চন, কাপিল, লোকায়তিক, কানাদ, ঔপনিষদিক, ঐশ্বরকারণিক, ধাতুবাদি, (কারন্ধমি) ধর্ম্মশাস্ত্রী, পুরাণপাঠী, সপ্ততন্ত-জৈমিনেয় পূর্ব্বমীমাংসক, শব্দ-স্ফোটবাদী, পাঞ্চরাত্রিক, এবং আরও অনেক প্রকারের শিক্ষার্থী।

বিনয়-নত কয়েকটি বানর বিধান দিচ্ছিল চৈত্য-কর্ম্মের। পরমোপাসক
শুক-সংহতি অনুধাবন করছিল শাক্যবংশীয় বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের
ত্রি-শরণ পথের অনুশাসন ও নির্দ্দোষ ধর্ম্ম-দেশনা।

আশ্রমের মধুময়ী নির্ঝরিণীর ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষদেবের নয়নে প্রবেশ করল উপদেশনার আলোক।

দিবাকর মিত্রের মধ্যবয়স।

তাঁর চতুর্দ্দিকে বিরাজ করছিল অমাংসাশী শার্দ্দূল ;—তাদের স্বভাব শীতল হয়ে গিয়েছিল—বোধিসত্ত্ব জাতক এবং সৌগত শীলের উপাসনায় ; তাঁর পার্শ্ব-বেশন ক'রে ছিল বৃদ্ধ এবং রাত্র্যন্ধ একটি পেচক ; জিহ্বালতা দ্বারা পাদ-পল্লব লেহন করছিল বন-হরিণেরা।

স্কন্ধে উপবেশন ক'রে নীবারকণিকা গ্রহণ করছিল পারাবতিকেরা,—আহা, সেই পারাবত-কুমারগুলি!

তারা যেন কর্ণের উৎপল, মৈত্রীর প্রিয়সখা!

বাম হস্তের শিখর থেকে বিন্দুজল পান করছিল, মরকতমণির মত, উদ্গ্রীব ময়ূরেরা।

দক্ষিণ হস্তে বিকীর্ণ হচ্ছিল পিপীলিকা-সুখী শ্যামাকতণ্ডুল।

শ্রীহর্ষদেব দেখতে পেলেন—

দিবাকর মিত্রের পরিধানে রয়েছে পাটলবর্ণ কাষায় বস্ত্র ; অনৌদ্ধত্য
অধোমুখে,—মন্দমুকুলিত নায়নিক প্রসন্নতা ; এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষুণ্ণ
জনতার মুখের উপর ঝরছে আমৃতিক বর্ষণ।

প্রথম দর্শনেই তাঁর মনে হ'ল—

তিনি যেন—

সর্ব্বশাস্ত্রের অক্ষরের পরমাণু, শেষবুদ্ধের প্রাক্তন অবলোকিতেশ্বর, তপস্যার অস্খলিত আলাপ, পদার্থ-প্রকাশক সাঙ্খ্যদর্শনের প্রথম আলোক।

দিবাকর মিত্র যেন—

স্বগত বুদ্ধের অভিগমনীয়, ধর্ম্মের আরাধনীয়,
প্রসাদের প্রসাদনীয়, সম্মানের সম্মাননীয়,
বন্দ্যতার বন্দনীয়, এবং আত্মার স্পৃহনীয়।

তিনি যেন—

ধ্যানের ধ্যেয়, জ্ঞানের জ্ঞেয়, জপের জন্ম,
নিয়মের নেমী, তপস্যার তত্ত্ব, শৌচের শরীর,
কুশলের কোশ, বিশ্বাসের গেহ, সদ্বৃত্তির স্নেহ,
দাক্ষিণ্যের দক্ষতা, সুখের নিবৃতি, এবং অনুকম্পার নাম-শেষ।

অতি প্রশান্ত এবং প্রকৃতি-গম্ভীর এই দিবাকর মিত্রকে দর্শন ক'রে—শ্রীহর্ষের চিত্তে সঞ্চালিত হ'ল আশ্রমিক সম্মান।

দূর থেকে দিবাকর মিত্রকে বন্দনা করলেন—মানস, মস্তক এবং বাক্যের সংযোজনায়।

দিবাকর মিত্রের কিন্তু প্রকৃতি ছিল মৈত্রীময়। তিনি দর্শন করলেন—অদৃষ্টপূর্ব্ব এক মানবকে—শ্রীহর্ষকে।

আহ্লাদিত হয়ে উঠল তাঁর চিত্ত, প্রশ্রয়ী আভিজাত্যের সৌজন্যে। মনের মধ্যে কে যেন ব'লে উঠল—

"এই ভূপতির মধ্যে বিরাজ করছে মহানুভবতা এবং লোকোত্তর পুষ্টি।"

বীরস্বভাব হ'লেও তিনি বাধ্য হলেন—সসম্ভ্রম-গাত্রোত্থানে।

চীবরের বিলোল পটান্ত বামস্কন্ধ থেকে উৎসারিত ক'রে, মহাপুরুষের লক্ষণ-লেখা প্রশস্ত হস্তখানি বাড়িয়ে দিলেন শ্রীহর্ষদেবের উদ্দেশে; অভয়দানের যেন দীক্ষা-দাক্ষিণ্য।

তারপরে এল তাঁর বাণী—

রোগশান্তির পরিশেষে আরামদায়িনী মাধুরী-স্নিগ্ধ যেন বাণী।

তিনি শ্রীহর্ষকে অভিনন্দন করলেন। আহ্বান এবং নিমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন—

"আমার আসনে আপনি বসুন।"

এবং পার্শ্বস্থিত শিষ্যকে আদেশ দিলেন—

"আয়ুষ্মন্, কমণ্ডলু পূর্ণ ক'রে নিয়ে এস পাদোদক।"

বিনয় দর্শনের শালীনতায় শ্রীহর্ষের চিত্তে জাগল শুভ্রা এক স্বগত চিন্তা—

"যাঁরা অভিজাত তাঁদের সৌজন্যের ধারাই পৃথক্। তাঁদের সৌজন্যই বিশ্বকে বন্ধন করে, অ-লৌহ শৃঙ্খল দিয়ে। যথাস্থানেই নিবেশিত হয়েছিল গ্রহবর্ম্মার অনুরাগ।"

প্রকাশ্যে বললেন—

"আপনার দর্শন আমার কাছে নিয়ে এসেছে পুণ্যের অনুগ্রহ। পুনরুক্তি ব'লে মনে হচ্ছে—পুনর্ব্বার এই অনুগ্রহবিতরণ। চক্ষুই সেখানে প্রমাণ। অমৃতোপম সম্ভাষণ, আসনদান এবং আপনার শ্রদ্ধিত স্নেহ প্রক্ষালিত ক'রে দিয়েছে আমার হৃদয়ের প্রাদেশিক বৃত্তিকে। পাদ্য-গ্রহণ অসার্থক। যথা-সুখে আপনি আসন গ্রহণ করুন। আমি আসন গ্রহণ করেছি।"

এই ভাষণের পরেই মৃত্তিকাসন গ্রহণ করলেন শ্রীহর্ষ।

দিবাকর মিত্র বললেন—

"যাঁরা প্রভাবশালী, তাঁদের প্রশ্রয়ের স্নেহই—অলঙ্কার। এইটিই পরম কথা। রত্নাদি তো শিলাভার।"

এই আলাপের পর বারংবার আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন—ভদন্ত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উত্তর না পেয়ে গ্রহণ করলেন নিজের আসন। ভূপতির মুখপদ্মের উপর কিছুকাল নিলীন রইল তাঁর নিভৃত নয়ন। ধীরে ধীরে শ্রদ্ধার শিকল পরল হৃদয়। মন থেকে যেন ময়লার মত ধুয়ে ঝ'রে গেল, লুপ্ত হয়ে গেল কলিকাল-জন্মা কলুষতা। ফলমূলাশী দন্তপংক্তিতে ফুটে উঠল হাস্যের কুসুম। তারপরে বললেন—

"আজ হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে—এই সংসারের, সৎ-সার প্রকাশিত হয়ে পড়েছে; সেটি যে শুধু অনিন্দ্য তা নয়;—সেটি বন্দনীয়। জীবনে মানুষকে

কত রকমেরই না অদ্ভুত বিস্ময়কর পদার্থ দেখতে হয়! আজ যেমন আমার নয়ন দেখছে—এক অচিন্তিতপূর্ব্ব রূপের সৌন্দর্য্যের পরা-নিদর্শন। আমার মনে হচ্ছে, আমার জন্মান্তরের সুকৃতিগুলি হৃদয়োৎসবের মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তপস্যার ক্লেশের মধ্য দিয়ে এই জন্ম অতিবাহিত করছি, তার মধ্যে আপনার মত দেবানাং প্রিয়ঃ মানবের দুর্লভ দর্শন, কিছু যেন দর্শিয়ে দিয়ে গেল সুখের ফল। এ যেন চক্ষুর তৃপ্তি-শোধ অমৃত-পান। নিবৃত্তি-সুখ বিষয়ে আজ যেন নিরুৎকণ্ঠ হ'ল আমার মন।

আমার অনুমান—সুদিবসে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং আপনার জননী সুজাতা। আয়ুষ্মানের মত সমগ্র জীবলোকের জনককে যিনি জন্মদান করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি সুজাতা। সেই সংসার নিশ্চয়ই পুণ্যশীল, যেখানে আপনি হচ্ছেন তার পরিণাম।

মনের মধ্যে বাসনা না থাকলেও, আমি আজ যেন দর্শন করলুম কুসুমায়ুধকে। কৃতার্থ হ'ল বনদেবতাদের চক্ষু; সফল হ'ল কানন পাদপদের জন্ম। আপনি তাদের সুগোচর হয়েছেন। যিনি অমৃতময়, তাঁর বাক্যভঙ্গিও যে মাধুর্য্যময় হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আপনার বয়স বলতে গেলে—শৈশব। আমি অনুধ্যান ক'রেও স্থির করতে পারছি না, কে ছিল আপনার বিনয়ের উপাধ্যায়! ধন্য সেই ভূভৃৎ—যাঁর বংশে মুক্তাময় মণির মত আপনি নিয়েছেন জন্ম।

বহু ক্লেশে আজ আপনি এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাকে নিয়ে আমি যে কী করব সেই ভাবনায় পরিপ্লাবিত হয়ে যাচ্ছে আমার চিত্ত।

এই গিরি, এই নদী, এই কন্দ, এই ফল, এই মূল—এই কাননের সমস্তই আমার একার নয়; বনচর-সার্থের মধ্যে সব কিছুই সাধারণ। কী আপনাকে উপহার দেব? আমার—বলতে আছে মাত্র এই পাপ শরীরটা; তাও কারোর উপকারে লাগাতে পারলুম না। হ্যাঁ, আর একটি জিনিস আমার স্বায়ত্তে রয়েছে—কয়েক বিন্দু বিদ্যা! যদি তার কিছু আপনার উপকারে লাগে, তাও গ্রহণ করলে সুখী হব। যদি আপনার দৈহিক কষ্ট না হয়, যদি ব্যবহার-ভীতি না থাকে অরক্ষণীয় অক্ষরের, তা হ'লে আশা করি আমি শুনতে পাব আপনার মুখের সহৃদয় বাণী। বিন্ধ্যবন ভ্রমণযোগ্য স্থান নয়; কেনই বা, কোন্ কার্য্য-ব্যপদেশেই বা এখানে আপনার শুভাগমন? কতদিনই বা এই শূন্য কান্তারে বিচরণ ক'রে সহ্য করবেন পর্য্যটন-ক্লেশ? কেন বৃথা সন্তাপিত করছেন দেহের মাধুর্য্য?"

সাদরতর ভাষায় উত্তর দিলেন শ্রীহর্ষ—

"আর্য্য, সম্ভ্রমের পরাকাষ্ঠার দর্শন লাভ করিয়ে এবং আপনার মধুরস-প্লাবিনী বাণীধারায় স্নান করিয়ে অনুষ্ঠান করেছেন সর্ব্বত্রুটির পথরোধ। আপনার নিকট থেকে সামান্য মান্য পাওয়াও আমার পক্ষে বহুমান—আমি ধন্য। আপনি এখন শ্রবণ করুন, কেন আমি এই মহাবনে ভ্রমণ-ক্লেশ বহন করতে এসেছি, এই আশ্রমে এসেছি তাও স-সৈন্যে। মদীয় ইষ্টবন্ধুজন বিনষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র জীবিতা রয়েছে অনুজা ভগিনী—আমার জীবনানুবন্ধের নিবন্ধন। তাঁরও স্বামী মৃত। শত্রুভয়ে তিনিও শুনতে পেলুম পলায়ন ক'রে বিন্ধ্যবনে প্রবেশ করেছেন। তার পরে শুনলুম—

এই বিন্ধ্যবন—

অশুভ শবরদের একটি প্রাসাদবিশেষ,
কানন দলন ক'রে এখানে বিচরণ করে গজরাজির অগণ্যতা,
অপরিমিত সিংহ এবং শরভের রয়েছে ভীতি,
বৃহৎ বৃহৎ বন্য মহিষ বাধা সৃষ্টি করে পথিকদের পথচলার,
অভাব নেই শর কুশ এবং শত শত অবটের।

সেই ভগিনীর অন্বেষণেই আমি এখানে এসেছি ; দিবারাত্র চলবে এই অনুসন্ধান। তাঁকে পেতেই হবে আমাকে। তাঁর খবর কি আপনি কিছু শুনেছেন, কোথাও, কোনো দিন ?"

শ্রীহর্ষের প্রশ্নে বর্দ্ধিত হ'ল ভদন্তের উদ্বেগ।

তিনি বললেন—

"এ রকমের সংবাদ প্রায়ই আমাদের কানে এসে পৌঁছয় না। এ বিষয়ে যে কিছু সুখের খবর আপনাকে দেব, তাও আমাদের কপালে নেই।"

দিবাকর মিত্রের কথার মধ্যপথেই উদ্বেগ সৃষ্টি ক'রে অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হ'ল প্রক্ষরিত-চক্ষু এক ভিক্ষু। তার বয়স ঢ'লে পড়েছে শান্ত পশ্চিমে। সম্ভ্রান্ত আকৃতি, বদ্ধাঞ্জলিতে কারুণ্যের ছায়া।

কোথা থেকে যে সে এসেছে, সে কথা বিজ্ঞাপন না ক'রে, সে বললে—

"ভগবন্ ভদন্ত, নিদারুণ করুণ একটি ব্যাপার ঘটেছে। একটি মহিলা শোকে বিবশা হয়ে প্রবেশ করছেন অগ্নিতে। তাঁকে দেখলে মনে হয়—তিনি

যেন বালা ; কোন প্রচণ্ড ব্যথায় অভিভূতা হয়ে এই দুষ্কার্য্য করতে চলেছেন। বোধ হয় একদিন রূপ-বৈশিষ্ট্য ছিল এই কল্যাণীর। আপনি ভগবান, তাঁর প্রাণহানির পূর্ব্বে আপনার কাছে আমার মিনতি—তাঁকে রক্ষা করুন, সান্ত্বনার বাণী দিয়ে। আশ্বাসের সৌন্দর্য্য হয়তো তাঁর মনকে ফিরিয়ে আনতে পারে সুস্থির শালীনতায়। আপনার দয়ার শরীর, কৃমিকীটের ব্যথাও আপনাকে বেঁধে।”

শ্রীহর্ষের মনের মধ্যে অকস্মাৎ সঞ্জাত হ'ল শঙ্কা। স্নেহ যেন জাগ্রত ক'রে দিল সহোদরার বিপত্তির চিন্তা। দুঃখের দলন-শক্তি হৃদয়কে পিষে দিয়ে যায়। কণ্ঠগ্রহ গদ্‌গদ্‌বাণীতে, বাষ্পায়মান দৃষ্টির বিকলতার মধ্য দিয়ে, তিনি প্রশ্ন ক'রে উঠলেন—

“পারাশরী, কত দূরে রয়েছে তোমার-দেখা সেই-জাতীয়া মহিলা? তিনি কি এখনও জীবিতা আছেন? তুমি কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলে—কে তুমি, কার তুমি, কোথাকার তুমি, এই বনের মধ্যে কেনই বা তুমি এসেছ, কেনই বা তোমার এই অগ্নিপ্রবেশ? পারাশরী, অতি সংক্ষেপে তোমার কাছে এর উত্তরগুলি আমি শুনতে চাই। আচ্ছা, কেমন ক'রেই বা সেই মহিলাটি চোখে পড়ল তোমার? তাঁকে দেখতেই বা কেমন? কেমন তাঁর চেহারা?”

ভিক্ষু তখন নিজের ভাষায় তার চোখের দেখাটি নিবেদন করল—

“মহাভাগ শুনুন—

আমি আজ প্রত্যূষে শ্রীভগবানকে বন্দনা ক'রে গিরিনদীর তীরে তীরে শীতল বালুকার উপর দিয়ে পদচারণ করতে করতে অনেক দূর চ'লে গিয়েছিলুম। তার পরেই গিরিনদীর নিকটেই চোখে পড়ল একটি গহন বন্যলতার কুঞ্জ। অঘ্রাণের পদ্মবনে শিশিরের আঘাত-লাগা ভ্রমরীদের গুঞ্জনের মত কী যেন একটা সুর প্রথমে ভেসে এল আমার কানে। তারপরে মনে হ'ল—বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন মূর্চ্ছনার মত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে কারুণ্যের এক ঝঙ্কার। ধৈর্য্যের বাধ্যকতায় শেষে স্পষ্টই দেখতে পেলুম সেই ঝঙ্কারটি অন্য কিছুই নয়—নারীদের একতান রোদন। দয়া হ'ল। পৌঁছে গেলুম সেই বন্যলতার নিকুঞ্জে।

সেখানে দেখতে পেলুম—অবলাদের একটি চক্রবাল। অকথ্য তাদের দুর্দ্দশা।

পাথরে হোঁচট খেয়ে কারোর আঙুল ভেঙে গেছে, গ'লে পড়ছে টকটকে লাল ধারা;

কারোর গোড়ালিতে শর ফুটে গিয়েছিল, ব্যথায় ছটফট করছে, সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে চক্ষু;

কারোর নূপুর-পরা চরণ আর চলতে চায় না, পথশ্রমে দেখা দিয়েছে শোথ।

কারোর পায়ের গোছে দেখা দিয়েছে স্থাণুব্রণ, তার উপর বাঁধা রয়েছে ভূর্জগাছের বাকল;

কারোর জঙ্ঘা ফুলে উঠেছে, বাতশোণিতে, খোঁড়াচ্ছে; দেখা দিয়েছে জ্বর;

কারোর পায়ের গুলে চাকায়, বিঁধে গেছে ধূলোর উষ্ণকণিকা, জানুটি জর্জ্জরিত হয়ে গেছে খর্জ্জুর-জুটের জটায়।

শাতাবরী এবং বিদারী গাছের মহিমায় সকলেরই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে দুকূল-বসন। উৎকট বংশবিটপের কণ্টকে কার যে কঞ্চুক ও কর্পট উৎপাটিত হয় নি সেইটিই ভাবনার বিষয়! ডুমুর গাছের ফল ছিঁড়তে গিয়ে সুকুমার হাতের তলাগুলি হয়েছে রক্তাক্ত। কুরঙ্গের শৃঙ্গ দিয়ে কন্দমূল তুলতে গিয়ে ব্যথায় ভেরে পড়েছে হাতের গোছ।

তাম্বূলের স্বাদ মেটাতে হচ্ছে আমলকীর আহারে। কণ্টকিলতায় ছিঁড়ে গেছে অলকের লেশ। কারোর মাথায় পাতার ছাতা, কারোর হাতে কলাপাতার পাখা। কুশ আর কাশের ফুল লেগে কারোর চোখ লাল, ফুলুনিতে মনঃশিলা ঘষছে। কারোর হাতে পদ্মপাতা, ঠুঙ্গি বেঁধে জল খাচ্ছে। মৃণালের আঁটি হয়েছে কারো পাথেয়। অমন যে চীনাংশুকের অঞ্চল—কেউ বা তাতেই বেঁধে নিয়ে চলেছে, হায় রে, নারিকেল-কোশের কলসী,—মধ্যে আমের তেল। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে শোকবিহ্বল কয়েকজন অবশিষ্ট কলামুখ, কুব্জ, বামন, বধির এবং বর্ব্বর।

অন্তর্হিত হয়েছিল সেই নারীচক্রবালের কুলক্রমাগত প্রভালেপী লাবণ্য। তথাপি, সেই আসন্ন বনলতিকার পত্রগুচ্ছের অন্তরালে,—

—পায়ে তাঁর কঠোর দর্ভাঙ্কুরের ক্ষতজধারা,—

—পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরী উন্নাল পদ্মপত্রের ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে
তাঁর বিচ্ছায় মুখ—

আমি দেখতে পেলুম একটি রমণীলক্ষ্মীকে।
কিন্তু দেখলে হবে কি!

নিশ্চেতনায় তিনি যেন মৃণ্ময়ী,
নিঃশ্বাস-সম্পদে— মরুণ্ময়ী,
সন্তাপের বিস্তারে—পাবকময়ী,
অশ্রুর প্রস্রবণে —সলিলময়ী,
অবলম্বন-হীনতায়—বিয়ন্ময়ী,
শূন্যতায় —আকাশময়ী,
বেদনার হিল্লোলে —বিদ্যুন্ময়ী,

এবং ব্যাকুল ব্যথার বাণীবাহুল্যে তিনি যেন শব্দময়ী।

ভগবন্, তাঁকে দেখে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল—বিস্ময়, কৌতুক এবং আশ্চর্য্যতার অবতারণায়।

এ কি, —অকস্মাৎ মহাকাননে উড়ে এসে পড়েছে কল্পলতার একখানি
হেমাঙ্গিনী পল্লবিকা?

এ কি, —নবলোক অন্বেষণ করছে ভোরের চাঁদের আভা?

এ কি, —মন্দাকিনীর ম্লানায়মানা মৃণালিনী?

এ কি, —দুঃখিনী কুমুদিনীর দিবা-স্বপ্নের জ্বালা?

দেখলুম—বন্যপুষ্পের ধূলোতে মলিন তাঁর চরণ; আয়ত নয়নে
ক্লান্তবর্ষণ মেঘের শুভ্রতা।

প্রত্যূষের প্রদীপ-শিখাটি যেন পোড়া পলতের কলঙ্ক নিয়ে ধীরে ধীরে কাঁদছে;
যেন প্রবেশ করেছেন বনের গহনতায় এবং ধ্যানে;

আসন গ্রহণ করেছেন তরুমূলে কিংবা মরণে;

বিতাড়িত হয়েছেন স্বামীর সৌভাগ্য এবং সুখ থেকে।

হাতের বালার সঙ্গে সঙ্গে মনোরথটিও যেন তাঁর ভাঙা; নতনেত্রে মুখখানি যেন হৃদয়ের মধ্যে খুঁজছে প্রিয়কে, পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে শরীর।

তাঁকে দগ্ধাচ্ছে—প্রচণ্ড রৌদ্র এবং বৈধব্য; নষ্টনীড়ের সঙ্গে সঙ্গে
বিলাসও হয়েছে নষ্ট; মৌনপাণি ধ'রে রয়েছে মৌন একখানি মুখ।
এবং তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে আছে বৃন্ধারা এবং অশ্রুধারা।

অথচ সেই মহিলাটি যেন—

অনবস্থিতদের অবস্থান,
অধীনদের অধীরদের অবসন্নদের আবাস,
কল্যাণের জননী।

আমার মন যেন চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—

'বিচিত্র! এমন নারীকেও দুঃখের দুর্দ্দশা এসে স্পর্শ করতে সাহস করে!' আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলুম। সেই-হেন অবস্থাতেও তিনি বহুমান দেখিয়ে আমাকে করলেন প্রণাম। প্রবল করুণায় অভিভূত হয়ে পড়লুম। এই মহানুভবাকে কী আমন্ত্রণ জানাব, কী ব'লেই বা আরম্ভ করব আলাপ?

যদি বলি—'বৎসে' —তিনি ভাববেন অতিপ্রণয়,
যদি বলি—'মাতঃ' —তিনি ভাববেন চাটুবাদ,
যদি বলি—'ভগিনি' —অসম্ভব,
যদি বলি—'দেবি' —চাকরেরা এমন কথা কয়,
যদি বলি—'রাজপুত্রি' —পরিচয়ের পরিচ্ছন্নতা তো ওঁর নেই,
যদি বলি—'উপাসিকে' —তিনি ভাববেন, নিজের মনের কথাই বলছে,
যদি বলি—'স্বামিনি' —চাকুরি নিতে এসেছে,
যদি বলি—'আয়ুষ্মতি' —অবস্থার বিপর্য্যয়-ভাষণ,
যদি বলি—'ভদ্রে' —ইতর স্ত্রীদের সেটি আখ্যা,
যদি বলি—'কল্যাণি, —দশার বিরুদ্ধ বাণী,
যদি বলি—'চন্দ্রমুখি' —কই, মুনিরা তো এমন কথা বলে না,
যদি বলি—'বালে' —ইনি গৌরব দিতে জানেন না,
যদি বলি—'আর্য্যে' —তবে আমি কি বৃদ্ধা,
যদি বলি—'পুণ্যবতি' —বৈকল্য দর্শনের বুদ্ধিও এঁর নেই,
যদি বলি—'ভবতি' —এ কথা সাধারণ্যে বলে।

আর—

যদি বলি 'আপনি কে'—সে প্রশ্ন কি নিয়ে আসে না আভিজাত্যের অগৌরব?

যদি বলি 'কেন আপনি কাঁদছেন?'—তখন কি ভাববেন না,—এই লোকটি স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে বেদনার কারণ?

যদি বলি 'কাঁদবেন না'—তাতে কি প্রকাশ পাবে না শোকের প্রতি একটি ক্রূর বৈরাগ্য দেখানো ?

যদি বলি 'আশ্বস্ত হন'—তিনি তখন যদি জিজ্ঞাসা করেন, কিসের আশ্রয়ে আশ্বস্ত হব ? নিরুত্তর।

যদি বলি 'স্বাগত'—জীর্ণ সংলাপের নামান্তর।

আর যদি বলি 'সুখে আছেন তো ?'—সেটি হবে প্রতিপন্ন মিথ্যা।

আমি যখন কী করব, কী বলব, আকাশ-পাতাল ভাবছি, তখন স্ত্রী-সঙ্ঘের মধ্য থেকে জনৈক মহিলা আমার নিকটে উঠে এলেন। শিরে তাঁর শুভ্রতার স্নেহ, কিন্তু শোকে দুর্ব্বল তাঁর দেহ। অশ্রুমোচন ক'রে কৃপণ অক্ষরে বললেন,—

'ভগবন্, আমরা দেখতে পাই, যাঁরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন তাঁদের চিত্ত নিত্য আবৃত থাকে, নিখিল সাত্ত্বিক অনুকম্পায়। দুঃখ দেখলেই ক্ষপণ-দীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন না সৌগতেরা। ভগবান্ শাক্যমুনির শাসন—করুণার কুলগৃহ অক্ষয়-আবাস।

যাঁরা জৈনী—তাঁদের মধ্যে দেখা যায় সজ্জনতা,
বিশ্ববাসীর উপকার এবং হিতের যেন সজ্জা।
মুনিদের ধর্ম্ম—পরলোক-সাধনের প্রবৃত্তি।

কিন্তু আমি জেনেছি—একটি প্রাণকে রক্ষা করার অপেক্ষা পুণ্যকর্ম্ম জগতে আর নেই। সে বিষয়ে সকলেই একমত। আপনার বিচারের অপেক্ষায় এই কথা কয়টি আপনাকে নিবেদন করলুম। সাধুরাই আর্ত্তবাণীর সিদ্ধ ক্ষেত্র।

যারা যুবতী, তারা অনুকম্পার পাত্রী। আমার স্বামিনী বিপদে আর্ত্তা। আপনার মঙ্গলময়ী সাধুদৃষ্টি তাঁর প্রতি সন্নত করুন। যাতে ইনি—মাতার মরণে, পিতার অভাবে, স্বামীর বিয়োগে, ভ্রাতার ভ্রংশনে, অবশিষ্ট অতিশিষ্ট বান্ধববর্গের অতি-মৃদুতায়, অনপত্যতা-বিধায়, শত্রুকৃত পরাজয়ের বেদনায়, এবং বিশেষ ক'রে অবলম্বনহীনতায়—অগ্নি-প্রবেশ না করেন। এঁকে বিধান দিন, এঁর পরিত্রাণ করুন।

ইনি প্রকৃতি-মনস্বিনী। অটবী পর্য্যটনের ক্লেশে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সুকুমার দেহ। এঁর অশান্ত দুঃখ স্বপ্নতেও অবজ্ঞা করে গুরুজনদের আজ্ঞা, ভৃত্যদের অনুরোধ। আশা করি আর্য্য এঁর কাছে বিতরণ করবেন শোক-শান্তি-নিপুণ উপদেশের বাণী।'

ভগবন্, আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। মহিলাটিকে বললুম—

'আর্য্যে, আমার কর্ত্তব্য আমি প্রণিধান করেছি। ব্যর্থ হবে না আপনার অভ্যর্থনা। নিকটেই গুরুদেব রয়েছেন। ভগবান্ সুগতের তিনি রূপান্তর। পরমদয়ালু। আমার এই বৃত্তান্ত নিবেদিত হ'লেই নিশ্চয় তিনি তৎক্ষণাৎ এখানে এসে উপস্থিত হবেন। ভগবান্ বুদ্ধের দুঃখান্ধকার ভেদী সুভাষণের সাহায্যে নিশ্চয় তিনি এই কুশলশীলাকে আরাম দান করবেন। তার পরে তাঁর মুখে আপনারা শুনবেন এবং দেখতে পাবেন যথাক্রমে নানান দর্শন, নানান আগমের কৌশলী বাণী এবং প্রবোধ-পদবী।'

আমার কথা শুনে পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন সেই বর্ষীয়সী। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন 'এখনি যান, তাঁকে নিয়ে আসুন।'

ভগবন্, এই আমার বিবৃতি। বহু দুঃখ ত্রায়িত হবে, বহু মৃত্যু স্থগিত হবে, কৃপণ এবং অশরণ শরণ-লাভ করবে এবং বিন্ধ্যবনে বিতীর্ণ হবে আমার গুরুদেবের প্রসাদ।"

ভিক্ষুর ভাষণ শ্রবণ করলেন শ্রীহর্ষ। ভগিনীর অশ্রুত নাম যেন মিশ্রিত হ'ল অশ্রুর সাহিত্যে। কিসের যেন আকুতিতে ভ'রে উঠল মন। তারপরে জাগল ক্রোধের প্রচণ্ডতা। সমস্ত-বিসংবাদ, সমস্ত-কিন্তু দূরীভূত হয়ে গেল, ভিক্ষুর বাক্যমাধুর্য্যে এবং সংশয়-সন্দেহের অপসারণে।

শ্রীহর্ষ বললেন—"শ্রমণাচার্য্য, ভগ্নীর মন্দভাগ্য আমার হৃদয়কে পাষাণ-কঠিন ক'রে দিয়েছে। কোথা হ'তে আসে শত্রুতা, কোথা হ'তেই বা আসে বৈরীভাব! হৃদয়ের সমস্ত নিবেদন দিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি,—" এই ব'লে সেই শ্রমণকে বললেন,—

"আর্য্য, উত্তিষ্ঠ। আমাকে দেখতে দিন, কোথায় সে রয়েছে। প্রাণী-পরিত্রাণের পুণ্যার্জ্জন আপনার কর্ত্তব্য। আমরা যাব। জানি না, এতক্ষণ সে বেঁচে আছে কি না!"

গাত্রোত্থান করলেন শ্রীহর্ষ।

আচার্য্য দিবাকর মিত্র তখন আশ্রম থেকে সশিষ্যমণ্ডল করলেন প্রস্থান। সমস্ত সামন্তচক্র তুরঙ্গ-পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ ক'রে পদচারী শ্রীহর্ষের করল

অনুগমন, সকলকে পথ দেখাতে লাগল শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু। তারা সকলে চলতে লাগল—অবিরল পদক্রমায় পথটিকে যেন পান ক'রে নিয়ে। ক্রমশঃ প্রবেশ করল লতানিকুঞ্জের সান্নিধ্যে। কর্ণগোচর হ'ল আর্ত্ত রোদনের ধ্বনি। সেই বিলাপের মধ্যে ভেসে আসছে নানান প্রকারের প্রলাপ-মাধ্যম বাণী।

"ধর্ম্মরাজ, তুমি এস, দেরি ক'রো না। কুলদেবতে, তুমি কোথায়? হে ধরণি, তুমি কি গ্রহণ করবে না তোমার কন্যাকে?"

"আজ কোথায় কোন্ অন্তরালে অন্তর্হিত হলেন পুষ্পভূতির কুটুম্বিনী লক্ষ্মী! হে নাথ, মুখর-বংশীয়া এই বধূকে, এই বিধবাকে, এই অনাথাকে কেন বিবোধন করছ না? রাজধর্ম্ম, তুমি কি কেবলই পুষ্পভূতির গৃহপক্ষপাতী? আমাদের প্রতিই উদাসীন?"

"যখন তোমার ভক্তেরা দুঃখে দীর্ণ হচ্ছে, হে ভগবান্ সুগত, তখন তুমি কোথায়?"

"ওগো বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার বিপদের বন্ধু, আমার বদ্ধাঞ্জলি প্রণাম নাও। হে মহাকানন, আমার এত ক্রন্দন কি তোমার কানে পৌঁছল না? হে পতঙ্গ-সূর্য্য, প্রসন্ন হও, পরিত্রাণ কর পতিব্রতাকে।"

"চারিত্রচণ্ডাল, তোকে এতদিন সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছি, আর আজ কৃতঘ্ন, রক্ষা করতে পারছিস না রাজপুত্রীকে! এই কি লক্ষণ ছিল অঙ্গে?"

"দুহিতৃ-স্নেহময়ী মা আমার যশোবতী, তোমার সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হয়ে গেল;—দৈব আজ দস্যু। মহারাজ, শিথিল হ'ল কি তোমার অপত্য-প্রেম? মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন, কোথায় গেল তোমার ভগ্নী-প্রীতি?"

"প্রেত হওয়ার নির্লজ্জতা বুঝবে কে? ওরে আগুন, তুই স্ত্রীলোককেও পোড়াতে চাস? তোর কি লজ্জা নেই?"

এই প্রকার বিলাপের মধ্যেও শ্রীহর্ষ, দিবাকর মিত্র এবং তাঁদের অনুচরেরা শুনতে পেলেন আর এক ব্যঞ্জনায় বিলাপ।

"হে বায়ু, তুমি আমার ভাই; আমি তোমার দাসী; এই দেবী-দাহ-সংবাদ ঝড়ের বেগে তুমি নিয়ে যাও শ্রীহর্ষের কাছে।

ওরে দুঃখ,—তুই চণ্ডাল; তোর নিতান্ত নিষ্ঠুরতার, তোর কামনার কি অন্ত নেই? মৃত্যু-রাক্ষস, আজ তুই তুষ্ট হবি।

এই নির্জ্জন বনে আমি কাকে ডাকব, কে আমার কান্না শুনবে, কার কাছে শরণার্থিনী হতে যাব?

কোথায় আমার দিশা?"

তার পরে সকলে দেবী রাজ্যশ্রীর মুখে শুনতে পেলেন—সখীদের উপর তাঁর ভৎর্সনা। তারা সকলেই মরতে চায়।

"গান্ধারী, লতার ফাঁসটা কি নিজের গলার জন্য তৈরি করছিস?

মোচনিকে, দুটো শাখা নিয়ে ঝগড়া করিস না, পিশাচীরাই করে।

কলহংসি, মাথা চাপড়িও না, দুঃখের তো শেষ হয়ে আসছে।

মঙ্গলিকে, গলা ছেড়ে এত কাঁদিস কেন?

সুন্দরি, এবার তো সখীদের সুদূর যাত্রা।

শবরিকে, শব-শিবিরে থাকিস নি, চ'লে যা।

বিরাজিকে, রাজপুত্রী যতদিন বাঁচবে, ততদিন কি তোর চলবে জীবন-ব্যয়ের ব্যবসা?

ওরে আমার মৃণাল-কোমল মালাবতি, তুইও কি ম্লান হয়ে যাবি?"

আরও শুনতে পেলেন শ্রীহর্ষ। রাজ্যশ্রী বলছেন—

"ভৃঙ্গার-ধারিণি, তুই সুখী, তুই ধন্য, ভৃগুপতন কাকে বলে তুই জানিস না। কেতকি, এমন মনিব আর পাবি নি। ওরে মেনকা, ও বিজয়া, ও সানুমতি,—আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, বাতাস কর্; তোদের ছোট্ট নীলপদ্মিনী এবার বিদায় নেবে। ও কামদাসি, বিচরিকে, কিরাতিকে, কুররিকে, ফুল নিয়ে আয়, কুরুবকের কোরক দিয়ে চিতা সাজা। নর্মদে, চরম তোর চামর আন্। শেষ বাতাসটি কর্।"

বিদায় হ'ল গ্রামেয়িকা,—সঙ্গে তার সুগতির প্রার্থনা; অন্তরালে গেল বসন্তিকা; কেঁদে উঠল নাটক-সূত্রধারিণী মুক্তিকা; পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল তাম্বূল-বাহিনী অভিমানিনী পত্রলতা।

"কলিঙ্গসেনে, শেষ আলিঙ্গন প্রাণ ভ'রে দে।

নকে, সব দোষ ভুলে যাস, মার্জ্জনা করিস।"

যশোধনা, মাধবিকা, বৎসিকা, কালিন্দী, মত্তপালিকা, চকোরবতী, কমলিনী,—আর্য্যা মহত্তরিকা তরঙ্গসেনা, সখী সৌদামিনী, কুমুদিকা, বামনিকা, রোহিণী, লবলিকা, মাতঙ্গিকা, নাগরিকা, সকলেই—অনুনয়ের, মিনতির ও প্রণতির অন্ত রাখল না। কিন্তু কিছুই কর্ণে নিলেন না দেবী রাজ্যশ্রী।

শেষ বিদায়, শেষ প্রণাম, শেষ উত্তর—

"চিতারোহণে আসে এক উল্লোল আগুনের মত আনন্দ।"

দশান্ত দেখে নিকুঞ্জদ্বার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শ্রীহর্ষ যখন হস্ত গ্রহণ করলেন রাজ্যশ্রীর, তখন মূর্চ্ছায় আমীলিত হয়ে গেছে রাজ্যশ্রীর নয়ন।

প্রিয় ভ্রাতার হস্তের সংস্পর্শ—! প্রকোষ্ঠবদ্ধ ওষধির রস-বিস্তারের মত প্রত্যুজ্জীবনের দাক্ষিণ্য নিয়ে কার্য্যকরী হ'ল রাজ্যশ্রীর শরীরের উপরে।

ভালবাসা যেন ব'লে গেল—"অমৃত ঝরে শ্রীহর্ষের নখে।

এ স্পর্শ যেন—চাঁদ-ঝরা শিশিরের কণা।"

সহসা—নয়ন উন্মীলন করলেন রাজ্যশ্রী।

কোথা হ'তে এল এই অসম্ভাবিত স্পর্শের উপহার!

তিনি কি স্বপ্নে দেখছেন তাঁর ভ্রাতাকে?

কণ্ঠাশ্লেষী হ'ল বলয়িত হস্তের স্নিগ্ধতা, এবং সমগ্র আত্মার নির্ভরতা। দুঃখনির্ঝরিণীর মত প্রবাহিত হ'ল অশ্রু।

"কোথায় গেলেন পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় গেল আমার সর্ব্বস্ব"—উঠতে লাগল রোদন-মিশ্র অশ্রান্ত বিলাপ।

শ্রীহর্ষ বললেন—"বোন্, তুমি স্থির হও।"

আচার্য্য বললেন—"কল্যাণি, অগ্রজ তোমার গুরু, তাঁর কথা মানো।"

রাজলোকেরা বললেন—"দেবি, মহারাজের অবস্থাটাও একবার ভেবে দেখুন, আপনি শান্ত হোন।"

পরিজনেরা চরণলগ্ন হয়ে বললে, "মা, যা হয়ে গেছে তার জন্যে আয়ুক্ষয় করা বৃথা।"

বান্ধব বৃদ্ধাদের, সখীদের সমস্ত অনুনয় বিফলে গেল।

থামতে চায় না ক্রন্দনের কাহল-ঝঙ্কার।

শেষে শ্রীহর্ষ বহ্নির সামীপ্য থেকে রাজ্যশ্রীকে সরিয়ে এনে বসিয়ে দিলেন সমাসন্ন এক তরুতলে।

আচার্য্য দিবাকর মিত্র বুঝতে পারলেন, শ্রীহর্ষের দর্শনে বিবর্দ্ধিত হয়েছে রাজ্যশ্রীর শোক এবং আদর। নিভৃত-সংজ্ঞার আজ্ঞাপন শিরোধার্য্য ক'রে তাঁর একটি শিষ্য পদ্মপাতার মোড়কে ক'রে তখনি নিয়ে এল সরোবর থেকে জল। রক্তপদ্মের মত রাজ্যশ্রীর চক্ষু দুটিকে ধুইয়ে দিলেন দিবাকর মিত্র এবং তারপরে রাজ্যশ্রীর ও নিজেরও নয়ন ধৌত করলেন শ্রীহর্ষ।

সর্ব্বত্র শব্দহীন; চিত্রলিখিত যেন অরণ্য।

সেই ধ্বনিহীনতার মধ্যে ধীরে ধীরে ধ্বনিমান হয়ে উঠল শ্রীহর্ষের কণ্ঠ।

"বোন্, অত্রভবান্ ভদন্তকে বন্দনা কর। ইনিই একদা ছিলেন তোমার স্বামীর দ্বিতীয় হৃদয় এবং আমাদের গুরু।"

পরিচয় পুনর্ব্বার অশ্রু নিয়ে এল রাজনন্দিনীর নয়নে। তিনি নমোবিধান করলেন আচার্য্যকে। আচার্য্যেরও চোখে দেখা দিল জল। নয়ন পরাবৃত্ত ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ক্ষণকাল অতীত হ'লে প্রশ্রয় প্রদর্শন ক'রে মৃদুবাদিনী মধুর ভাষায় তিনি শ্রীহর্ষকে বললেন—

"কল্যাণপুঞ্জ, আপনার নয়নে অশ্রু-সংহার না হ'লে অশ্রু থামবে না রাজলোকের নয়নে। স্নান-বিধান এখন অবশ্য-করণীয়। স্নানের পর পুনর্ব্বার এখানে আসা সঙ্গত।"

লৌকিক আচার এবং আচার্য্যবাণীর অনুবর্ত্তী হয়ে শ্রীহর্ষ ত্যাগ করলেন তরুতল। ভগ্নীকে সঙ্গে নিয়ে স্নানে নামলেন গিরিনদীর স্রোতোধারায়। স্নানান্তে সেই ভূমিভাগে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে রাজ্যশ্রীর স্বামী উগ্রবর্ম্মার শ্রদ্ধায় করলেন পিণ্ডদান। পিণ্ডদর্শনের শেষে রাজ্যশ্রী সম্মতা হ'লে ভোজন করালেন সপরিজনা ভগিনীকে। অনন্তর সম্পাদিত হ'ল নিজের আহার-স্থিতি।

তারপরে শ্রীহর্ষ ধীরে ধীরে শুনতে লাগলেন বিস্তারিত সেই দুঃখের বৃত্তান্ত—

কেমন ক'রে এল গৌড়-সম্ভ্রম; কেমন ক'রে কান্যকুব্জের কারাগৃহ থেকে মুক্তিলাভ করলেন রাজ্যশ্রী; কেমন ক'রে গুপ্তিকরণ দ্বারা গুপ্তনামা এক কুলপুত্র তাঁকে নিষ্কাসন করে; কেমন ক'রে শ্রুতিগোচর হয় রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ; কেমন ক'রে আহারাদিক সমস্ত বিলাস বিসর্জ্জন দিয়ে, যেন এক প্রচণ্ড মূর্চ্ছার পটভূমিতে সপরিজন রাজ্যশ্রী পৌঁছে যান এই বিন্ধ্যাচলে;—

যেখানে স্থির হয়ে রয়েছে বন্যতার শ্রেণীবদ্ধ সমারোহ, যেখানে
চিতানলের দাহ—বহন ক'রে নিয়ে আসবে দুঃখের চরম শান্তি।

ভগ্নীদ্বিতীয় শ্রীহর্ষের পার্শ্বে এসে ধীরে ধীরে উপবেশন করলেন আচার্য্য দিবাকর মিত্র। দূরে রইল অনুজীবীরা। কালাংশের কিঞ্চিৎ অপলাপ ক'রে শ্লেষে ও লেশে উপদেশ দিলেন আচার্য্য—

"শ্রীমন্, আপনাদের কাছে আখ্যান করার মত আমার কিছু বিষয় আছে। রজনীর কর্ণপূরের মত ঐ যে দেখছেন—তারাপতি চন্দ্র,—আপনারা জানেন তাঁর ছিল বহু স্ত্রী। যৌবনের উন্মাদনায় ইন্দ্রের পুরোধা বৃহস্পতির ধর্ম্মপত্নী তরলতারা তারাদেবীকে নিজের পত্নীর মত ব্যবহার ক'রে তিনি পলায়ন করেন দেবলোক থেকে। চকোরের মত চকিত-লোচনা অতি-কামিনী সেই তারাদেবীর সঙ্গে তিনি বিচরণ করেছিলেন, রম্যরত বহু দেশে বহু প্রদেশে। সর্ব্বশেষে, ব্রহ্মার বাণী উপেক্ষা করতে না পেরে, বৃহস্পতির হস্তে চন্দ্রদেবকে প্রত্যার্পণ করতে হয়—তারা। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে চিরযুগ জ্বলতে থাকে অনিন্ধন এক দাহ—বরারোহীর বিরহ।

"তারপর একদিন যখন নক্ষত্রনাথ উদিত হচ্ছিলেন উদয়-শৈলে,—হঠাৎ তিনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন বরুণালয়ের বিমল বারিতে। দেখেই তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল মদনবেগ। তাঁর মনে প'ড়ে গেল প্রেয়সী তারার অপূর্ব্ব সেই মুখ, তার নয়নের সঙ্গীত, কপোলের সেই সুন্দর তরঙ্গ। মথিত হয় মানস, সুস্থ হ'লেও নিজেকে বোধ হয় অসুস্থ। মন্মথ-বেদনায় তাঁর কুমুদ-শুভ্র দুটি নয়ন থেকে, দুটি বিন্দু অশ্রু ঝ'রে পড়ে। সমুদ্র-পতিত সেই অশ্রুবিন্দু দুটিকে পান ক'রে ফেলে মুক্তাশুক্তিরা। তারপরে তাদের কুক্ষিকোষ থেকে যে মুক্তাফলগুলি বাহির হ'ল, সেগুলিকে কোন রকমে সংগ্রহ করেছিলেন পাতাল-পতি বাসুকি। সেই মুক্তাফলগুলি দিয়ে বাসুকি পাতালে রচনা করেন একটি একাবলী হার—পাতালের মধ্যে তারাগণের বিলোল কল্পনা। সেই একাবলীটির নাম দেওয়া হয় 'মন্দাকিনী'। ওষধিপতি ভগবান সোমের প্রভাবে সেই মন্দাকিনী—অত্যন্ত বিষঘ্নী, এবং হিমামৃত থেকে জন্মবিধায় নিখিল-প্রাণীর হরণ

করে সন্তাপ। বিষের উষ্মাশান্তির উদ্দেশ্যে সেই মন্দাকিনী হারটিকে সর্ব্বদা গলায় প'রে থাকতেন বাসুকি।

তার পরে কতকাল কেটে যায়।

নাগার্জ্জুন-নামা এক ভিক্ষু-কে পাতালতলে নিয়ে যায় নাগেরা। সেই ভিক্ষু-কে নাগরাজ বাসুকি ভিক্ষা দেন—ঐ একাবলী মন্দাকিনী হার। রসাতল থেকে নির্গত হয়ে ত্রিসমুদ্রাধিপতি নরেন্দ্র-সুহৃদ্ সাতবাহনকে তিনি দান করেন সেই একাবলী। মন্দাকিনীর হারটি কালক্রমে এবং শিষ্যপরম্পরায় কোন মতে আমাদের হস্তে উপগত হয়েছে। আপনাদের মত মাননীয়দের কিছু উপহার দেওয়া অপমান গণ্য হতে পারে, সেই জন্য বলছি, ওষধি-হিসাবে এবং সর্ব্বপ্রাণীর শরীর-রক্ষা-বিধানের উদ্দেশ্যে এটিকে বিষরক্ষাবিধি ব'লে মনে ক'রে গ্রহণ করুন।"

এই ভাষণের পর আচার্য্য দিবাকর মিত্র উন্মুক্ত করলেন ভিক্ষা-চীবরের পটাঞ্চল। মুক্তিপ্রকাশ করল একাবলী মন্দাকিনীর মুক্তাসঞ্চয়।

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই মুক্তার প্রভা যেন শুভ্রতার মহত্তেজে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, আকাশে আকাশে।

কী তার কিরণের কম্প! মনে হ'ল—

যেন মূল থেকে আরম্ভ করে, সাদা ফুল ফুটিয়ে দিয়ে, আনন্দনাচ নেচে উঠল তরুলতিকার উৎকণ্ঠা;

যেন শ্বেতপক্ষ বিস্তার ক'রে, নবমৃণালের লোভে, হঠাৎ আকাশে উঠল অরণ্য-সরসীর হংসযূথ;

যেন কেতকীর কুঞ্জে কুঞ্জে হঠাৎ খুলে গেল গুরুভার গর্ভপাতার সূচী-সঞ্চয়, ছড়িয়ে দিল রেণুকার অজস্র উজ্জ্বলতা;

যেন পাপড়ির সরু সরু কোণগুলোকে উদ্গলিত ক'রে সহসা জেগে উঠল কুমুদিনীর দল;

যেন দশনের শুভ্রালোকে কাননখানি লেপন ক'রে দিয়ে হেসে উঠলেন বনদেবীরা।

এ যেন কাশবনের শিথিল ফুলের হাসি,

এ যেন চমরী-কদম্বের পুচ্ছ-চামরের সম্ভ্রম-নৃত্য,

এ যেন জ্যোৎস্না-মঙ্গল,
অশ্রুক্লিষ্টা নারীদের মুখ-মার্জ্জনী এক ধারাজল

একাবলী মন্দাকিনীর মাংসল-ময়ূখে আকুল হয়ে উঠলেন শ্রীহর্ষ। জ্যোতির প্রভায় এবং স্নিগ্ধতায় একবার উন্মীলিত, পরক্ষণেই নিমীলিত হতে লাগল তাঁর চক্ষু। সর্ব্বাশাপূরণীকে কোন প্রকারে তিনি দেখলেন।
আহাঃ—এ যেন—

শারদীয়া ঘনমুক্তায় রেখাবদ্ধা জ্যোৎস্না;
সপ্তর্ষিদের পদকচিহ্নিতা সঞ্চারণ-বীথিকা;
ভুবন-লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর-মালিকা;
বসুধার পল্লবিত নয়নের বিহসতিকা;
মহেশ্বরের তরলাংশুকা চিন্তা;
মন্ত্রকোষ-সাধনিক রাজধর্ম্মের নবীন অক্ষমালিকা।

এই ঐশানী শশিকলা, এই মন্দাকিনীর, বিস্ময়তায় তন্ময় হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। এমন সময়ে, তাঁর বন্ধুর স্কন্ধ-কন্ধরে আচার্য্য দিবাকর মিত্র বেঁধে দিলেন সেই একাবলী মন্দাকিনী। আনন্দ-সম্ভাষণ জানাল নরপতির প্রীতি।

“আর্য্য, খুব কম মানুষই এমন রত্ন জীবনে দেখেছে। আর্য্যের এটি তপস্যার সিদ্ধি, না দেবতার প্রসাদ? আমাকে আপনি এটি দান করলেন, জানি, কিন্তু আমি কে, আমি কি একে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারি? কোথায় রয়েছে আমার সে ক্ষমতা?

গুরুদেবের গুণ আমার হৃদয়কে বন্দী করেছে। সেখানে আমি পরবশ। আপনার উপযোগের জন্য আমরণ ব্যবস্থিত রইল আমার এই কর্ত্তব্য-কামচারী শরীর।”

এই রকম ক’রে অতিক্রান্ত হ’ল কিছু সময়। পরিজনদের মধ্যে কিছুতেই থামতে চায় না একাবলীর বর্ণনা ও তৎসম্পর্কিত আলাপ।
বিশ্রম্ভ লাভ ক’রে রাজ্যশ্রী তাম্বূলবাহিনী পত্রলতাকে পাশে ডাকলেন। ধীরে ধীরে কী যেন তার কানে কানে বললেন, আদেশ দিলেন।

তখন বিনয় প্রদর্শন ক'রে পত্রলতা পার্থিব শ্রীহর্ষকে করল নিবেদন—

"হে দেব, দেবী আপনাকে জানাতে বললেন—তাঁর স্মরণে পড়ে না, পূর্ব্বে কখনো কোনদিন আর্য্যের সম্মুখে তিনি উচ্চবাক্য ব্যবহার করেছেন। নিবেদনও কখনো কিছু করেন নি। কিন্তু তাঁর যে আর সহ্য হয় না শোক। হতদৈবের আদেশে অনেক কিছু ঘ'টে গেছে তাঁর জীবনে, আজ তাই শিথিল হয়েছে বিনয়।

তিনি জানেন, অবলাদের অবলম্বন হচ্ছে পতি বা পুত্র। দুটিই তাঁর নেই, শুধু রয়েছে দুঃখের আগুনে ইন্ধনের মত একখানি প্রাণ। এ বেঁচে থাকায় শালীনতা নেই। মৃত্যু-যত্নও প্রতিহত হয়েছে আর্য্যের আবির্ভাবে। অতএব তাঁর মত এক পুণ্যহীনা আপনার আদেশ আকাঙ্ক্ষা করছেন—আর্য্য, তাঁকে কাষায় গ্রহণের অনুমতি দান করুন।"

শ্রীহর্ষ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শুনলেন সব, বিন্যাস করলেন না বাক্যের।

উত্তর দিলেন আচার্য্য দিবাকর মিত্র।

"আয়ুষ্মতি, শোক পদার্থটি যে কি, প্রথমে তা জানা প্রয়োজন। সাধারণে বলে—পিশাচের এটি নামান্তর। কিন্তু তারা ভুলে যায়—প্রধানতঃ এটি আক্ষেপের রূপান্তর, তামসিকতার তারুণ্য, বিষের বিশেষণ, প্রেতনগরের নায়ক।

আর এই যে দেখছ—দহন, তার মূলে থাকে অ-নির্বৃতি ধর্ম্ম। এই দুঃখ-ধর্ম্মের তুলনা করা চলে—অক্ষয় রাজযক্ষ্মার সঙ্গে।

এ যেন—নরখাদী জনার্দ্দন, অলক্ষ্মীর আবাস, অপুণ্য-প্রবৃত্ত ক্ষপণক,
জাগরণহীন নিদ্রার একটি প্রকারভেদ।
এ আসে বায়ুপ্রকোপের মত—স্নেহের মধ্য দিয়ে ;
এ আসে অগ্নির মত—মানসিক বিকৃতির মধ্য দিয়ে ;
আঁধির মত এ আসে—সুখবর্ষণের মোহ জাগিয়ে ;
এই বিশ্বদুঃখ কেবল আসে, কেবল আসে ;—
রস থেকে—অভিশোষ, শোথের মত আসে।

দুঃখের রক্তরঞ্জনা থেকে আসে কালের অবসন্নতা—মৃত্যু।

এই যে শোক—

যা ঝ'রে পড়েছে অশ্রুসারের অজস্রতায় ;

যা হৃদয়ের মহাব্রণ ;
যা তামসিকতার মাধ্যমে লাভ করে প্রবেশ এবং বিস্তার ;
প্রাণের যিনি তস্কর ;
শূন্যতার অন্তরাল থেকে যিনি হনন করেন পঞ্চ মহাভূতের সঞ্চয় ;
লোকক্ষয়ের যিনি ধূমকেতু এবং দোষাবলীর দক্ষ চক্রবর্ত্তী ;
কৃশতা, শ্বাস, প্রলাপ, উপদ্রব, দীর্ঘরোগ যাঁর নিত্য সহচর ;
তিনি—এই শোক—এই সংসারে নিত্য বিরাজ করেন অনভ্র বজ্রপাতের মত।
যাঁরা বিদ্বান, অনবদ্য বিদ্যার বিদ্যুতে দ্যোতমান যাঁদের হৃদয় ;—
গ্রন্থের গহনতায়, গ্রন্থির ভেদে, গূঢ়গর্ভ অর্থের সংগ্রহণে, যাঁরা গম্ভীর ;—
কাব্যকথায় কঠোর যাঁদের চিত্ত ;—
এই শোক তাঁদেরও চিত্তটিকে আপাত-মথিত করতে বিরত হয় না।
এই হেন শোকের বিহ্বলতার মধ্যে ভাবতে পারা যায় না কেমন ক'রে বাঁচবে অবলাদের দুর্বল মন !
আহা, সজল মৃণালের মত সেই কতকগুলি মন !
নবমল্লিকার ফুলের মত কোমল সেই কতকগুলি মন !
অয়ি সত্যব্রতে, যখন সংসারে এই রকমের এক বিষণ্ণ-বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তখন তুমিই বল, কী করা আমাদের কর্ত্তব্য ? কার উপরে রাগ করবে ? কাকে বকবে ? কার সামনেই বা দাঁড়িয়ে উচ্চ-ক্রন্দনে প্রকাশ করবে মর্ম্মদাহী তোমার দুঃখ ? মোহগ্রস্ত হতে নেই। চক্ষু নিমীলিত ক'রে সব কিছুই সহ্য করতে হয় মর্ত্ত্য-ধর্ম্মিয়দের।
অয়ি পুণ্যবতি, কে অন্যথা করতে পারে এই পুরাতনী স্থিতি ? পৃথিবীর পাঁচ জনকে মৃত্যুর কূপ থেকে ঘটি ডুবিয়ে তুলতেই হবে জল। সেই জলে দিবারাত্র ভাসছে—জন্ম জরা এবং মরণ। পঞ্চমহাভূত হচ্ছেন রাজার যেন পাঁচটি কর্ম্মচারী, রাত্রিদিন নিপুণভাবে দেখছেন—অন্তঃকরণের ব্যবহার ; এবং বিশ্বজনতার হৃদয়ে ক'ষে দিয়ে যাচ্ছেন ধর্ম্মরাজের স্থিতি।
মহাকালের নালিকা-ঘড়ি ক্ষণকালের জন্যও ক্ষমা করে না প্রাণীকে ; জীব-সত্ত্বার আলয়ে আলয়ে প্রতিদিন প্রকাশ পেয়ে চলেছে তার আয়ুর্বিষয়ক মুহূর্ত্তগণনার নৈপুণ্য। সর্ব্বদাই শুনতে পাবে, প্রেতপতির পটহ বাজছে ; আর সেই সঙ্গে প্রকট হচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রের নবতর রূপ। প্রতি দিকে, প্রতি পুরীতে দেখতে পাবে,

কালপুরুষেরা ঘুরছে। প্রতপ্ত লৌহের মত লোহিত তাদের চক্ষু, কালকূট বিষের মত কৃষ্ণ-কঠিন তাদের কায়া, হস্তে নৃত্য করছে কালপাশ। প্রতি ঘরে ঘরে শুনতে পাবে—যম-ঘণ্টার ভয়ঙ্কর টঙ্কার তুলে যমকিঙ্করদের আঘাত-ঘোষণা। চতুর্দ্দিকে চাও, দেখতে পাবে—চিতার ধূমে ধূসরিত হয়ে প্রেতপতির পতাকা কাঁপছে, হাজারে হাজারে প'ড়ে রয়েছে শব-শিবিকা, যমরাজের পতাকার উপর গৃধ্রদের দৃষ্টি।

আশ্চর্য্য হ'তে হয়, যখন ভাবি—যারা বেঁচে আছে তারা কেন কাঁদে? জীবন কেন কাঁদে মৃত্যুর জন্যে! এই দুঃখ, এই শোক—জীবনের সীমানায় প্রাণীদের পরলোক-প্রস্থানের বীথিকা।

কালরাত্রি তার রক্তজিহ্বা মেলে লম্পট স্বৈরিণীর মত জীবনকে লেহন করতে করতে চলেছে। কিন্তু দেখ, ভগবান মৃত্যুর লীলা;—নিখিল প্রাণিজাতকে তিনি নিরঙ্কুশ ভোজন করছেন, তবুও অশিক্ষিত র'য়ে যাচ্ছে তাঁর তৃপ্তি। জেনে রেখো, অনিত্য-নদী অত্যন্ত দ্রুতবাহিনী। মহাভূত-প্রপঞ্চ ক্ষণিক। আত্মার সব কিছুই অনীশ্বর, বিশ্বই নশ্বর। জীবদের বন্ধনপাশের তন্ত্রীর তন্তুগুলি দেখতে পাবে—সব সময়েই ছেঁড়া। শুভ এবং অশুভের আবেশে বিবশ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায় শরীর-নির্ম্মাতা এই পরমাণুগুলি।

এই সব বিবেচনা ক'রেই বলছি,—মেধাবী মনের মৃদুতার মধ্যে তামসিকতাকে প্রসার পেতে দেওয়া,—সুযুক্তির বাইরে। এক মুহূর্ত্তের ধীরতা, রূপ বদল ক'রে দিতে পারে জীবনের।

আয়ুষ্মতি, এখন তোমার একটি কর্ত্তব্য আমি দেখতে পাচ্ছি,—পিতৃকল্প ভ্রাতার আদেশ পালন করা। কাষায়গ্রহণের কল্যাণীয়া বাসনা সকলেরই অভিমত হতে পারে। মনোজ্বরের প্রশমন হবে, এই হেতু হতে পারে তোমার প্রব্রজ্যার চিন্তা; কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য জ্যেষ্ঠের, বাৎসল্যের, রাজার আদেশ অনুসারে চলা। মনোরথ-মধু দিয়ে মহাভাগই ভেদ ক'রে দেবেন সংশয়।"

অবসান হ'ল দিবাকর মিত্রের বাণীর।

শ্রীহর্ষ বললেন—

"আর্য্য-ব্যতীত এমন কে রয়েছেন, যিনি এমন কথা বলতে পারেন। দৈবের কশাঘাতে যখন বিষম বিপদে পড়ে প্রাণী, তখন আপনারাই হন তাদের অবলম্বন-

স্তম্ভ। ধর্ম্মের প্রদীপ স্নেহ দিয়ে জ্বালাতে হয় বটে, কিন্তু প্রদীপের আলোই কি ধ্বংস ক'রে দেয় না মোহের অন্ধকার? পরাপ্রীতি বীরেদের মধ্যেও ধৃষ্টতা নিয়ে আসে। সমুদ্রেরও বাসনা হয়—লঙ্ঘন ক'রে যাই বেলা-ভূমি। স্বার্থ-তৃষ্ণাই শিক্ষা দেয় প্রগল্‌ভতা। প্রথম আতিথ্যেই অযাচিতভাবে আপনি আমাকে দান করেছেন আপনার মাননীয় দেহ। সেই বিধায়, ভদন্তের হস্তে আমি, ন্যাস রাখলুম—আমার বালিকাসমা ভগিনীকে। বেচারী এইটুকু বয়সে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট পেয়েছে। নিত্য এঁকে লালন করবেন,—এই আমার অনুরোধ।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—আমার ভ্রাতৃহত্যাকারীদের সর্ব্বধ্বংস। এই বাহুর শৌর্য্যই ঘটাবে প্রলয়। চণ্ডাল ক্রোধের হাতে আমার আত্মাকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছে পূর্ব্ব অপমান। সেই জন্যেই আমি যাচ্ঞা করছি আপনার সহায়তা।

যতদিন না আজ থেকে আমি—

লঘু করি আমার প্রতিজ্ঞাভার, আশ্বাস দান করি দুঃখ-দীর্ণ প্রজাদের,
ততদিন আশা করি, আপনার কাছে আমার ভগ্নী লাভ করবে,—
ধর্ম্ম-বিষয়ক সংলাপের মাধুরী, মালিন্যহীন উপদেশের মাঙ্গল্য, শীল ও শান্তিদায়িনী দেশনা, এবং তথাগতের দুঃখ-নাশী দর্শন।

যখন সমাপ্ত হবে আমার কৃত্য তখন আমার সঙ্গে ইনিও গ্রহণ করবেন কাষায়। মহতের কাছে প্রার্থীদের অপ্রাপ্য কিছু নেই। একদা দধীচি নিজের অস্থি দিয়ে বজ্র গঠন ক'রে কৃতার্থ করেছিলেন ইন্দ্রকে। মুনিনাথ বুদ্ধদেবও আত্মস্থিতিকে উপেক্ষা ক'রে জন্মান্তরে শাবকভোজী সিংহের মুখে নিজেকে বলি দিয়েছিলেন। আপনার মত জ্ঞানীর কাছে উদাহরণের প্রযুক্তি বৃথা। কত আর বলব?"

স্তব্ধ হলেন শ্রীহর্ষ।

ভদন্ত পুনর্ব্বার বললেন—

"যারা ভব্য, তারা দ্বিবার উচ্চারণ করে না বাক্য। কায়া-বলি তো পূর্ব্ব হ'তেই করেছি, এখন গ্রহণ বা অগ্রহণের লীলাবিধান কর্ম্মক্ষেত্রে। গুণ আপনার আয়ত্ত।"

প্রণয়ে অভিনন্দিত হয়ে শ্রীহর্ষ সেইখানেই অতিবাহিত করলেন রাত্রি। প্রভাতে আহ্বান করলেন নির্ঘাত-কে। তাকে তুষ্ট করলেন বসন অলঙ্কারাদির পারিতোষিকে এবং রাজ্যশ্রীকে পাঠিয়ে দিলেন আচার্য্য দিবাকর মিত্রের আশ্রমে।

জাহ্নবীপুলিনে স্থাপিত ছিল শিবির; কয়েকটি প্রয়াণকেই সেখানে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন নিশ্চিহ্ন-চিন্তা শ্রীহর্ষ।

কেবল রাজ্যশ্রীকে খুঁজে পাওয়ার কথা এবং প্রণয়ী বন্ধুদের কাছে তার বিপদের বর্ণনা ক'রে শিবিরে সারাদিন কেটে গেল শ্রীহর্ষের।

কথাবসানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমে নামলেন রবি।

মধুপঙ্কে পিঙ্গল হ'ল পদ্মবন,
সঙ্কুচিত হ'ল চক্রবাকবল্লভ বাসর।

সূর্য্যদেব নিজের শরীরের মধ্যে সংহৃত ক'রে নিলেন আলোকের জালক, যেমন
একদিন করেছিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য-বমিত রুধিরারুণবর্ণ যজুর্ব্বেদ।

অশ্বত্থামার উষ্ণীষবন্ধে সহজাত চূড়ামণির মত, ধীরে ধীরে, আরো ঘন, আরো লোহিত হ'তে লাগল বিদায়-সূর্য্যের শেষ-রশ্মি।

এ যেন গজরক্তশোভী মহাভৈরবের একটি মুহূর্ত্ত।

অবসন্ন হ'ল বাসরের বেলা। সন্ধ্যারাগের রক্তিমায় জ্ব'লে উঠল জলপ্রবাহ।

সেই সন্ধ্যায়—

"মেটাও তোমার অপরিমিত যশের তৃষ্ণা"—

এই কথা বলতে বলতে,

কুলকীর্ত্তি যেন শ্রীহর্ষের সামনে তুলে ধরলেন—
মুক্তার একটি ভৃঙ্গার,
এবং রাজ্যলক্ষ্মী যেন নিয়ে এলেন—
রাজত শাসন-মুদ্রা।

এ দুটিই উপমেয়;

উপমান—
নিশার শুভ্রভানু ঐ চন্দ্র।

ইতি বাণভট্টকৃতৌ হর্ষচরিতে
অষ্টম উচ্ছ্বাসঃ॥ *

* বোধ হয় এই সময় বাণভট্ট দেহরক্ষা করেছেন ব'লে এই উচ্ছ্বাসের নামকরণ হয় নি। অন্য সাতটি উচ্ছ্বাসেরই নামকরণ হয়েছে।

"অধিকন্তু"

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি শ্রীবাণভট্টের নামে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত আছে। এগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নয় তার প্রমাণ শ্লোকগুলির ভাষা। প্রতি শ্লোকের নীচে অনুবাদ গ্রথিত হ'ল।

১। উগ্রবর্হিষি দর্দুরারবপুষি প্রক্ষীণপান্থায়ুষি
শ্চোতদ্বিপ্রুষি চন্দ্ররুদ্ধমুষি সখে হংসদ্বিষি প্রাবৃষি।
মা মুঞ্চোচ্চকুচাস্তসংততগলদ্বাষ্পাকুলাং বালিকাং
কালে কালকরালনীলজলদব্যালুপ্তভাস্বত্বিষি॥ (বাণভট্ট)

হে সখা,

ঘন বর্ষা নেমেছে;—

ময়ূর কলাপ মেলে নাচছে,
দাদুরীর কলরবে পুষ্ট হয়েছে দিক্‌,
প্রক্ষীণ হয়ে আসছে পথিকদের পত্রযাত্রা,
আকাশ থেকে যেন চুরি হয়ে গেছে চাঁদ এবং নক্ষত্র,
বিদ্যুতের কণায় চিক্‌চিকিয়ে উঠছে জলধারা,
হংসের হিংসা ভাসছে পবনে;—

এই হেন করাল সময়ে, হে সখা—

নীল-মেঘের মত নভোলোপী এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে, ছেড়ে যেও না ঐ বাষ্পাকুলা বালাকে, ছেড়ে যেও না—তার উন্নত স্তনের শিখর।

২। কারঞ্জীং কুঞ্জয়ন্তো নিজজরঠরবব্যঞ্জিতাবীরকোশান্‌
উৎপাকান্‌ কুক্ষলানাং পৃথুসুষিরগতান্‌ শিম্বিকান্‌ পাটয়ন্তঃ।
ঝিল্লীকাঝল্লরীণাং বধিরিতককুভং ঝঙ্কৃতং খে ক্ষিপন্তঃ
সিঞ্জানাশ্বত্থপত্রপ্রকরঝণঝণারাবিণো বান্তি বাতাঃ॥ (বাণভট্ট)

গ্রীষ্মের গরম বাতাস বইতে সুরু হয়েছে;—

কারঞ্জী-মরীচের অগ্রপল্লবের মধ্য দিয়ে কুঞ্জন করে সে ছুটেছে;
নিজের খরগর্জ্জনে শিম্বিকার দুর্ব্বল কোশগুলিকে ফাটিয়ে ফাটিয়ে,—
তার সুষির-গত উৎপক্কতার কুক্ষতাকে চিরে চিরে,—
উৎপাটন করতে করতে সে ছুটেছে;
আকাশে উঠছে ঝিল্লীকা-ঝল্লরীর দিক্‌-বধির ঝঙ্কার;
আর অশ্বত্থের পাতায় পাতায় ঝণঝণ ক'রে বেজে উঠছে গরম হাওয়ার গান।

৩। কারণান্মিত্রতাং যাতি কারণাদ্যাতি শত্রুতাম্
তস্মান্মিত্রত্বমেবাত্র যোজ্যং বৈরং ন ধীমতা॥ (বাণভট্ট)

কারণ-বশতঃই মিত্রতা ঘটে,
কারণ-বশতঃই শত্রুতা ঘটে॥
সেইহেতুই ধীমানদের এই সংসারে
মিত্রত্বই যোজ্য;
বৈর নয়।

৪। দ্বারং গৃহস্য পিহিতং শয়নীয়স্য পার্শ্বে
বহ্নির্জ্বলত্যুপরি তূলপটো গরীয়ান্।
অঙ্গানুকূলমনুরাগরশং কলত্রমিত্থং
করোতি কিমসৌ স্বপতস্তুষারঃ॥ (বাণভট্ট)

গৃহদ্বার বন্ধ রয়েছে;
শয্যার পার্শ্বে আতসদানে আগুন জ্বলছে;
উপরে রয়েছে প্রকাণ্ড এক তুলার লেপ;
পার্শ্বে শায়িতা রয়েছেন স্ত্রী—
অঙ্গ তাঁর অনুকূল,
অনুরাগের তিনি বশ।
ওরে, তুষার-ভরা শীত,—
—এই কি তোর ঘুম ভাঙানোর
সময় হ'ল?

৫। শূন্যাগ্নৌ পূর্ণবাঞ্ছ প্রথমমগণিতপ্লোষদোষঃ প্রদোষে
পান্থঃ সুপ্তা যথেচ্ছং তদনু চ সতৃণে ধামনি গ্রামদেব্যাঃ
উৎকম্পী কর্পটার্ধে জরতি পরিজড়ে ছিদ্রিণি ছিন্ননিদ্রে
বাতে বাতি প্রকামং হিমকণনিকণন্‌কোণতঃ কোণমেতি॥ (বাণভট্ট)

শূন্য ছিল অগ্নি; কামনা পূর্ণ ক'রে প্রদোষে চলেছিল শিশির-পথিক; হেমন্তের খর রৌদ্রের দোষটিকে সে গণনার মধ্যেই আনে নি। তারপরে সেই পথিক ঘুমিয়ে পড়ল পথে।

এমন সময় উঠল ঝড়। শতছিদ্র জীর্ণ আধখানা কর্পটের মধ্য দিয়ে ছুটে চলল নিদ্রাহীন তুষারবর্ষী ঝড়। বিচলিত হয়ে শিউরে উঠল পথিক। গ্রামদেবীর তৃণাচ্ছন্ন জীর্ণ আস্থানের অভিমুখে সে পা বাড়াল। হিমের কণাগুলি তখন এ আকাশের কোণ থেকে ও-আকাশের কোণে কেঁদে কেঁদে ফিরছে। বন্ধু, ঝঞ্ঝা উঠেছে হিমেল হাওয়ায়।

৬। বিত্রাণে রুদ্রবৃন্দে সবিতরি তরলে বজ্রিণি ধ্বস্তবজ্রে
জাতশঙ্কে শশাঙ্কে বিরমতি মরুতি ত্যক্তবৈরে কুবেরে।
বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিতাস্ত্রে মহিষমতিরুষং পৌরুষোপনিঘ্নং
নির্বিঘ্নং নিঘ্নতী বঃ শময়তু দুরিতং ভূরিভাবা ভবানী॥ (বাণভট্ট)

রুদ্রবৃন্দ যখন জীর্ণ হয়ে যান, সবিতা হন তরল,
ইন্দ্র হন ধ্বস্তবজ্র, শঙ্কা জাগে শশাঙ্কের,
বিরাম নেন মরুৎ, বৈরী ত্যাগ করেন কুবের,
বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিত হয় অস্ত্র,
সেই সময়ে হে ভবানি, পৌরুষনিঘ্ন অতিরুষ্ট যমের মহিষকে তুমি নির্বিঘ্নে হত্যা ক'রে, শান্তি নিয়ে আস, পুষ্টি নিয়ে আস, দূর ক'রে দাও অকল্যাণ॥

৭। গতপ্রায়া রাত্রিঃ শশিমুখি শশী শীর্য্যত ইব
প্রদীপোঽয়ং নিদ্রাবশমুপগতো ঘূর্ণত ইব।
প্রণামান্তে মানস্তদপি ন জহাসি ধ্রুবম্
অহো কুচ-প্রত্যাসক্তা হৃদয়মপি তে চণ্ডি কঠিনম্॥ (বাণভট্ট)

চাঁদের মত তোমার মুখ।
কিন্তু রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, শীর্ণ হয়ে আসছে শশী।
নিদ্রায় আবিষ্ট হয়ে প্রদীপটিও যেন ঘুরতে ঘুরতে নিভে আসছে।
প্রণাম করলুম; তার শেষে এখনও তোমার মান! আশ্চর্য্য!
ওগো সুন্দরি, তোমার হৃদয় বড় কঠিন;—
যেমন—কঠিন তোমার স্তন।
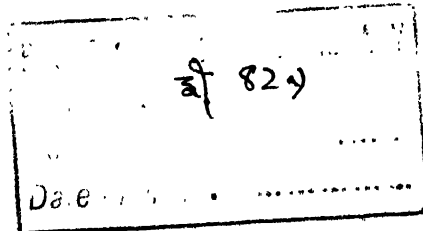
"অবচূরিকা"

অক্ষণিক—অতি ব্যস্ত।

অক্ষপটলিক—দলিল-রক্ষক (মহাফেজ)।

অক্ষহৃদয়—পাশা খেলার রহস্যজ্ঞ।

অঙ্কনস্থান—মার্কা (পোড়া লোহার চিহ্ন)—Branded spot.

অচ্ছধার—চক্‌চকে ফলা যার।

অতিমুক্তক—মাধবীলতা।

অত্যয়কৃত—অতিক্রম করণ।

অদভ্র—প্রচুর।

অনপাচীন—বিপরীত বা বিরুদ্ধ নয়।

অনাঘ্রাত—শঙ্খধ্বনি না হ'লেও।

অনুত্তার—পার হয়ে ফিরে আসা যায় না।

অন্তিকাগার—সমীপস্থ গোপন পরামর্শ-ঘর।

অপচিতি—পূজা।

অপরবক্ত্র—সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। আখ্যায়িকা মাত্রেই বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র ছন্দ প্রযোজ্য, "অযুজি ননরলাগুরুঃ সয়ে তদপর বক্ত্রমিদং নজৌজরৌ।"

অপস্মার—মূর্চ্ছা রোগ।

অপ্রতিরথ—অপ্রতিরথ নামা ঋষি কর্ত্তৃক উচ্চারিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১০৩নং সূক্ত (১-১৩ ঋক)। "আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো। ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষ-ণীনাং। সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ। শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥১॥ ইত্যাদি যুদ্ধার্থ, রাজার সন্নহনে এবং রাজদর্শন ব্যাপারে এই মন্ত্র উচ্চারিত হ'ত।

অবট—ভূমিস্থিত গর্ত্ত।

অবনাট—নত-নাসিক।

অবভৃথ স্নান—সোমযাগের অন্তে পুরোডাশা-হুতি-পূর্ব্বক দীক্ষাস্নান। প্রয়োজন-বিধায় সপত্নীক এই স্নান করতে হয়।

অবহুমান—অসম্মান।

অবীচি—পুরাণোল্লিখিত অসংখ্য নরকগুলির মধ্যে অবীচি অন্যতম। সেই নরকে আগুনের ঢেউ খেলে।

অভিজনতা—উচ্চবংশজাত কৌলীন্য।

অভিন্নপুট—আখোলা গুটি।

অভীরুগাছ—শতমূলী—Asparagus Racemosus.

অভ্যাগারিক—পরিজনপোষণে আগ্রহী।

অমত্র—রাজার নিজের জলপানপাত্র।

অমর্ষ—ক্রোধ।

অম্লাতক—আমড়াগাছের ফুল।

অরুক বা (আরুকগাছ)—হিমালয়জাত আড়ুফলের গাছ।

অর্ধোরুক—জাঙ্গিয়া।

অশ্ববার-চক্র—ঘোড়-সওয়ার মণ্ডলী।

অষ্টাপদ—পাশার ছক।

অসংস্কৃত—অপূজিত।

অসুর-বিবর—পাতাল, খনি।

অশ্মকেশ্বর—অজন্তাগুহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশের নাম অশ্মক ছিল। সেই প্রদেশের রাজা।

অহি-রমণী—দু-মুখো সাপ।

আগ্রহারিক—ফাঁকিবাজ ব্রহ্মোত্তর-জমি-ভোগকারী।

আচমনক—আঁচাবার পাত্র।

আচ্ছিদ্যমান—ছাড়িয়ে নেওয়া—separated.

আটবিক সামন্ত—অরণ্যবাসী সামন্তরাজ।

আপানমণ্ডপ—সুরাপান গোষ্ঠী।

আপ্রপদী—পাদাগ্র পর্য্যন্ত।

আযুক্তক—নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

আরটন—তীব্রধ্বনি।

আরট্টজ—পঞ্চনদ-দেশ-জাত "আরট্ট"-নামক বাহিকা-সংযুক্ত অশ্ব।

আরভটী—ভরতনাট্যশাস্ত্রে ও সাহিত্য-দর্পণে নৃত্ত-প্রয়োগ-বিষয়ে চার প্রকার বৃত্তি বর্ণিত আছে। যথা—ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী। কপটতা, বঞ্চনা, দম্ভ, মিথ্যাবচন, মায়া, ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ, উদ্ভ্রান্তি ও বধবন্ধনের বিচিত্রতা প্রদর্শনকালে নট মাথার কেশগুচ্ছ আন্দোলিত করতে করতে এই আরভটী বৃত্তির প্রয়োগ করে।

আলান-লৌহস্তম্ভ—হাতী বাঁধার লোহার থাম।

আলেপক—যারা পলস্তারের কাজ করে।

আশ্চর্য্য—অলৌকিক ঘটনা।

আষাঢ়দণ্ড—সন্ন্যাসীর ব্যবহার্য্য পলাশ-কাঠের দণ্ড।

আসন্দি—বসিবার পিঁড়ে।

ইচ্ছা-বিমান—খেয়ালের এরোপ্লেন।

"ইতি" রোগ—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পঙ্গপাল, শুক এবং সৈন্যদের অত্যাচার—এই ছয় প্রকার উপদ্রবকে ইতিরোগ বলে।

ইন্দ্রগোপ কীট—বর্ষার প্রথমে রক্তবর্ণ মখমলী এই ক্ষুদ্র কীট দেখা যায়।

ইন্দ্রনীলিকা—নীলমের আংটি।

ইন্দ্রলুপ্ত—মাথার টাক।

—জবুস্থবু।

উচ্চিত্র—ছবি আঁকা।

উজ্জিহান—নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যাত্যাগকারী।

উটজ—মুনিদের পর্ণকুটির।

উত্তম্ভন—অবলম্বন, ঠেকো।

উত্তানিত—চীৎ করা।

উৎকলিকা—উৎকণ্ঠা।

উদক্—উত্তর দিক।

উদ্গলিত—কণ্টকিত।

উদ্বৎ-দ্রোণী—ঘোড়ার পশ্চাৎ-দিকের দাবনার মধ্যস্থলের গভীর খাঁজ।

উন্মাথ—আলোড়ন।

উপচিতি—পুষ্টি বা বৃদ্ধি।

উপদিগ্ধ—উপলিম্পন, প্রলেপ দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া (মাখানো)।

উপধা—সততা সম্বন্ধে পরীক্ষা।

উভয়পালী—ডান কাঁধ ও বাম কাঁধ।

উরশ্ছদ—উরস্ত্রাণ।

উল্লক—এক প্রকার সুগন্ধি ফল।

উর্ব্বী—পৃথিবী।

কক্কোল—কাঁকলা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কঙ্কণধর—বর (মৃচ্ছকটিক দ্রষ্টব্য)।

কণীণিকা—চোখের কালো তারা।

কণ্ঠালক—বড় বড় পেটী।

কদলিকা—কলাগাছ, পতাকা।

কন্ধর—ঘাড়।

কপর্দী—জটাজুট শিব।

করঞ্জ—করমচা।

করণিক—যারা দলিলপত্রাদি লেখে (মুহুরী)।

করণ্ড—বাঁশের বাক্স।

করভিণী—মাদী উট।

করূষ দেশ—জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী চেদী রাজ্যের সংলগ্ন একটি দেশ।

কর্করী—কাঁচের ঘটি।
কর্বুর—বিচিত্র বর্ণ।
কলবিঙ্ক—চড়াই পাখী।
কলমূক—খোজা বা নপুংসক।
কলিঙ্গ—গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম ছিল কলিঙ্গ।
কাকবর্ণ—শৈশুনাগ বংশীয় দ্বিতীয় রাজা। বিষ্ণুপুরাণে (৪. ২৪) এই বংশের দশটি রাজার উল্লেখ আছে।
কাকোদর—ফণী, নাগ।
কাঁচ-কাচর—কাঁচের মত সবুজ।
কাঁজি—ভাতের আমানি।
কাণ্ড-পট-মণ্ডল—বৃহৎ শিবির, তার মধ্যে কানাৎ দিয়ে পৃথক করা অনেক কক্ষ থাকে।
কাদম্ব—কলহংস।
কাপেয়-বিকল—বাঁদরদের চঞ্চল অঙ্গভঙ্গী।
কাপোতিকা—এক প্রকার গাছের নাম।
কামবাগুরা—প্রেমের পাশ।
কাম্বোজ—হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পরপারে কম্বোজ দেশ, তথাজাত অশ্ব।
কার্দ্দরঙ্গ—কর্দ্দরঙ্গ নামক দেশে উদ্ভূত।
কার্পটিক—তীর্থজলবাহী তীর্থযাত্রী।
কাহল—জয়ঢাক।
কিঞ্জল্ক—পাতার মত যে অংশগুলি জুড়িয়া বীজাধার প্রস্তুত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে কিঞ্জল্ক বলেন, filament.
কিনাঙ্কিত—কড়াপড়া।
কিম্পুরুষ—কিন্নর, বা অর্দ্ধ নরপশু প্রাণী। ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ ইহাদের দেশ। রাজধানী হেমকূট।
কিষ্কু—এক বিঘৎ।
কুটহারিকা—মেয়ে জলভারী।
কুটীকৃত—কুণ্ডলী পাকিয়ে।
কুব্জিকা—কুঁজো বুড়ী।
কুম্ভদাসী—বারনারী।
কুরণ্টক—পীতঝিণ্টি-বৃক্ষ।
কুর্চ্চভাগ—দুটি ভ্রূর মধ্যস্থল।
কুলপুত্র—সৎ বা উচ্চকুলজাত সন্তান কিন্তু দরিদ্র।
কুট-পাকল—হাতীর জ্বরের নাম।
কূণিত—সঙ্কুচিত।
কূর্চ্চি—পোঁচড়া টানা বুরুষ।
কৃকলাস—বহুরূপী, গিরগিটি।
কৈরব—শ্বেতপদ্ম।
কোকনৃত্য—চক্রবাক-নৃত্য।
কোটিহোম—দিব্যোৎপাত শাস্তির জন্যে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে যে হোম করা হয়।
কোণাহত—ঢাকের কাঠি, বাদনদণ্ড, মেজ-রাপ।
কৌণপ—যজ্ঞীয় মাংসভোজী রাক্ষস।
কৌশলিকা—ভেট, উপঢৌকন।
ক্রশিমা—কৃশতা।
ক্রৌর্য্য—ক্রূরতা।

খঞ্জাক্ষ—অক্ষরগুলি যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরুচ্ছে।
খণ্ডপরশু—শিব।
খুল্লক—দরিদ্র, দুষ্ট, দুঃখিত।
খেট-চটক—গ্রামভৃত্য।
খেটন—সেবা, শুশ্রূষা।

গন্ধমাদন—(১) সুরভিত অরণ্যবিশিষ্ট মেরু-পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে ইরাবৃত ও ভদ্রাশ্বের মধ্যবর্ত্তী একটি পর্ব্বত। (২) জম্বুদ্বীপের পশ্চিমস্থিত বিভাগকারী পর্ব্বত।

"গরুড় মণি"—"গারুৎমৎ-মণি" বা "মরকত-মণি"।

গন্ধর্ক—এক প্রকার স্ফটিকের নাম।

গৃহচিন্তক চেটক—এক শ্রেণীর ভৃত্য, যারা সৈন্যদের শিবির সংস্থানাদি তত্ত্বাবধান করে।

গোদন্তপুষ্প—গোদন্ত নামক সাপের মাথার মণি।

গোধনগিরি—'মেকল পর্ব্বতে'র একটি শিখর। অপর নাম 'সূর্য্যপর্ব্বত'।

গোমুৎ—লতাবিশেষ, ঘাস।

গোলাঙ্গুল—এক জাতীয় বাঁদর।

গ্রন্থিপর্ণ—পীপুল।

ঘুরঘুরুক—ঘুংগুরের মত ছোট্ট ছোট্ট ঘণ্টা।

চকোরনাথ—পুরাণবর্ণিত চকোর পর্ব্বতের রাজা।

চক্রক—ছোট ফণার মত আভরণ।

চঞ্চরীক—ভোমরা।

চণ্ডাতক—জাঙ্গিয়া।

চতুর্থীদশা—হাতীর বয়স ৩০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পূর্ণ হইলে সেই সময়কে চতুর্থীদশা বলে। ইহার পরে হাতী পঞ্চমীদশা প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রশালিকা—ছাতের ছোট ঘর বা শিরো-গৃহ। (ক্ষীরস্বামী)

চরু-কটাহ—চরু-রন্ধনের বড় কড়া।

চর্ম্মপুত্রিকা—চামড়ার পুতুল।

চাট—জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ।

চাট-সৈনিক—অনিয়মিত ভাবে নিযুক্ত সৈনিক।

চামীকর—সোনা।

চারভট—যোদ্ধা।

চিতা-চৈত্য-চিহ্ন—যেখানে চিতা রচনা করা হয়, সেখানকার স্মৃতিস্তম্ভ।

চিপিটক—স্থূল এবং বৃহৎ।

চীবর—সন্ন্যাসীদের পরিধেয় জীর্ণবাস।

চুন্দী—কুট্টনী।

চেট—দাস।

চৈলচীরিকা—বসনপ্রান্ত।

চোলক—সাঁজোয়া।

চ্ছুরণ—Inlay.

জয়িন—Saddle.

জাঘনিক—বক্রপাদ স্থূল।

জাতীপট্টীকা—কোমর এবং শ্রোণীদেশ বাঁধবার জন্যে শ্রেষ্ঠ কটিবাস।

জাল্ম—ইতর, পামর।

জিন—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

টাঙ্কার—টাং টাং শব্দ।

তঙ্গণ—একটা দেশের নাম।

তন্ত্রীপটহিক—তারবাঁধা গুপিযন্ত্র।

তরক্ষু—হায়না।

তলক—জলন্ত আগুনের বড় বড় মালসা।

তলসারিকা—জেরবন্দ।

তাড়ঙ্ক—কানের দুল।

তাপক—উনান।

তাপিকা—তেল দিয়ে মাছ ও অন্যান্য ভাজা-ভুজি রাঁধবার ছোট কড়া।

তিরশ্চীন—তেরছা।

তিরস্করিণী—পরদা, যবনিকা।

তুণ্ডিল—ভুঁড়িদার।

তুন্দ—উদর।

তূর্ণী—দ্রুততা।

তোক্মতৃণ—যবের সবুজ পাতা।

তোয়কর্ম্মান্তিক—জলভারী।

ৎসরু—তলোয়ারের বাঁট।

দণ্ডক—পুস্তকের প্রতি ছত্র যেখানে সমাপ্ত হয়, সেই স্থানটিকে বলে দণ্ডক।

দন্তপত্র—এক প্রকারের কর্ণাভরণ।

দর্দ্দুরপর্ব্বত—ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে মলয় পর্ব্বত ও দর্দ্দুরপর্ব্বত বিদ্যমান আছে।

দাসেরক—দাসীর ছেলেরা।

দাহানা—(পার্শী শব্দ) ঘোড়ার মুখের Bit, 'খলীন'—সংস্কৃত শব্দ।

দুয়মান—ব্যথায় টন্ টন্ করা।

দূরাধ্বগ—Runner.

ধম্মিল্ল—খোঁপা।

ধ্রুবাগীতি—ধ্রুপদ গান।

নগ্নিকা—উলঙ্গ মেয়ে।

নাগবীথিপাল—হাতী-ধরা খেদার রক্ষক।

নালিবাহিক—হাতীর সহিস।

নিচুল—বেতস গাছ।

নিচোলক—বাক্স।

নিপ্রবানি—নূতন কোরা কাপড়।

নীরাজন—জয় যাত্রার পূর্ব্বে রাজারা দীপমালা, সজলপদ্ম, ধৌত বস্ত্র, তুলসী, বিল্বদলাদি ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—এই পঞ্চ উপচারে শিবিরে যে আরতি করতেন তাকে নীরাজন বলে।

নীলসিন্ধুবার—নীলবর্ণ সিধুয়া ফুল।

নীলিগাছ—নীলগাছ।

নেত্রবাস—সাপের খোলসের মত সূক্ষ্ম বস্ত্র।

নৌগত—নৌকার আরোহী।

পঙ্ককল্ক—প্রলেপ।

পঙ্কপিশঙ্গতা—প্রলেপের লাল খয়েরী রঙ।

পটকুটী—ছোট তাঁবু।

পটান্ত—কাপড়ের কোঁচা।

পত্তি—তকমা পরা ভৃত্য।

পত্রভঙ্গপুত্রিকা—রেখা দিয়ে অঙ্কিত পুত্তলিকা।

পদ্মাবতীদেশ—মালব।

পরমেষ্ঠী—ব্রহ্মা।

পরিঘ—অর্গল।

পরিবর্হ—রাজচিহ্ন পরিচ্ছদ।

পর্য্যানপট্ট—Saddle-এর কাপড়।

পল্লবিক—বিট।

পল্লীপরিবৃঢ়—গ্রামের মোড়ল।

পাটিপতি—সেনানিবাস-রক্ষক।

পাদাৎ—তকমা-পরা ভৃত্য।

পারদৃশ্বা—চরম অভিজ্ঞতা আছে যার।

পারিজাত্য পর্ব্বত—ভারতবর্ষের প্রধান সাতটি পর্ব্বতের অন্যতম। মালব প্রদেশস্থিত বিন্ধ্য ও আরাবলী পর্ব্বতের পশ্চিমদিক-ব্যাপী পর্ব্বত।

পিণ্ডজীবী—অন্নপুষ্ট।

পিশুন—নিষ্ঠুর।

পীটক—মাটির ভাঁড়।

পীষ্টাতক—উৎসবের সময় ব্যবহৃত গন্ধচূর্ণ।

পুরারাতি—শিব।

পুলিকা—আঁটি।

পুষ্যমিত্র—শুঙ্গ রাজবংশের প্রথম রাজধুরন্ধর।

পূগীফল—সুপারী।

পূষণ—সূর্য্যশ্রেণীর বৈদিক দেবতা। ইঁহার ভগ্নদন্ত সম্বন্ধে ঋগ্বেদ (৪, ৩০, ২৪) দ্রঃ।

পৃথুজঘন—গুরু নিতম্ব যাদের।

পৃষদশ্ব—মৃগবাহ।

প্রকাশদাস—প্রসিদ্ধ ভৃত্য।

প্রকোষ্ঠ—কনুইয়ের নিম্ন হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত।
প্রক্ষরিত চক্ষু—জলঝরা চোখ।
প্রগুণ-মাল্য—গড়ে মালা।
প্রগ্রীবক—চিত্রিত শিখর বা ঝোলানো জানালা।
প্রচার—হস্তীদের চারণভূমি।
প্রচেতা—সমুন্নতামনা।
প্রজ্ঞাসংবিভাগ—জ্ঞানের আদান-প্রদান।
প্রতিযাতনা—প্রতিমূর্ত্তি, ছবি।
প্রত্যূহ—বিঘ্ন।
প্রতোলী—বড় রাস্তা।
প্রথীয়ান—অত্যন্ত বড়।
প্রপা—পথপার্শ্বস্থ জলছত্র।
প্রবোধপদবী—সান্ত্বনার পথ।
প্রয়াণক—Marches.
প্রাগবংশমণ্ডপ—অগ্নিশালার পূর্ব্বভাগে পত্নী-শালা; অর্থাৎ যজমান ঐ কক্ষে পত্নী এবং পরিবারবর্গ নিয়ে বাস করতেন।
প্রাগ্রহর—প্রধান।
প্রাবরণ—প্রকৃষ্ট আচ্ছাদন।
প্রাভৃত—ভেট।
প্রালম্বমাল্য—অরুণ এবং হরিৎবর্ণের মাল্য, কণ্ঠ থেকে বক্ষ পর্য্যন্ত লম্বিত।
প্রাস—কুন্ত, এক প্রকার অস্ত্র।
প্রাস্থানিক—প্রস্থান সময়ের উপযোগী।
প্রীতিকূট—শ্রীবাণভট্টের আবাস স্থান।
প্রেঙ্খোলিত—শিহরণ-জাগানো দোলা।
প্রোথপবন—অশ্বের নাসিকাগ্র ভাগ হইতে যে নিশ্বাস বয়।

ফল্গু-চেতস—অসার চিত্ত।

বক্রচার—কুটিলগতি, বক্রী।
বজ—ঘুঁট।
বচ—বচের ফল, ত্রিফলা ঔষধে দেয়।
বঠর—স্থূলবুদ্ধি—মূর্খ।
বড়বা—মাদী ঘোড়া।
বণ্ঠ—অবিবাহিত তরুণ পদাতিক।
বৎসরাজ—বৎস দেশের রাজধানী ছিল 'কৌশাম্বী'। এলাহাবাদের ত্রিশ মাইল দূরে আধুনিক কোশাম নামক গ্রাম।
বদরা—কাপাস ফল।
বনায়ুজ—"বনায়ু"-দেশ-জাত।
বভ্রু—গাঢ় রাঙা
বর্ণক—হাতীর পীঠের চিত্রিত বস্ত্র।
বর্ণকবি—প্রাকৃত ভাষায় যিনি কবিতা লেখেন।
বলসনা ঘৃত—এক প্রকার ওষধি, ঘৃতকে রাখি করবার জন্যে বলাসনা ফুল দিয়ে পরিপাক করতে হয়।
বসুদেব—কণ্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।
বস্ত্রকর্ম্মান্তিক—রাজার পোষাক-ঘরের প্রধান ভৃত্য।
বহল—চন্দন ও এক প্রকারের আখ।
বহুজাল্পিক—বহু সুভাষিত জিহ্বা যার অর্থাৎ বহুভাষী।
বাচাট—বাচাল।
বাণিনী—মেয়ে বার্ত্তাহর।
বাঁধুলি—বন্ধুক ফুল, পুষ্প রক্তবর্ণ হয়।
বামী—মাদী ঘোড়া।
বারং নমস্কৃতি—বার বার নমস্কার করা।
বারবাণ—কঞ্চুক।
বাসঃশকল—ছোট তোয়ালের মত বসনখণ্ড।
বাহিক—কাষ্ঠ-রক্ষক বা গো-রক্ষক।
বিচ্ছায়—ছায়াহীন, সুন্দর।
বিট—নায়ক-গুণযুক্ত এমন একটি গৃহী

মানুষ, যৌবনে যে নাগরক-বৃত্ত অবলম্বন ক'রে নষ্ট করেছে তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য; কিন্তু এখন বেশ্যাগৃহে এবং গোষ্ঠীতে বহুমান লাভ ক'রে তাদেরই বদান্ত অন্নের উপর নির্ভর ক'রে জীবনটাকে কাটিয়ে দিচ্ছে।

বিতর্দ্দিকা—বেদিকা।

বিতানক—তাঁবুতে ঢোকার পরদা।

বিদেহ—নেপাল রাজ্যের কিয়দংশ, তিরহুত ও চম্পারণ লইয়া পুরাকালে বিদেহ-রাজ্য গঠিত ছিল।

বিরোচন—সূর্য্য।

বিশঙ্কট—বৃহৎ

বিষয়—জেলা (ডিষ্ট্রীক্ট)।

বিহসতিকা—ছোট ছোট হাসি।

বৃষ্ণি—যদুবংশীয়।

বৃহদ্রথ—শেষ মৌর্য্য সম্রাট।

বেলার্গলা—বেলাভূমি আগোল যার।

বৈকক্ষক—মালা বা অলঙ্কৃত একফালি বস্ত্র। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় পরা হত।

বৈজনন মাস—যে মাসে সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা থাকে।

বৈণববিশাখিকা দণ্ড—বাঁশের দুই ফলা যুক্ত রুদ্রাঙ্কুশ।

বৈতানবহ্নি—যজ্ঞাগ্নি।

ব্যতীপাতাদি—জ্যোতিষী বিষ্কম্ভাদি অশুভ সপ্তবিংশ যোগের মধ্যে সপ্তদশ যোগ।

ব্যাহৃতি—উক্তি।

ব্রহ্মরাক্ষস—অন্য লোকের স্ত্রীকে হত্যা ক'রে এবং ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে যে ব্রাহ্মণ রাক্ষস হয়ে অরণ্যে ও নির্জ্জলা দেশে থাকে, তাকে ব্রহ্মরাক্ষস বলে। (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ৩, ২১২)

ভদন্ত—মহাশয় (বৌদ্ধ শব্দ)।

ভরদ্বাজ—অতিক্রুতগামী বলিষ্ঠ ঘোড়া (রেসের ঘোড়া)।

ভাণ্ডাগারী—ভাণ্ডাররক্ষক।

ভুজিষ্যা—প্রভুর উচ্ছিষ্ট যে পরিচারিকারা খায়।

ভৃগুপতন—পর্ব্বত থেকে পতন।

ভৈক্ষক্ষাম—ভিক্ষায় কৃশ।

মগধ—আধুনিক বিহার।

মঞ্চক—ছোট টেবিল।

মদন ফল—ময়না গাছের ফল, বা বকুল ফল, বা ধুতরা ফল, বা আকড় ফল।

মদোদয়—হাতীর কাণের পাশ থেকে যে মদস্রাব হয় তাহার উদয়।

মধুগোল—মৌচাক।

মধুবিন্দু পিঙ্গল—মধুবিন্দুর মত হলুদ রঙের ও পদ্মফুলের মত লাল রঙের এক রকমের দাগ হাতীর চতুর্থীদশায় ফুটে ওঠে।

মধুরক—একপ্রকার সুগন্ধি বিষাক্ত ফলের গাছ (সুশ্রুত)।

মনঃশিলা—মঞ্ছাল; সেঁকোবিষ ঘটিত উপরস-বিশেষ। খনিজ পদার্থ।

মল কৃথা—ময়লা কম্বলের ছালা।

মস্করী—যে পরিব্রাজক "মাকৃত মাকৃত শান্তির্বঃ শ্রেয়সি" বলতে বলতে পথ চলে।

মহত্তর—গ্রামের শ্রেষ্ঠ মাতব্বর।

মহাদান—তুলাপুরুষদান প্রমুখ ষোড়শ দানের অন্যতম।

মহানসাধ্যক্ষ—প্রধান পাচক।

মহাপ্রণাল—জলবহির্গমনের বৃহৎ নালী।

মহামাংস-বিক্রয় ক্রীত—নরমাংসের নৈবেদ্য বিক্রয় করে যে অর্থ লাভ হয় সেই অর্থ দ্বারা মূল্যবান মনঃশিলা দরিদ্র শাক্ত সাধকেরা পিশাচসিদ্ধ হবার জন্য ক্রয় করতেন।

মহামাত্র—প্রবীণ মাহুত।

মহামায়ূরী—বৌদ্ধদের মধ্যে যে পাঁচটি রক্ষা-কবচ বা পাঁচটি ইষ্টদেবী আছে, তাহাদের অন্যতম কবচ বা ইষ্টদেবী।

মহাসন্ধিবিগ্রহিক—যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি স্থাপনাদি বিষয়ে মহামন্ত্রী।

মহাস্থানমণ্ডপ—রাজার দরবার-ঘর।

মহীভৃত—রাজা, পর্ব্বত।

মহেন্দ্রপর্ব্বত—ভারতবর্ষের সাতটি কুলা-চলের মধ্যে অন্যতম। করমণ্ডল উপকূলের পূর্ব্বঘাট।

মাতুলুঙ্গি—টাবা লেবু।

মারব-মার্গ—মরুপথ।

মার্গনব্যসনী—তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধপ্রিয়তা।

মার্দ্দঙ্গিক—মৃদঙ্গবাদন যাঁর শিল্প।

মাহেয়ী—সৌরভী গাভী।

মুখেক্ষণপর—মুখের ও চোখের ইসারায় যারা কাজ হাসিল করে এই রকমের দূত।

মূলী—একপ্রকার বাঁশ।

মেকল—নর্ম্মদা নদী এই মেকল পর্ব্বত থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

মেণ্ঠ—হাতীদের ঘুম-ভাঙানো সহিস।

মোট্টায়িত—কামনা প্রকাশের জন্য কামাতুর অবস্থায় উল্লাসে এবং আলস্যে হাত দুটিকে মটকানো।

মৌখরী—'মুখর' রাজবংশীয়।

মৌর্ব্বী—ধনুকের জ্যা।

মৌহূর্ত্তিক—জ্যোতিষী।

ম্রদিমা—মৃদুতা।

যবনেশ্বর—গ্রীক ionia শব্দ থেকে যবন শব্দের উৎপত্তি। অতএব যবন শব্দের অর্থ গ্রীক রাজা। পরে কিন্তু দেখা যায় যবন অর্থে অ-ভারতীয়কে বোঝায়।

যমপট—পটে আঁকা নরকের বীভৎস ছবি।

যামচেটী—রাত্রিকালে স্ত্রীলোক পাহারাদার।

যাযজুক—যাঁরা প্রায়শঃই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

যুদ্ধদোহদ—যুদ্ধ করার ইচ্ছা।

যোগপট্টক—যোগের সময় মুনিরা কাঁধ থেকে জানু পর্য্যন্ত যে কাপড় ব্যবহার করতেন।

যোগভার—মুনিদের ঝোলাঝুলি।

রণ্ডাপুত্র—বেশ্যাপুত্র।

রাজত—রৌপ্যনির্ম্মিত।

রাজাবর্ত্ত—সৌভাগ্য-আনয়নকারী কৃষ্ণপাষাণ নামক একপ্রকার নিকৃষ্ট মণি (বিরাট দেশে পাওয়া যেত)।

রুদিতক—শোকোচ্ছ্বাস।

রোচনা—রক্ত-কহ্লার।

লঘন—গাধা বা খচ্চরের চাকর।

লসন—লীলানৃত্য।

লাসক—নট।

লুণ্ঠক—লুঠেল।

লেপ্যকার—মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ বা চর্ম্ম বা লৌহের ব্যবহার ক'রে যিনি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। (পুস্তকৃৎ শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়)

লেশিক—হাতীর সোয়ারেরা।

শকদের রাজ্য—উদ্বাস্ত সিথিয়ানরা ভারতবর্ষে এসে তক্ষশীলা, মথুরা এবং কাথিওয়াড়ে নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

শস্কুলী—কানের বাহিরের উপরের পাতা।

শম্ভলী—কুটনী।

শরভ—অষ্টাপদ ও সিংহ অপেক্ষা বলবান এরূপ কল্পিত মৃগবিশেষ।

শর্ব্বর—রাত্রি।

শাকুনিক—যারা পাখী মাছ হরিণ ধরে বা মারে।

শাতকৌম্ভী—কাঞ্চনের মত বা কনক ধুতরার মত।

শার্ঙ্গধনু—শিঙের ধনুক।

শালভঞ্জিকা—প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত নারীমূর্ত্তি।

শিখামণি—কপাল ও কেশের সীমানায় যে মণি পরা হ'ত।

শিলীমুখ—বাণ, ভ্রমর।

শুঙ্গাধিপতি দেবভূতি—শুঙ্গরাজবংশের শেষ রাজা।

শূৎকার—হাতী যে ডাক দিয়ে শূ শূ শব্দ ক'রে দুঃখ নিবেদন করে।

শূর্প—কুলা।

শেগট—সজনা বা সজিনা।

শৈল সুবেল—লঙ্কার ত্রিকূট পর্ব্বতের নামান্তর, যেখানে বিদ্যমান ছিল রাবণের স্বর্ণরাজধানী।

শৈশু-নাগবংশীয়—শিশুনাগ-নামা প্রথম রাজা এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রাবস্তী—প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ শহর। অধুনা 'সাহেত-মাহেতে' ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

শ্রোত্রিয়—বেদাধ্যায়ী।

শ্লক্ষ্ণ—নরম।

সংক্রান্তি-শ্রান্তা—গতিবিধির দ্বারা ক্লান্ত।

সংনাহ—খোল, গোছা।

সংপিণ্ডিত—একত্রীকৃত।

সঙ্কলিতী—সঙ্কলন-বিশারদ।

সঞ্জবন—সভা বা চতুঃশালা।

সপ্তচ্ছদ—ছাতিম গাছ।

সপ্তসপ্তি—সূর্য্য।

সপ্তার্চ্চিঃ—অগ্নি।

সমদ্—কোন হাতীর নাম।

সমাযোগ—প্রয়োজনীয় সম্মিলন।

সমূরুক—এক প্রকার হরিণের নাম।

সম্ভূতি—ঐশ্বর্য্য।

সম্মর্দ্দ—সংঘর্ষ।

সার্থবাহ বা সার্থ—বণিকদল।

সিদ্ধার্থক—শ্বেত সরিষা।

সীধু—মদ।

সুষুম্নারশ্মি—সূর্য্যরশ্মিবিশেষ। সূর্য্যরশ্মি সুষুম্না-তর্পিত হ'লে কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রমা সেটিকে পান করেন। তারপরে ঘটে চন্দ্রমার প্রতিদীপন। (যাস্কের নিরুক্তি ২।২।২)

সৈরিক—লাঙল-চালানো কৃষক।

সোপগ্রহ—অনুকূল প্রার্থনার সহিত।

সৌবিভাগ—ব্রহ্মমুহূর্ত্তে রাত্রি এবং দিনের যখন পরিষ্কার ভাগ হয়।

সৌবীর—আবুপর্ব্বতের পশ্চিমে একটি দেশ।

সৌহ্ম্য—পূর্ব্বকালে পশ্চিমবঙ্গের নাম ছিল সৌহ্ম্য। রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত। সেই স্থানের রাজার নাম সৌহ্ম্য।

স্কন্ন্—নত।

স্তবরক—এক প্রকার মিহি মোটা খাপি কাপড়। মনিয়ার উইলিয়ামস্ বলেন, এই শব্দটি প্রমাদযুক্ত; 'আবরক' বা

'স্তম্ভকর' শব্দ প্রচলিত ছিল; বেড়া বা রেলিং—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।
স্ত্রীরাজ্য—ভুটানের কোন একটি প্রদেশ, সেখানকার স্ত্রীলোকেরা ভীমাকৃতি।
স্থানক—কথকথায় ভেদ বা ছেদ জ্ঞাপন, আবৃত্তিমূলক তাল।
স্থানপাল—অশ্বপাল।
স্থাসক—চর্চ্চাচার্চ্চিক্যসহ হাতের ছাপ।
স্নুহি—ফণীমনসা গাছ।
স্ফায়মান—স্ফীত-বর্দ্ধিত।
স্ফিঙ্‌ মাংসপিণ্ড—পাছা।
স্বিন্ন—ঘর্ম্মাক্ত।
স্রগ্ধরা—সংস্কৃত কাব্য-জগতের একটি ছন্দের নাম।

হংসলাজ—হংসকে লজ্জিত করে এত শুভ্র।
হরিচন্দন—শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, গোশীর্ষ, পদ্মের কেশর, জ্যোৎস্না, দেবতরু বিশেষ।
হরিতাল—পারদগর্ভ বিষাক্ত ধাতুবিশেষ।
হস্তক—শিক, শূল, ছিচ্‌কে।
হৈরিক—হীরা রত্নের তত্ত্বজ্ঞ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ভুল ছিল	পাঠ হইবে
১২	নৃত্যোদ্ধত	নৃত্যোদ্ধ‍ৃত
১৩	সাথ	সখি
২৮	প্রালম্ব্যমাল্য	প্রালম্বমাল্য
৩৭	ধর্ম্মজাতবেদা,	ধর্ম্ম, জাতবেদা,
৫০	অতিরথ	অপ্রতিরথ
৫০	প্রীতিকুট	প্রীতিকূট
৬২	বক্রাচারে	বক্রচারে
৬৬	শ্রেণীতটে	শ্রোণীতটে
৬৯	অবভৃত	অবভৃথ
৭৫	তার	তাঁর
৮৫	বণিত	বর্ণিত
৯২	পৃথরাজ	পৃথুরাজ
৯৮	পুষণের	পূষণের
৯৮	দণ্ডটিকে	দন্তটিকে
৯৮	দণ্ডেরই	দন্তেরই
৯৯	পর্য্যস্ত	পর্য্যন্ত
১০১	সম্ভূতি	সম্ভূতি
১০৪	নিশ্রাবণি	নিশ্রবাণি
১০৮	অধোরুক	অর্ধোরুক
১২৫	কপোলদয়ে	কপোলোদয়ে
১২৭	গ্রন্থ-সংহিতায়	গ্রহ-সংহিতায়
১৩৬	দিক্‌ময়ুরী	দিক্‌ময়ূরী
১৪১	বিকারবায়ুগ্রস্ত	বিকারবায়ুগ্রস্ত
১৪২	পদাস্তাস	পদন্যাস
১৪৩	অগবিত	অগর্বিত
১৪৩	অভুত	অদ্ভুত
১৫০	ক্ষুমা, নীলিগাছের সৌরস	ক্ষুমা থেকে তৈরি ক্ষৌমবাস
১৫৯	চিত্রাপিত	চিত্রার্পিত
১৫৯	কুণিত	কুণিত

পৃষ্ঠা	ভুল ছিল	পাঠ হইবে
১৬৪	চীরচীরিকা	চৈলচীরিকা
১৭১	উরচ্ছদ	উরশ্ছদ
১৭৩	করাল যেন জাল	করাল যেন কাল
১৮৩	চতুদ্দিকে	চতুর্দ্দিকে
২০৯	ব্যাভিচারিণী	ব্যভিচারিণী
২১০	আমাত্য	অমাত্য
২১০	পরাশরী	পারাশরী
২১৩	কেশরগুচ্ছ	কেশের গুচ্ছ
২৩০	যার	যাঁর
২৩২	পুষ্পমিত্র	পুষ্যমিত্র
২৩২	মেকলের	মাগধের
২৩২	নির্ম্মাণ করেন মন্ত্রীরা	নির্ম্মাণ করেন মেকলের অধিপতির মন্ত্রীরা
২৪১	বৃংহিতি	বৃংহিত
২৪১	নীলিবাহক	নালীবাহিক
২৫১	বণ্টরা	বণ্ঠরা
২৫২	শাক-পাত্র	শাক-পত্র
২৫৩	অগ্রহারিকেরা	আগ্রহারিকেরা
২৫৬	সংলগ্ন হয়ে যায়। কিছু এবং তুরস্ক	সংলগ্ন হয়ে যায়, যেন কিছু। তুরস্ক
২৬০	কপোতিকা	কাপোতিকা
২৬১	ললাটখনিতে	ললাটখানিতে
২৬৮	পীড়ন নয়	প্রহার নয়
২৮৭	নিঝরিণী	নির্ঝরিণী
৩০৫	পড়েছে	পড়ে